উত্তরসূরী

... সন্দ্র ঠাকুর
ভারতের
...গেছেন।
...বিষ্কার

সকল আকাশ সকল ধরা
আনন্দে হাসিতে ভরা
যে দিক পানে নয়ন মেলি
ভালো সবই ভালো।

এমনতরো উপলব্ধিতেই তিনি ভারতের মর্মসাধনাকে প্রকট করেছেন, একনিষ্ঠ শুভবাদে তাঁর বিশ্বাস চিরদিন অম্লান থেকেছে। উল্লিখিত স্তবকটি যদিও ইংরাজী গীতাঞ্জলিতে অন্তর্ভুক্ত হয়নি, কিন্তু বিশ্বমানবের কাছে এর চেয়ে মহৎ ঘোষণা সেদিন আর কেউই করেননি।

জীবনে যত পূজা
হল না সারা,
জানি হে জানি, তাও
হয় নি হারা।
যে ফুল না ফুটিতে
ঝরেছে ধরণীতে,
যে নদী মরুপথে
হারালো ধারা
জানি হে জানি, তাও
হয় নি হারা।

জীবনে আজও যাহা
রয়েছে পিছে,
জানি হে জানি, তাও
হয় নি মিছে।
আমার অনাগত
আমার অনাহত
তোমার বীণাতারে
বাজিছে তারা—
জানি হে জানি, তাও
হয় নি হারা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ফিল্টার টিপ সিমলা সিগারেটে তামাকের স্বাদ পুরোপুরি পাবেন

ইম্পিরিয়াল টোব্যাকো কোম্পানির তৈরী

SC-7 BEN

BATA SHOE CO PRIVATE LTD
Bata
Bata

"হবে হবে প্রভাত হবে
আঁধার যাবে কেটে,
তোমার বাণী সোনার ধারা
পড়বে আকাশ ফেটে।"
—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

এ প্রাণ রাতের রেলগাড়ি
দিল পাড়ি —
কামরায় গাড়ি-ভরা ঘুম,
রজনী নিঝুম।

চলেছে সে নাম নাহি জানে।
কেউ বলে যন্ত্র সে, আর-কিছু নয়।
মনোহীন বলে তারে, তবে অজ্ঞেয় হাতে
প্রাণমন সঁপি দিয়া বিছানা সে পাতে।
বলে সে অনিশ্চিত, তবু জানে অতি
নিশ্চিত তার গতি।

নামহীন সে অচেনা বারবার পার হয়ে যায়,
অচেতনে যারা সবে রয়েছে সেথায়
তারি দেশ বহে নিশ্বাস —
সন্দেহ-আড়ালেতে মুখ-ঢাকা জাগে বিশ্বাস।
গাড়ি চলে
নিমেষ বিরাম নাই আকাশের তলে।

— রবীন্দ্রনাথ

সব সময় ভাল কফি তৈরী করুন
সেরা কফি তৈরী করাও সহজ
সেন্ট্রাল ফুড টেকনলজিক্যাল
কফি তৈরীর জন্য বিজ্ঞান সম্মতভাবে
বিশেষ ধরনের ফিল্টার তৈরী
দাম ২৩ টাকা
৯০ নয়া পয়সা ও
সেলস ট্যাক্স
ও ফিল্টার
পাওয়া যায় :—
১। ইণ্ডিয়া কফি
চিত্তরঞ্জন এভিনিউ কলিকাতা-১৩
২। ইণ্ডিয়া কফি ডিপো,
লাইন ১৭ সপ নং ২, বিষ্ণুপুর মার্কেট, জামসেদপুর
৩। ইণ্ডিয়া কফি ডিপো বাউরাকলা ২
৪। ইণ্ডিয়া কফি ডিপো,
১৫এ এ্যালবার্ট রোড এলাহাবাদ
৫। ইণ্ডিয়া কফি ডিপো ৬৬ কালিং লেন, নয়াদিল্লী
৬। ইণ্ডিয়া কফি ডিপো,
রুম নং ৯৬, পার্লিয়ামেন্ট হাউস, নয়াদিল্লী
"কি ভাবে সব সময় ভাল কফি করা যাবে"
নামক পুস্তিকাটি বিনামূল্যে দেওয়া হয়—চিঠি লিখুন।
আরও কফি খান কফি আপনার পক্ষে ভাল
কফি বোর্ড, বাঙ্গালোর

Dawn of a New-Era
In literature in Science in Commerce & industry a vast world wide agitation is in progress -the main object of this upsurge is the advent of a new era in which a happier more peaceful living for all will be realised In this rapid march of world progress we are not lagging behind
In the World of Indian Sweets the Premier House of Bhim Nag stands unique and unrivalled even to day
68 WELLINGTON STREET Phone
46, STRAND ROAD Phone 3378
BRANCHES
6 VIVEKANANDA ROAD (Jorasanko Jn)
Phone 359/1 Netaji Subhas Road (Khurut Road) Phone 67 2824
LAST WORD IN INDIAN CONFECTIONERIES
BN
Bhim Nag

কোলে
বিস্কুট ও লজেন্স
গুণের জন্য প্রসিদ্ধ

বিনা আয়াসে
তাড়াতাড়ি কাপড় কাচার জন্যে . . .
টাটার ৫০১
খাঁটি গুঁড়ো সাবান
বিনা আয়াসে ও খুব সহজে কাপড় কাচার উপযোগী প্রচুর ফেনা হয় • চটপট ময়লা কেটে যায়... আর আপনার জামাকাপড় ধবধবে পরিষ্কার দেখায়।
TATA'S
501
PURE SOAP POWDER
FOR ALL HOUSEHOLD WASHING

পাল্‌কি চলে
কোথাও যাযাবর বেদুইন দস্যুদল দিগন্তে বিলীন বিশাল মরু প্রান্তরের বুকে ঘোড়া ছুটিয়ে চলেছে ·শ্যামল অরণ্যে শিকারের অন্বেষণে বিচরণ করছে হিংস্র শ্বাপদ কাজল-কালো অথৈ জলে ভেসে চলেছে 'ময়ূরপঙ্খি নাও'—আবার কোথাও বয়েছে উর্মিমুখর বিস্তীর্ণ নীলাম্বু সুদূরের হাতছানি যখন কিশোর রবীন্দ্রনাথকে ব্যাকুল করে তুলত তখন তিনি ঠাকুমার আমলের একটা পুরনো পাল্‌কির ভিতর চুপি চুপি ঢুকে পর্দা টেনে দিয়ে বসে পড়তেন। তারপর চোখ দু'টি বুজে কল্পনা করতেন পাল্‌কিটা যেন যাদুমন্ত্রে ভরা একটা উড়ন্ত গালিচা, তাঁকে নিয়ে শূন্যপথে ভেসে চলেছে মায়ায় ঘেরা অচেনা অজানা কোন রাজ্যে। দেশ-দেশান্তরের স্বপ্নে বিভোর হয়ে থাকতেন তিনি। উত্তরকালে কবিগুরু সারা পৃথিবী পরিভ্রমণ করেছেন। 'জগতের আনন্দ-যজ্ঞে' নানা বৈচিত্র্য ও অনির্বচনীয় সৌন্দর্যের মধ্যে তিনি দু'টি নয়ন মেলে অপরূপকে দেখেছেন—কৈশোরে একটা পাল্‌কির মধ্যে বসে দেখা 'স্বপ্ন' সত্য হয়ে উঠেছে।
ডানলপ
কর্তৃক প্রচারিত
'পথিক কবি' পর্যায়ের অন্যতম
DC-550 BEN
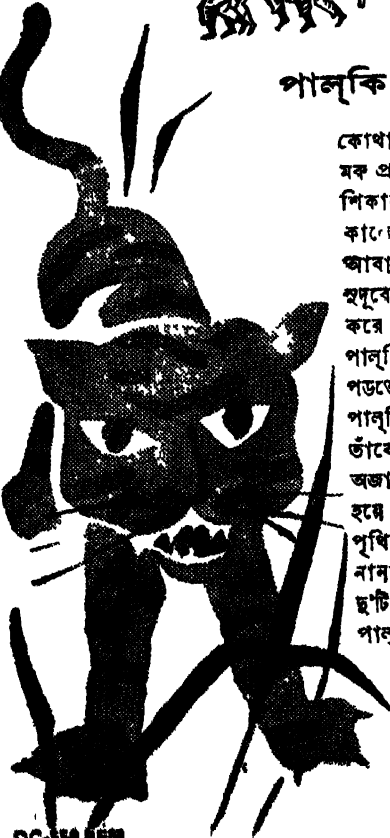
উত্তরসূরী
১৩৬৭

মাঘ-বৈশাখ
১৩৬৮

বামবিঙ্কব
ববীন্দ্রনাথেব দুটি মূর্তি

বোমা রঁল্যার
ববীন্দ্রনাথ সম্পর্কিত চিঠি

ববীন্দ্রনাথ ঠাকুর
দুটি চিত্র, একটি বহুবর্ণ
ববীন্দ্রনাথেব হস্তলিপি

কবিতাবলী
অমিয় চক্রবর্তী, প্রেমেন্দ্র মিত্র, অরুণ কুমাব সবকাব, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায, নীবেন্দ্র চক্রবর্তী, টগব হক, অরুণ ভট্টাচার্য ॥

রবীন্দ্রচিত্রকলা
বিনোদবিহাবী মুখোপাধ্যায, জনিন ওবেযাইযেব, অনিলকৃষ্ণ ভট্টাচার্য, জীবেন্দ্রকুমাব গুহ, শোভন সোম ॥

রবীন্দ্রসংগীত
বাজ্যেশ্বব মিত্র, সুধীব চক্রবর্তী, প্রফুল্ল দাশ, কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ বেদান্তচিন্তামনি, ধ্রুপদাঙ্গ সংগীতেব ও ক বি-ক ণ্ঠে ব বেকর্ডেব পূর্ণতালিকা ॥

আলোচনা
সুবজিৎ দাশগুপ্ত। ত্রিদিব ঘোষ

পুনর্মুদ্রণ
ববীন্দ্রনাথ : ভাষণ ॥ অতুলচন্দ্র গুপ্ত : ববীন্দ্রনাথ ও সংস্কৃত সাহিত্য ॥

ববীন্দ্রনাথ ঠাকুর
সুধীন্দ্রনাথ দত্তেব নিকট লিখিত তিনটি অপ্রকাশিত চিঠি

রবীন্দ্রসংগীতের
একটি অপ্রকাশিত স্ববলিপি

পাণ্ডুলিপির
কযেকটি খসড়া

প্রবন্ধাবলী
ইন্দিবাদেবী চৌধুবানী : ববিকাকা ও স বু জ প ত্র ॥ কানাই সামন্ত : ববীন্দ্র প্রতিভাব নেপথ্যভূমি ॥ অশ্রুকুমাব সিকদাব : ববীন্দ্রনাথেব কাব্যপ্রত্যয়

নির্মল মুখোপাধ্যায : ববীন্দ্রনাথ ও মানবতন্ত্রী ঐতিহ্য ॥ অববিন্দ পোদ্দাব চৈত্রেব শালবন ॥ কিবণশংকব সেনগুপ্ত উত্তবকালেব চোখে ব বী ন্দ্র না থ ॥ গুরুদাস ভট্টাচার্য : ববীন্দ্রসাহিত্যে বিজ্ঞানদৃষ্টি

অমলেন্দু বসু : ববীন্দ্রনাথেব একটি বাক্‌প্রতিমাগুচ্ছ ॥ বিমল কব : শীর্ণ আত্মীযতা ॥ অন্নদাশংকব রায ॥ তাঁব পবেই প্লাবন। বিনয় ঘোষ: ববীন্দ্রচিন্তা অরুণ ভট্টাচার্য: অসম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি ॥

প্রচ্ছদ : মণীন্দ্র মিত্র ॥

সম্পাদক : অরুণ ভট্টাচার্য

প্রধান দপ্তর : ৯বি-৮ কালিচবণ ঘোষ রোড ॥ কলিকাতা ৫০

OUR HOMAGE
TO THE POET

8TH MAY, 1961

রবীন্দ্রনাথ রিয়ালিষ্টিক

— রামকিঙ্কর

রবীন্দ্রনাথ এ্যাবষ্ট্রাক্ট

নামিনন্দন

রবীন্দ্রজন্ম-শতবার্ষিকী সংখ্যা
মাঘ-চৈত্র বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৬৭-৬৮

জয়ন্তী উৎসবে কবির প্রতিভাষণ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আমাদের পরিবার আমার জন্মের পূর্ব্বেই সমাজের নোঙর তুলে দূরে বাঁধা-ঘাটের বাইরে এসে ভিড়েছিল। আচার অনুশাসন ক্রিয়াকর্ম্ম সেখানে সমস্তই বিরল।

আমাদের ছিল মস্ত একটা সাবেক কালের বাড়ি, তার ছিল গোটাকতক ভাঙা ঢাল বর্শা ও মরচে-পড়া তলোয়ার-খাটানো দেউড়ি, ঠাকুর দালান, তিন চারটে উঠোন, সদর অন্দরের বাগান, সম্বৎসরের গঙ্গাজল ধ'রে রাখবার মোট-মোটা জালা সাজানো অন্ধকার ঘর। পূর্ব্বযুগের নানা পালপার্ব্বণের পর্য্যায় নানা কলরবে সাজেসজ্জায় তার মধ্য দিয়ে একদিন চলাচল ক'রেছিল, আমি তার স্মৃতিরও বাইরে প'ড়ে গেছি। আমি এসেচি যখন এ বাসায় তখন পুরাতন কাল সদ্য বিদায় নিয়েচে, নতুন কাল সবে এসে নাম্‌ল, তার আসবাবপত্র তখনো এসে পৌঁছয়নি।

এ বাড়ি থেকে এদেশীয় সামাজিক জীবনের স্রোত যেমন সরে গেছে, তেমনি পূর্ব্বতন ধনের স্রোতেও প'ড়েচে ভাঁটা। পিতামহের ঐশ্বর্য্যদীপাবলী নানা শিখায় একদা এখানে দীপ্যমান ছিল, সেদিন বাকি ছিল দহন-শেষের কালো দাগগুলো, আর ছাই, আর একটি মাত্র কম্পমান ক্ষীণ শিখা। প্রচুর উপকরণসমাকীর্ণ পূর্ব্বকালের আমোদ প্রমোদ বিলাস সমারোহের সরঞ্জাম কোণে কোণে ধূলিমলিন জীর্ণ অবস্থায় কিছু কিছু বাকি যদিবা থাকে তাদের কোন অর্থ নেই। আমি ধনের মধ্যে জন্মাইনি ধনের স্মৃতির মধ্যেও না।

এই নিরালায়, এই পরিবারে যে স্বাতন্ত্র্য জেগে উঠেছিল সে স্বাভাবিক,—মহাদেশ থেকে দূরবিচ্ছিন্ন দ্বীপের গাছপালা জীব জন্তরই স্বাতন্ত্র্যের মতো। তাই আমাদের ভাষায় একটা কিছু ভঙ্গী ছিল কলকাতার লোক যাকে ইসারা ক'রে বলত ঠাকুরবাড়ির ভাষা। পুরুষ ও মেয়েদের বেশভূষাতেও তাই, চাল-চলনেও।

বাংলা ভাষাটাকে তখন শিক্ষিত সমাজ অন্দরে মেয়ে মহলে ঠেলে রেখেছিলেন, সদরে ব্যবহার হ'তো ইংরেজী,—চিঠিপত্রে, লেখাপড়ায়, এমন কি, মুখের কথায়। আমাদের বাড়িতে এই বিকৃতি ঘটতে পারেনি। সেখানে বাংলা ভাষার প্রতি অনুরাগ ছিল সুগভীর, তার ব্যবহার ছিল সকল কাজেই।

আমাদের বাড়িতে আর একটি সমাবেশ হ'য়েছিল সেটি উল্লেখযোগ্য। উপনিষদের ভিতর দিয়ে প্রাক্‌পৌরাণিক যুগের ভারতের সঙ্গে এই পরিবারের ছিল ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। অতি বাল্যকালেই প্রায় প্রতিদিনই বিশুদ্ধ উচ্চারণে অনর্গল আবৃত্তি করেছি উপনিষদের শ্লোক।

এই যেমন একদিকে তেমনি অন্যদিকে আমার গুরুজনদের মধ্যে ইংরেজি সাহিত্যের আনন্দ ছিল নিবিড়। তখন বাড়ির হাওয়া শেক্‌স্‌পীয়রের নাট্যরস-সম্ভোগে আন্দোলিত, সার ওয়াল্‌টর স্কটের প্রভাবও প্রবল। দেশপ্রীতির উন্মাদনা তখন দেশে কোথাও নেই। রঙ্গলালের "স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায়রে" আর তার পরে হেমচন্দ্রের "বিংশতি কোটি মানবের বাস" কবিতায় দেশমুক্তি-কামনার সুর ভোরের পাখীর কাকলীর মত শোনা যায়। হিন্দুমেলার পরামর্শ ও আয়োজনে আমাদের বাড়ির সকলে তখন উৎসাহিত, তার প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা ছিলেন নবগোপাল মিত্র। এই মেলার গান ছিল মেজদাদার লেখা "জয় ভারতের জয়," গণদাদার লেখা "লজ্জায় ভারত যশ গাইব কী ক'রে," বড়ো দাদার "মলিন মুখচন্দ্রমা ভারত তোমারি।" জ্যোতিদাদা এক গুপ্ত সভা স্থাপন ক'রেছেন, একটা পোড়োবাড়িতে তার অধিবেশন, ঋগ্‌বেদের পুঁথি মড়ার মাথার খুলি আর খোলা তলোয়ার নিয়ে তার অনুষ্ঠান, রাজনারায়ণ বসু তার পুরোহিত, সেখানে আমরা ভারত উদ্ধারের দীক্ষা পেলেম।

এই সকল আকাঙ্ক্ষা উৎসাহ উদ্যোগ এর কিছুই ঠেলাঠেলি ভিড়ের মধ্যে নয়। শান্ত অবকাশের ভিতর দিয়ে ধীরে ধীরে এর প্রভাব আমাদের

অন্তরে প্রবেশ করেছিল। রাজসরকারের কোতোয়াল, হয় তখন সতর্ক ছিল না, নয় উদাসীন ছিল, তারা সভার সভ্যদের মাথার খুলি ভঙ্গ বা রসভঙ্গ করতে আসেনি।

কলকাতা সহরের বক্ষ তখন পাথরে বাঁধানো হয়নি, অনেকখানি কাঁচা ছিল। তেল-কলের ধোঁয়ায় আকাশের মুখে তখন কালি পড়েনি। ইমারৎ-অরণ্যের ফাঁকায় ফাঁকায় পুকুরের জলের উপর সূর্য্যের আলো ঝিকিয়ে যেত, বিকেল বেলায় অশথের ছায়া দীর্ঘতর হ'য়ে পড়ত, হাওয়ায় দুলত নারকেল গাছের পত্র-ঝালর, বাঁধা নালা বেয়ে গঙ্গার জল ঝরণার মতো ঝরে পড়ত আমাদের দক্ষিণ বাগানের পুকুরে, মাঝে মাঝে গলি থেকে পাল্কী বেয়ারার হাঁইহুঁই শব্দ আসত কানে, সন্ধ্যাবেলায় জ্বলত তেলের প্রদীপ, তারি ক্ষীণ আলোয় মাদুর পেতে বুড়ী দাসীর কাছে শুনতুম রূপকথা। এই নিস্তব্ধপ্রায় জগতের মধ্যে আমি ছিলুম এক কোণের মানুষ, লাজুক, নীরব, নিশ্চঞ্চল।

আরো একটা কারণে আমাকে খাপছাড়া করেছিল। আমি ইস্কুল পালানো ছেলে, পরীক্ষা দিইনি, পাশ করিনি, মাষ্টার আমার ভাবী কালের সম্বন্ধে হতাশ্বাস। ইস্কুল ঘরের বাইরে যে অবকাশটা বাধাহীন সেইখানে আমার মন হা ঘরেদের মতো বেরিয়ে পড়েছিল।

ইতিমধ্যে কোন্ একটা ভরসা পেয়ে হঠাৎ আবিষ্কার করলুম, লোকে যাকে বলে কবিতা সেই ছন্দ-মেলানো মিল-করা ছড়াগুলো সাধারণ কলম দিয়েই সাধারণ লোকে লিখে থাকে। এই অবাধ অধিকার-বোধের অক্লান্ত উৎসাহে লেখায় মাতলুম। আট অক্ষর, ছয় অক্ষর, দশ অক্ষরের কত রকম ভাগ নিয়ে চলল ঘরের কোণে আমার ছন্দ ভাঙাগড়ার খেলা। ক্রমে প্রকাশ পেল দশজনের সামনে।

এই লেখাগুলি যেমনি হোক্ এর পিছনে একটি ভূমিকা আছে—সে হচ্চে একটি বালক, সে কুণো, সে একলা, সে একঘরে। সে ছিল সমাজের শাসনের অতীত, ইস্কুলের শাসনের বাইরে। বাড়ির শাসনও তার হাল্কা। পিতৃদেব ছিলেন হিমালয়ে, বাড়িতে দাদারা ছিলেন কর্তৃপক্ষ। জ্যোতিদাদা, যাঁকে আমি সকলের চেয়ে মানতুম, বাইরে থেকে তিনি আমাকে কোন বাঁধন পরাননি। তাঁর সঙ্গে তর্ক করেছি, নানা বিষয়ে আলোচনা করেছি বয়স্যের

মতো। তিনি বালককেও শ্রদ্ধা করতে জানতেন। আমার আপন মনের স্বাধীনতার দ্বারাই তিনি আমার চিত্ত-বিকাশের সহায়তা করেছেন। তিনি আমার 'পরে কর্তৃত্ব করবার ঔৎসুক্যে যদি দৌরাত্ম্য করতেন তাহ'লে ভেঙেচুরে তেড়েবেঁকে যা-হয় একটা কিছু হতুম, সেটা হয়তো ভদ্রসমাজের সন্তোষজনকও হ'ত কিন্তু আমার মতো একেবারেই হ'তনা।

সুরু হোল আমার ভাঙাছন্দে লেখা টুকরো কাব্যের পালা, বালকের যা'-তা' ভাবের এলোমেলো কাঁচা গাঁথুনি, শরৎরাত্রির উল্কাবৃষ্টির মতো। এই রীতিভঙ্গের ঝোঁকটা ছিল সেই একঘরে ছেলের মজ্জাগত। এতে যথেষ্ট বিপদের শঙ্কা ছিল। কিন্তু এখানেও অপঘাত থেকে রক্ষা পেয়ে গেছি। তার কারণ আমার ভাগ্যক্রমে সেকালে বাংলা সাহিত্যে খ্যাতির হাটে ভিড় ছিল অতি সামান্য—প্রতিযোগিতার উত্তেজনা উত্তপ্ত হয়ে ওঠেনি। বিচারকের দণ্ড থেকে অপ্রশংসার আঘাত নামত কিন্তু কটূক্তির উত্তেজনা তখনও সাহিত্যে ঝাঁঝিয়ে ওঠেনি।

সেদিনকার অল্পসংখ্যক সাহিত্যিকের মধ্যে আমি ছিলেম বয়সে সব চেয়ে ছোট, শিক্ষায় সব চেয়ে কাচা। আমার ছন্দগুলি লাগাম-ছেঁড়া, লেখবার বিষয় ছিল অস্ফুট উক্তিতে ঝাপসা, ভাষার ও ভাবের অপরিণতি পদে পদে। তখনকার সাহিত্যিকেরা মুখের কথায় বা লেখায় প্রায়ই আমাকে প্রশ্রয় দেননি,—আধো আধো বাধো বাধো কথা নিয়ে বেশ একটু হেসেছিলেন। সে হাসি বিদূষকের নয়, সেটা বিদূষণব্যবসায়ের অঙ্গ ছিলনা। তাঁদের লেখায় শাসন ছিল, অসৌজন্য ছিলনা লেশ মাত্র। তাই প্রশ্রয়ের অভাবসত্ত্বেও বিরুদ্ধরীতির মধ্য দিয়েও আপন লেখা আপন মতে গড়ে তুলেছিলেম।

সেদিনকার খ্যাতিহীনতার স্নিগ্ধ প্রথম প্রহর কেটে গেল। প্রকৃতির শুশ্রূষা ও আত্মীয়দের স্নেহের ঘনচ্ছায়ায় ছিলেম ব'সে। খ্যাতি এসে অনাবৃত মধ্যাহ্নরৌদ্রে টেনে বের করলে। তাপ ক্রমেই বেড়ে উঠল, আমার কোণের আশ্রয় একেবারে ভেঙে গেল। খ্যাতির সঙ্গে সঙ্গে যে গ্লানি এসে পড়ে আমার ভাগ্যে অন্যদের চেয়ে তা অনেক বেশি আবিল হয়ে উঠেছিল। এমন অনবরত, এমন অকুণ্ঠিত, এমন অকরুণ, এমন অপ্রতিহত অসম্মাননা আমার মতো আর কোন সাহিত্যিককেই সইতে হয়নি। এও আমার খ্যাতি পরিমাপের বৃহৎ মাপকাঠি। আমাকে এ কথা বলবার সুযোগ দিয়েছে যে, প্রতিকূল

পরীক্ষায় ভাগ্য আমাকে লাঞ্ছিত করেচে কিন্তু পরাভবের অগৌরবে লজ্জিত করেনি। এছাড়া আমার দুর্গ্রহ কালো বর্ণের এই যে পটটি ঝুলিয়েচেন এরই উপরে আমার বন্ধুদের সুপ্রসন্ন মুখ সমুজ্জ্বল হয়ে উঠেচে। তাঁদের সংখ্যা অল্প নয় সে কথা বুঝিতে পারি আজকের এই অনুষ্ঠানেই। বন্ধুদের কাউকে জানি, অনেককেই জানিনে, তাঁরাই কেউ কাছে থেকে কেউ দূরে থেকে এই উৎসবে মিলিত হয়েচেন সেই উৎসাহে আমার মন আনন্দিত। আজ আমার মনে হচ্চে তাঁরা আমাকে জাহাজে তুলে দিতে ঘাটে এসে দাঁড়িয়েচেন—আমার খেয়াতরী পাড়ি দেবে দিবালোকের পরপারে তাঁদের মঙ্গল ধ্বনি কানে নিয়ে।

আমার কর্ম্মপথের যাত্রা সত্তর বছরের গোধূলি বেলায় একটা উপসংহারে এসে পৌঁছল। আলো ম্লান করবার শেষ মুহূর্ত্তে এই জয়ন্তী অনুষ্ঠানের দ্বারা দেশ আমার দীর্ঘজীবনের মূল্য স্বীকার করবেন।

ফসল যতদিন মাঠে ততদিন সংশয় থেকে যায়। বুদ্ধিমান মহাজন অন্তের দিকে তাকিয়েই আগাম দাদন দিতে দ্বিধা করে, অনেকটা হাতে রেখে দেয়। ফসল যখন গোলায় উঠল তখনি ওজন বুঝে দামের কথা পাকা হতে পারে। আজ আমার বুঝি সেই ফসল-শেষের হিসাব চুকিয়ে দেবার দিন।

যে মানুষ অনেককাল বেঁচে আছে সে অতীতেরই সামিল। বুঝতে পারচি আমার সাবেক বর্ত্তমান এই হাল বর্ত্তমান থেকে বেশ খানিকটা তফাতে। যে সব কবি পালা শেষ করে লোকান্তরে, তাঁদেরই আঙিনার কাছটায় আমি এসে দাঁড়িয়েচি তিরোভাবের ঠিক পূর্ব্বসীমানায়। বর্ত্তমানের চলতি রথের বেগের মুখে কাউকে দেখে নেবার যে অস্পষ্টতা সেটা আমার বেলা এতদিনে কেটে যাবার কথা। যতখানি দূরে এলে কল্পনার ক্যামেরায় মানুষের জীবন-টাকে সমগ্রলক্ষ্যবদ্ধ করা যায় আধুনিকের পুরোভাগ থেকে আমি ততটা দূরেই এসেচি।

পঞ্চাশের পরে বানপ্রস্থের প্রস্তাব মনু করেচেন। তার কারণ মনুর হিসাবমতো পঞ্চাশের পরে মানুষ বর্ত্তমানের থেকে পিছিয়ে পড়ে। তখন কোমর বেঁধে ধাবমান কালের সঙ্গে সমান ঝোঁকে পা ফেলে ছোটায় যতটা ক্লান্তি ততটা সফলতা থাকেনা, যতটা ক্ষয় ততটা পূরণ হয় না। অতএব তখন থেকে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে তাকে সেই সর্ব্বকালের মোহানার দিকে যাত্রা করতে হবে যেখানে কাল স্তব্ধ। গতির সাধনা শেষ করে তখন স্থিতির সাধনা।

মনু যে-মেয়াদ ঠিক ক'রে দিয়েছেন এখন সেটাকে ঘড়ি ধ'রে খাটানো প্রায় অসাধ্য। মনুর যুগে নিশ্চয়ই জীবনে এত দায় ছিল না, তার গ্রন্থি ছিল কম। এখন শিক্ষা বলো, ধর্ম্ম বলো, এমন কি আমোদ প্রমোদ খেলা-ধুলা, সমস্তই বহুব্যাপক। তখনকার সম্রাটেরও রথ যত বড়ো যত জমকালো হোক্, এখানকার রেলগাড়ির মতো তাতে বহুগাড়ির এমন দ্বন্দ্বসমাস ছিল না। এই গাড়ির মাল খালাস করতে বেশ একটু সময় লাগে। পাঁচটায় আপিসে ছুটি শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট বটে কিন্তু খাতাপত্র বন্ধ করে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বাড়ি-মুখো হবার আগেই বাতি জ্বালতে হয়। আমাদের সেই দশা। তাই পঞ্চাশের মেয়াদ বাড়িয়ে না নিলে ছুটি মঞ্জুর অসম্ভব। কিন্তু সত্তরের কোঠায় পড়লে আর ওজর চলে না। বাইরের লক্ষণে বুঝতে পারচি আমার সময় চলল আমাকে ছাড়িয়ে—কম ক'রে ধরলেও অন্তত দশবছর আগেকার তারিখে আমি বসে আছি। দূরের নক্ষত্রের আলোর মতো, অর্থাৎ সে যখনকার সে তখনকার নয়।

তবু একেবারে থামবার আগে চলার ঝোঁকে অতীতকালের খানিকটা ধাক্কা এসে পড়ে বর্ত্তমানের উপরে। গান সমস্তটাই শমে এসে পৌঁছলে তার সমাপ্তি, তবু আরো কিছুক্ষণ ফরমাস চলে পালটিয়ে গাবার জন্যে। সেটা অতীতেরই পুনরাবৃত্তি। এর পরে বড়ো জোর ছুটো একটা তান লাগানো চলে, কিন্তু চুপ করে গেলেও লোকসান নেই। পুনরাবৃত্তিকে দীর্ঘকাল তাজা রাখবার চেষ্টাও যা আর কই মাছটাকে ডাঙায় তুলে মাসখানেক বাঁচিয়ে রাখবার চেষ্টাও তাই।

এই মাছটার সঙ্গে কবির তুলনা আরো একটু এগিয়ে নেওয়া যাক। মাছ যতক্ষণ জলে আছে ওকে কিছু কিছু খোরাক জোগানো সৎকর্ম্ম, সেটা মাছের নিজের প্রয়োজনে। পরে যখন তাকে ডাঙায় তোলা হলো তখন প্রয়োজনটা তার নয়, অপর কোন জীবের। তেমনি কবি যতদিন না একটা স্পষ্ট পরিণতিতে পৌঁছয় ততদিন তাকে কিছু কিছু উৎসাহ দিতে পারলে ভালোই—সেটা কবির নিজেরই প্রয়োজনে। তার পরে তার পূর্ণতায় যখন একটা সমাপ্তির যতি আসে তখন তার সম্বন্ধে যদি কোন প্রয়োজন থাকে সেটা তার নিজের নয়, প্রয়োজন তার দেশের।

দেশ মানুষের সৃষ্টি। দেশ মৃন্ময় নয়, সে চিন্ময়। মানুষ যদি প্রকাশমান

হয় তবেই দেশ প্রকাশিত। সুজলা সুফলা মলয়জশীতলা ভূমির কথা যতই উচ্চকণ্ঠে রটাব ততই জবাবদিহির দায় বাড়বে, প্রশ্ন উঠবে প্রাকৃতিক দান তো উপাদান মাত্র, তা নিয়ে মানবিক সম্পদ কতটা গড়ে তোলা হলো। মানুষের হাতে দেশের জল যদি যায় শুকিয়ে, ফল যদি যায় ম'রে, মলয়জ যদি বিষিয়ে ওঠে মারী বীজে, শস্যের জমি যদি হয় বন্ধ্যা, তবে কাব্যকথায় দেশের লজ্জা চাপা পড়বে না। দেশ মাটিতে তৈরি নয়, দেশ মানুষে তৈরি।

তাই দেশ নিজের সত্তা প্রমাণেরই খাতিরে অহরহ তাকিয়ে আছে তাদেরই জন্যে যারা কোন সাধনায় সার্থক। তারা না থাকলেও গাছপালা জীবজন্তু জন্মায়, বৃষ্টি পড়ে, নদী চলে কিন্তু দেশ আচ্ছন্ন থাকে, মরুবালুতলে ভূমির মত।

এই কারণেই দেশ যার মধ্যে আপন ভাষাবান প্রকাশ অনুভব করে তাকে সর্ব্বজনসমক্ষে নিজের ব'লে চিহ্নিত করবার উপলক্ষ্য রচনা করতে চায়। যেদিন তাই করে, যেদিন কোন মানুষকে আনন্দের সঙ্গে সে অঙ্গীকার করে, সেদিনই মাটির কোল থেকে দেশের কোলে সেই মানুষের জন্ম।

আমার জীবনের সমাপ্তিদশায় এই জয়ন্তী অনুষ্ঠানের যদি কোন সত্য থাকে তবে তা এই তাৎপর্য্য নিয়ে। আমাকে গ্রহণ করবার দ্বারা দেশ যদি কোনভাবে নিজেকে লাভ না ক'রে থাকে তবে আজকের এই উৎসব অর্থহীন। যদি কেউ এ কথায় অহঙ্কারের আশঙ্কা ক'রে আমার জন্যে উদ্বিগ্ন হন তবে তাঁদের উদ্বেগ অনাবশ্যক। যে-খ্যাতির সম্বল অল্প তার সমারোহ যতই বেশি হয় ততই তার দেউলে হওয়া দ্রুত ঘটে। ভুল মস্ত হ'য়েই দেখা দেয়, চুকে যায় অতি ক্ষুদ্র হ'য়ে। আতসবাজির অভ্রবিদারক আলোটাই তার নির্ব্বাণের উজ্জ্বল তর্জ্জনী সঙ্কেত।

এ কথায় সন্দেহ নেই যে পুরস্কারের পাত্র নির্ব্বাচনে দেশ ভুল করতে পারে। সাহিত্যের ইতিহাসে ক্ষণমুখরা খ্যাতির মৌনসাধন বারবার দেখা গেছে। তাই আজকের দিনের আয়োজনে আজই অতিশয় উল্লাস যেন না করি এই উপদেশের বিরুদ্ধে যুক্তি চলে না। যেমনি তা নিয়ে এখনি তাড়াতাড়ি বিমর্ষ হবারও আশু কারণ দেখি না কালে কালে সাহিত্যবিচারের রায় একবার উল্‌টিয়ে আবার পাল্‌টিয়েও থাকে। অব্যবস্থিত চিত্ত মন্দগতি কালের সব শেষ বিচারে আমার ভাগ্যে যদি নিঃশেষে ফাঁকিই থাকে তবে এখনি আগাম শোচনা করতে বসা কিছু নয়। এখনকার মতো এই উপস্থিত

অনুষ্ঠানটাই নগদ লাভ। তারপর চরম জবাবদিহির জন্যে প্রপৌত্রেরা রইলেন। আপাতত বন্ধুদের নিয়ে আশ্বস্তচিত্তে আনন্দ করা যাক, অপর পক্ষে যাঁদের অভিরুচি হয় তাঁরা ফুৎকারে বুদ্বুদ বিদীর্ণ করার উৎসাহে আনন্দ করতে পারেন। এই দুই বিপরীত ভাবের কালোয় সাদায় সংসারের আনন্দধারায় যমের কন্যা যমুনা ও শিবজটা-নিঃসৃতা গঙ্গা মিলে থাকে। ময়ূর আপন পুচ্ছগর্ব্বে নৃত্য ক'রে খুসি, আবার শিকারী আপন লক্ষ্যবেধ গর্ব্বে তাকে গুলি করে মহা আনন্দিত।

আধুনিককালে পাশ্চাত্য দেশে সাহিত্যে কলাসৃষ্টিতে লোকচিত্তের সম্মতি অতি ঘন ঘন বদল হয় এটা দেখা যাচ্চে। বেগ বেড়ে চলেছে মানুষের যানে বাহনে, বেগ অবিশ্রাম ঠেলা দিচ্চে মানুষের মন প্রাণকে।

যেখানে বৈষয়িক প্রতিযোগিতা উগ্র সেখানে এই বেগের মূল্য বেশি। ভাগ্যের হরির লুট নিয়ে হাটের ভিড়ে ধূলার 'পরে যেখানে সকলে মিলে কাড়াকাড়ি, সেখানে যে-মানুষ বেগে জেতে মালেও তার জিৎ। তৃপ্তিহীন লোভের বাহন বিরামহীন বেগ। সমস্ত পশ্চিম মাতালের মতো টলমল করচে সেই লোভে। সেখানে বেগবৃদ্ধি ক্রমে লাভের উপলক্ষ্য না হয়ে স্বয়ং লক্ষ্য হ'য়ে উঠচে। বেগেরই লোভ আজ জলে স্থলে আকাশে হিস্‌টীরিয়ার চীৎকার করতে করতে ছুটে বেরোলো।

কিন্তু প্রাণ পদার্থ তো বাষ্প বিদ্যুতের ভূতে তাড়া করা লোহার এঞ্জিন নয়। তার একটি আপন ছন্দ আছে। সেই ছন্দে দুই এক মাত্রা টান সয় তার বেশি নয়। মিনিট কয়েক ডিগবাজি খেয়ে চলা সম্ভব কিন্তু দশ মিনিট যেতে না যেতে প্রমাণ হবে যে মানুষ বাইসিক্‌লের চাকা নয়, তার পদাতিকের চাল পদাবলীর ছন্দে। গানের লয় মিষ্টি লাগে যখন সে কানের সজীব ছন্দ মেনে চলে। তাকে দুন থেকে চৌদুনে চড়ালে সে কলা-দেহ ছেড়ে কৌশল-দেহ নেবার জন্যই হাঁসফাঁস করতে থাকে। তাগিদ যদি আরো বাড়াও তাহলে রাগিণীটা পাগলা-গারদের সদর গেটের উপর মাথা ঠুকে মারা যাবে। সজীব চোখ তো ক্যামেরা নয়, ভালো ক'রে দেখে নিতে সে সময় নেয়। ঘণ্টায় বিশ পঁচিশ মাইল দৌড়ের দেখা তার পক্ষে কুয়াশা দেখা। একদা তীর্থযাত্রা বলে একটা সজীব পদার্থ আমাদের দেশে ছিল। ভ্রমণের পূর্ণস্বাদ নিয়ে সেটা সম্পন্ন হোত। কলের গাড়ির আমলে তীর্থ রইল, যাত্রা

রইল না, ভ্রমণ নেই পৌঁছনো আছে, শিক্ষাটা বাদ দিয়ে পরীক্ষাটা পাশ করা যাকে বলে। রেল কোম্পানীর কারখানায় কলে-ঠাসা তীর্থযাত্রার ভিন্ন ভিন্ন দামের বটিকা সাজানো, গিলে ফেললেই হলো—কিন্তু হোলোইনা যে সে কথা বোঝবারও ফুরসুৎ নেই। কালিদাসের যক্ষ যদি মেঘদূতকে বরখাস্ত করে দিয়ে এরোপ্লেনদূতকে অলকায় পাঠাতেন তাহ'লে অমন দুই সর্গভরা মন্দাক্রান্তা ছন্দ দুচারটে শ্লোক পার না হ'তেই অপঘাতে মরত। কলে-ঠাসা বিরহ তো আজ পর্য্যন্ত বাজারে নামেনি।

মেঘদূতের শোকাবহ পরিণামে শোক করবে না এমনতরো বলবান পুরুষ আজকাল দেখতে পাওয়া যাচ্চে। কেউ কেউ বলচেন, কবিতার সময় এখন চলে গেছে। যদি সত্য হয় তবে সেটা কবিতার দোষে নয় সময়ের দোষে। মানুষের প্রাণটা চিরদিনই ছন্দে বাঁধা কিন্তু তার কালটা কলের তাড়ায় সম্প্রতি ছন্দ ভাঙা।

আঙুরের ক্ষেতে চাষী কাঠি পুঁতে দেয়, তারি উপর আঙুল লতিয়ে উঠে আশ্রয় পায় ফল ধরায়। তেমনি জীবনযাত্রাকে সফল করবার জন্যে কতকগুলি রীতিনীতি বেঁধে দিতে হয়। এই রীতিনীতির অনেকগুলিই নির্জ্জীব নীরস উপদেশ অনুশাসনের খুঁটি। কিন্তু বেড়ায় লাগানো জিয়ল কাঠের খুঁটি যেমন রস পেলেই বেঁচে ওঠে তেমনি জীবনযাত্রা যখন প্রাণের ছন্দে শান্ত গমনে চলে তখন শুকনো খুঁটি-গুলো অন্তরের গভীরে পৌঁছবার অবকাশ পেয়ে ক্রমেই প্রাণ পেতে থাকে। সেই গভীরেই সঞ্জীবনীরস। সেই রসে তত্ত্ব ও নীতির মতো পদার্থও হৃদয়ের আপন সামগ্রীরূপে সজীব ও সজ্জিত হ'য়ে ওঠে, মানুষের আনন্দের রং তাতে লাগে। এই আনন্দের প্রকাশের মধ্যেই চিরন্তনতা। একদিনের নীতিকে আর একদিন আমরা গ্রহণ নাও করতে পারি কিন্তু সেই নীতি যে-প্রীতিকে যে সৌন্দর্য্যকে আনন্দের সত্য ভাষায় প্রকাশ করেচে সে আমাদের কাছে নূতন থাকবে। আজো নূতন আছে মোগল সাম্রাজ্যের শিল্প—সেই সাম্রাজ্যকে, তার সাম্রাজ্য নীতিকে আমরা পছন্দ করি আর না করি।

কিন্তু যে যুগে দলে দলে গরজের তাড়ায় অবকাশ ঠাসা হ'য়ে নিরেট হ'য়ে যায় সে যুগ প্রয়োজনের, সে যুগ প্রীতির নয়। প্রীতি সময় নেয় গভীর হ'তে। আধুনিক এই ত্বরা-তাড়িত যুগে প্রয়োজনের তাগিদ কচুরি পানার

মতোই সাহিত্য-ধারার মধ্যেও ভূরি ভূরি ঢুকে পড়েচে। তারা বাস করতে আসে না, সমস্যা-সমাধানের দরখাস্ত হাতে ধন্না দিয়ে পড়ে। সে দরখাস্ত যতই অলঙ্কৃত হোক্ তবু সে খাঁটি সাহিত্য নয়, সে দরখাস্তই। দাবী মিট্‌লেই তার অন্তর্দ্ধান।

এই অবস্থায় সাহিত্যের হাওয়া বদল হয় এবেলা ওবেলা। কোথাও আপন দরদ রেখে যায় না, পিছনটাকে লাথি মেরেই চলে, যাকে উঁচু ক'রে গড়ছিল তাকে ধূলিসাৎ ক'রে তার 'পরে অট্টহাসি। আমাদের মেয়েদের পাড়ওয়ালা সাড়ি, তাদের নীলাম্বরী, তাদের বেনারসী চেলি মোটের উপর দীর্ঘকাল বদল হয়নি—কেননা ওরা আমাদের অন্তরের অনুরাগকে আঁকড়ে আছে। দেখে আমাদের চোখের ক্লান্তি হয় না। হতো ক্লান্তি, মনটা যদি বসিয়ে দেখবার উপযুক্ত সময় না পেয়ে বে-দরদী ও অশ্রদ্ধাপরায়ণ হ'য়ে উঠত। হৃদয়হীন অগভীর বিন্যাসের আয়োজনে অকারণে অনায়াসে ঘন ঘন ফ্যাশানের বদল। এখনকার সাহিত্য তেমনি রীতির বদল। হৃদয়টা দৌড়তে দৌড়তে প্রীতি সম্বন্ধের রাখী গাঁথতে ও পরাতে পারে না। যদি সময় পেত সুন্দর ক'রে বিনিয়ে বিনিয়ে গাঁথত। এখন ওকে ব্যস্ত লোকেরা ধমক দিয়ে বলে, রেখে দাও তোমার সুন্দর। সুন্দর পুরোনো, সুন্দর সেকেলে। আনো একটা যেমন-তেমন ক'রে পাক-দেওয়া শণের দড়ি—সেটাকে বলব রিয়ালিজম—এখনকার দুদ্দাড় দৌড়ওয়ালা লোকের ঐটেই পছন্দ। স্বল্পায়ু ফেশান হঠাৎ-নবাবের মতো উদ্ধত—তার প্রধান অহঙ্কার এই যে সে অধুনাতন অর্থাৎ তার বড়াই গুণ নিয়ে নয়, কাল নিয়ে।

বেগের এই মোটর কলটা পশ্চিম দেশের মর্ম্মস্থানে। ওটা এখনো পাকা দলিলে আমাদের নিজস্ব হয়নি। তবু আমাদের দৌড় আরম্ভ হলো। ওদেরি হাওয়া-গাড়ির পায়দানের উপর লাফ দিয়ে আমরা উঠে পড়েচি। আমরাও খর্ব্বকেশিনী খর্ব্ববেশিনী সাহিত্যকীর্ত্তির টেকনীকের হাল্ ফ্যাশান নিয়ে গম্ভীরভাবে আলোচনা করি, আমরাও অধুনাতনের স্পর্দ্ধা নিয়ে পুরাতনের মান হানি করতে অত্যন্ত খুসি হই।

এই সব চিন্তা করেই বলেছিলুম আমার এ বয়সে খ্যাতিকে আমি বিশ্বাস করিনে। এই মায়ামৃগীর শিকারে বনে বাদাড়ে ছুটে বেড়ানো যৌবনেই সাজে। কেননা সে বয়সে মৃগ যদি বা নাও মেলে মৃগয়াটাই যথেষ্ট। ফুল থেকে ফল

হতেও পারে, তবু আপন স্বভাবকেই চাঞ্চল্যে সার্থক করতে হয় ফুলকে। সে অশান্ত, বাইরের দিকেই তার বর্ণ গন্ধের নিত্য উদ্যম। ফলের কাজ অন্তরে, তার স্বভাবের প্রয়োজন অপ্রগল্ভ শান্তি। শাখা থেকে মুক্তির জন্যেই তার সাধনা,—সেই মুক্তি নিজেরই আন্তরিক পরিণতির যোগে।

আমার জীবনে আজ সেই ফলেরই ঋতু এসেচে, যে-ফল আশু বৃন্তচ্যুতির অপেক্ষা করে। এই ঋতুটির সুযোগ সম্পূর্ণ গ্রহণ করতে হ'লে বাহিরের সঙ্গে অন্তরের শান্তি স্থাপন চাই। সেই শান্তি খ্যাতি অখ্যাতির দ্বন্দ্বের মধ্যে বিধ্বস্ত হয়।

খ্যাতির কথা থাক্। ওটার অনেকখানিই অবাস্তবের বাষ্পে পরিস্ফীত। তার সঙ্কোচন প্রসারণ নিয়ে যে মানুষ অতিমাত্র ক্ষুব্ধ হতে থাকে সে অভিশপ্ত। ভাগ্যের পরম দান প্রীতি, কবির পক্ষে শ্রেষ্ঠ পুরস্কার তাই। যে মানুষ কাজ দিয়ে থাকে খ্যাতি দিয়ে তার বেতন শোধ চলে, আনন্দ দেওয়াই যার কাজ প্রীতি না হলে তার প্রাপ্য শোধ হয় না।

অনেক কীর্ত্তি আছে যা মানুষকেই উপকরণ ক'রে গড়ে তোলা। যেমন রাষ্ট্র। কর্ম্মের বল সেখানে জন-সংখ্যায়—তাই সেখানে মানুষকে দলে টানা নিয়ে কেবলি দ্বন্দ্ব চলে। বিস্তারিত খ্যাতির বেড়াজাল ফেলে মানুষ ধরা নিয়ে ব্যাপার। মনে করো, লয়েড জর্জ্জ। তাঁর বুদ্ধিকে তাঁর শক্তিকে অনেক লোকে যখন মানে তখনই তাঁর কাজ চলে। বিশ্বাস আলগা হ'লে বেড়াজাল গেল ছিঁড়ে, মানুষ-উপকরণ পুরোপূরি জোটে না।

অপর পক্ষে কবির সৃষ্টি যদি সত্য হ'য়ে থাকে সেই সত্যের গৌরব সেই সৃষ্টির নিজেরই মধ্যে, দশজনের সম্মতির মধ্যে নয়। দশজনে তাকে স্বীকার করেনি এমন প্রায়ই ঘটে থাকে। তাতে বাজার দরের ক্ষতি হয় কিন্তু সত্যমূল্যের ক্ষতি হয় না।

ফুল ফুটেচে এইটেই ফুলের চরম কথা। যার ভালো লাগলো সেই জিৎল, ফুলের জিৎ তার আপন আবির্ভাবেই। সুন্দরের অন্তরে আছে একটি রসময় রহস্যময় আয়ত্তের অতীত সত্য, আমাদের অন্তরেরই সঙ্গে তার অনির্ব্বচনীয় সম্বন্ধ। তার সম্পর্কে আমদের আত্মচেতনা হয় মধুর, গভীর, উজ্জ্বল। আমাদের ভিতরের মানুষ বেড়ে ওঠে, বাড়িয়ে ওঠে, রসিয়ে ওঠে। আমাদের সত্তা যেন তার সঙ্গে রঙে রসে মিলে যায়—একেই বলে অনুরাগ।

কবির কাজ এই অনুরাগে মানুষের চৈতন্যকে উদ্দীপ্ত করা, ঔদাসীন্য থেকে উদ্বোধিত করা। সেই কবিকেই মানুষ বড়ো বলে যে এমন সকল বিষয়ে মানুষের চিত্তকে আশ্লিষ্ট করেচে যার মধ্যে নিত্যতা আছে, মহিমা আছে, শক্তি আছে, যা ব্যাপক এবং গভীর। কলা ও সাহিত্যের ভাণ্ডারে দেশে দেশে কালে কালে মানুষের অনুরাগের সম্পদ রচিত ও সঞ্চিত হ'য়ে উঠচে। এই বিশাল ভুবনে বিশেষ দেশের মানুষ বিশেষ কাকে ভালোবেসেচে সে তার সাহিত্য দেখলেই বুঝতে পারি। এই ভালোবাসার দ্বারাই তো মানুষকে বিচার করা।

বাণাপাণির বীণায় তার অনেক। কোনোটা সোনার, কোনোটা তামার, কোনোটা ইস্পাতের। সংসারের কণ্ঠে হাল্কা ও ভারী আনন্দের ও প্রমোদের যত রকমের সুর আছে সমস্তই তাঁর বীণায় বাজে। কবির কাব্যেও সুরের অসংখ্য বৈচিত্র্য। সবই যে উদাত্তধ্বনির হওয়া চাই এমন কথা বলিনে। কিন্তু সমস্তের সঙ্গে সঙ্গেই এমন কিছু থাকা চাই, যার ইঙ্গিত ধ্রুবের দিকে, সেই বৈরাগ্যের দিকে যা অনুরাগকেই বীর্যবান ও বিশুদ্ধ করে। ভর্তৃহরির কাব্যে দেখি ভোগের মানুষ আপন সুর পেয়েচে, কিন্তু কাব্যের গভীরের মধ্যে ব'সে আছে ত্যাগের মানুষ আপন একতারা নিয়ে—এই দুই সুরের সমবায়েই রসের ওজন ঠিক থাকে, কাব্যেও মানবজীবনেও। দূরকাল ও বহুজনকে যে-সম্পদ দান করার দ্বারা সাহিত্য স্থায়ীভাবে সার্থক হয়, কাগজের নৌকায় বা মাটির গামলায় তো তার বোঝাই সইবে না। আধুনিক-কাল-বিলাসীরা অবজ্ঞার সঙ্গে বলতে পারেন এ সব কথা আধুনিক কালের বুলির সঙ্গে মিলচে না —তা যদি হয় তাহলে সেই আধুনিককালটারই জন্যে পরিতাপ করতে হবে। আশ্বাসের কথা এই যে সে চিরকালই আধুনিক থাকবে এত আয়ু তার নয়।

কবি যদি ক্লান্ত মনে এমন কথা মনে করে যে কবিত্বের চিরকালের বিষয়গুলি আধুনিককালে পুরোনো হ'য়ে গেছে তাহলে বুঝবো আধুনিক কালটাই হয়েচে বৃদ্ধ ও রসহীন। চিরপরিচিত জগতে তার সহজ অনুরাগের রস পৌঁছচ্চে না, তাই জগৎটাকে আপনার মধ্যে নিতে পারল না। যে কল্পনা নিজের চারিদিকে আর রস পায় না, সে যে কোন চেষ্টাকৃত রচনাকেই দীর্ঘকাল সরস রাখতে পারবে এমন আশা করা বিড়ম্বনা। রসনায় যার রুচি

মরেচে চিরদিনের অন্নে সে তৃপ্তি পায় না, সেই একই কারণে কোন একটা আজগবি অন্নেও সে চিরদিন রস পাবে এমন সম্ভাবনা নেই।

আজ সত্তর বছর বয়সে সাধারণের কাছে আমার পরিচয় একটা পরিণামে এসেছে। তাই আশা করি যাঁরা আমাকে জানবার কিছুমাত্র চেষ্টা করেচেন এতদিনে অন্তত তাঁরা একথা জেনেচেন যে, আমি জীর্ণ জগতে জন্মগ্রহণ করিনি। আমি চোখ মেলে যা দেখলুম চোখ আমার কখনো তাতে ক্লান্ত হোল না, বিস্ময়ের অন্ত পাই নি। চরাচরকে বেষ্টন ক'রে অনাদিকালের যে অনাহতবাণী অনন্তকালের অভিমুখে ধ্বনিত তাকে আমার মনপ্রাণ সাড়া দিয়েচে, মনে হয়েচে যুগে যুগে এই বিশ্ববাণী শুনে এলুম। সৌরমণ্ডলীর প্রান্তে এই আমাদের ছোট শ্যামলা পৃথিবীকে ঋতুর আকাশ-দূতগুলি বিচিত্ররসের বর্ণসজ্জায় সাজিয়ে দিয়ে যায়, এই আদরের অনুষ্ঠানে আমার হৃদয়ের অভিষেকবারি নিয়ে যোগ দিতে কোনদিন আলস্য করিনি। প্রতিদিন উষাকালে অন্ধকার রাত্রির প্রান্তে স্তব্ধ হ'য়ে দাঁড়িয়েচি এই কথাটি উপলব্ধি করবার জন্যে যে, যত্তে রূপং কল্যাণতমং তত্তে পশ্যামি। আমি সেই বিরাট সত্তাকে আমার অনুভব স্পর্শ করতে চেয়েচি যিনি সকল সত্তার আত্মীয় সম্বন্ধের ঐক্যতত্ত্ব, যাঁর খুসিতেই নিরন্তর অসংখ্যরূপের প্রকাশে বিচিত্রভাবে আমার প্রাণ খুসি হ'য়ে উঠচে—ব'লে উঠচে কোহ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ। যাতে কোন প্রয়োজন নেই তাও আনন্দের টানে টানবে এই অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপারের চরম অর্থ যাঁর মধ্যে যিনি অন্তরে অন্তরে মানুষকে পরিপূর্ণ ক'রে বিদ্যমান বলেই প্রাণপণ কঠোর আত্মত্যাগকে আমরা আত্মঘাতী পাগলের পাগলামি ব'লে হেসে উঠলুম না।

যাঁর লাগি রাত্রি অন্ধকারে
চলেছে মানবযাত্রী যুগ হ'তে যুগান্তর পানে।
যাঁর লাগি
রাজপুত্র পরিয়াছে ছিন্ন কন্থা, বিষয়ে বিরাগী
পথের ভিক্ষুক, মহাপ্রাণ সহিয়াছে পলে পলে
সংসারের ক্ষুদ্র উৎপীড়ন, তুচ্ছের কুৎসার তলে
প্রত্যহের বীভৎসতা।
যাঁর পদে মানী সঁপিয়াছে মান

ধনী সঁপিয়াছে ধন, বীর সঁপিয়াছে আত্মপ্রাণ,
যাঁহারি উদ্দেশে কবি বিরচিয়া লক্ষ লক্ষ গান
ছড়াইছে দেশে দেশে।

ঈশোপনিষদের প্রথম যে মন্ত্রে পিতৃদেব দীক্ষা পেয়েছিলেন, সেই মন্ত্রটি বার বার নতুন নতুন অর্থ নিয়ে আমার মনে আন্দোলিত হয়েচে, বারবার নিজেকে বলেচি—তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ, মা গৃধঃ, আনন্দ করো তাই নিয়ে যা তোমার কাছে সহজে এসেচে, যা রয়েচে তোমার চারিদিকে, তারি মধ্যে চিরন্তন লোভ করো না। কাব্য-সাধনায় এই মন্ত্র মহামূল্য। আসক্তি যাকে মাকড়সার মতো জালে জড়ায় তাকে জীর্ণ ক'রে দেয়, তাতে গ্লানি আসে, ক্লান্তি আনে। কেননা আসক্তি তাকে সমগ্র থেকে উৎপাটন ক'রে নিজের সীমার মধ্যে বাঁধে—তার পরে তোলা ফুলের মতো অল্পক্ষণেই সে ম্লান হয়। মহৎ সাহিত্য ভোগকে লোভ থেকে উদ্ধার করে, সৌন্দর্য্যকে আসক্তি থেকে, চিত্তকে উপস্থিত গরজের দণ্ডধারীদের কাছ থেকে। রাবণের ঘরে সীতা লোভের দ্বারা বন্দী, রামের ঘরে সীতা প্রেমের দ্বারা মুক্ত, সেইখানেই তাঁর সত্যপ্রকাশ। প্রেমের কাছে দেহের অপরূপ রূপ প্রকাশ পায়, লোভের কাছে তার স্থূল মাংস।

অনেকদিন থেকেই লিখে আসছি, জীবনের নানা পর্ব্বে নানা অবস্থায়। সুরু করেচি কাঁচা বয়সে—তখনো নিজেকে বুঝিনি। তাই আমার লেখার মধ্যে বাহুল্য এবং বর্জ্জনীয় জিনিষ ভূরি ভূরি আছে তাতে সন্দেহ নেই। এ সমস্ত আবর্জ্জনা বাদ দিয়ে বাকি যা থাকে আশা করি তার মধ্যে এই ঘোষণাটি স্পষ্ট যে, আমি ভালোবেসেচি এই জগৎকে, আমি প্রণাম করেচি মহৎকে, আমি কামনা করেচি মুক্তিকে, যে মুক্তি পরম পুরুষের কাছে আত্মনিবেদনে, আমি বিশ্বাস করেচি যে মানুষের সত্য মহামানবের মধ্যে, যিনি সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ।

১১ই পৌষ ১৩৩৮ সালে কবির সত্তর বৎসর পূর্তি উপলক্ষে রবীন্দ্রজয়ন্তীতে আয়োজিত প্রদত্ত ভাষণের অংশবিশেষ।

বিশ্বভারতীর সৌজন্যে প্রকাশিত।

রবিকাকা ও সবুজপত্র

ইন্দিরাদেবী চৌধুরানী

আমরা তখন বালীগঞ্জ ব্রাইট ষ্ট্রীটের বাসায় থাকি।

মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় ও উনি[১] রবিকাকার কাছে প্রস্তাব করলেন যে একটি কাগজ বার করবেন এবং সেই পত্রিকাতে রবিকাকাকে নিয়মিত লিখতে হবে। আমাদের বাসায় তখন অনেকে আসতেন, সাহিত্যের নিয়মিত আড্ডা বসত। রবিকাকা প্রথমে কিছুতেই রাজী হলেন না। বললেন, লিখে আর কি হবে, অনেক তো লিখেছি। এবার আমাকে ছুটি দাও। মণিলাল কিছুতেই ছাড়লেননা। মণিলালের নিজের একটি কাগজ ছিল। সেই কাগজটিকে নতুন আকারে নতুন ভাবে প্রকাশ করবেন, উনি সম্পাদক থাকবেন এমন স্থির হ'ল। অবশেষে রবিকাকা রাজী হলেন, বললেন, আচ্ছা লিখব। রবিকাকার লেখা নিয়ে কাগজ বেরুল, সবুজপত্র। বাংলা দেশে সেই কাগজ দীর্ঘদিন অবশ্য চলেনি। কিন্তু সাহিত্যিকদের কাছে তা একটি অবিস্মরণীয় ঘটনা।

দিন রাত্রি কাগজের কাজ চললো। সুরেশ চক্রবর্তী, এখন যিনি পণ্ডিচেরীতে আছেন, কাগজ চালাতে সাহায্য করলেন। মণিলাল দেখতে থাকলেন ব্যবসায়ী দিক আর উনি কাগজের সম্পাদকীয় দায়িত্ব ঘাড়ে নিলেন।

রবিকাকার লেখা প্রতিবার বেরুতে লাগলো। বাংলা গদ্য এক নতুন চেহারা নিল। নানা বিতর্ক উঠল নানা পত্রিকায়—একটা ভয়ানক আলোড়ন চারিদিকে। কিন্তু ওরা কেউ টললেন না। রবিকাকারও উৎসাহ বেড়ে গেল—একটা যেন জিদ চেপে গেল সবাইকার। প্রাচীনপন্থীরা একদিকে বিভিন্ন পত্রিকায় এদের গদ্যরচনার নমুনা নিয়ে নানা আক্রমণ চালাতে সুরু করলেন। রবিকাকা অবশেষে নেতৃস্থানীয় পদ অধিকার করলেন। তাঁরই নেতৃত্বে ও উৎসাহে সবুজপত্রের দল অনমনীয় মনোভাব নিয়ে পত্রিকা চালাতে লাগলেন।

---

১ প্রমথ চৌধুরী

ক্রমে ক্রমে নতুন লেখকদের ভীড় জমতে লাগল, অতুল গুপ্ত, ধূর্জটিপ্রসাদ, সবচেয়ে তরুণ অন্নদাশঙ্কর এরা এসে সবুজপত্রের পাতায় তারুণ্যের স্বাক্ষর রাখলেন।

সবুজপত্রের আর একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হ'ল এর সাপ্তাহিক বৈঠক।[২] সেই বৈঠকে সবাই যোগ দিতেন, রবিকাকা অবশ্য প্রতি সপ্তাহে আসতেননা, তবে মাঝে মাঝে উৎসব অনুষ্ঠানে আসতেন—সেদিন হাসিতে গানেতে, উৎসবে আনন্দে ব্রাইট ষ্ট্রীটের বাড়ী ঝলমল করে উঠত।

একবার নাটোরের জগদিন্দ্রনাথ উপস্থিত ছিলেন। পিয়ানোর সঙ্গে আমরা সকলে রবিকাকার গান 'শ্রাবণের ধারার মত পড়ুক ঝরে তোমার এ সুরটি আমার' গাইলাম। পরে বেহাগ সুরে রচিত 'আমার এ সুখের পরে বুকের পরে' গানটিও গাওয়া হোল। জগদিন্দ্রনাথ খোল, পাখোয়াজ বাজাতে জানতেন খুব ভাল। সেদিন তিনি নিস্তব্ধ হয়ে গান শুনলেন। গানের শেষে বলে উঠলেন এমন গান কখনো শুনিনি। রবিবাবু যদি নোবেল প্রাইজ সমস্ত গীতাঞ্জলি বইটির জন্য পেলেন, এই দুটি গানের জন্যই তাকে আর একবার নোবেল প্রাইজ দেওয়া উচিত ছিল।

'সবুজপত্র' কিছুদিন চলে বন্ধ হয়ে গেল, আবার কয়েকবছর বাদে বেরুল—কিন্তু সেই উৎসাহ আর ছিলনা। রবিকাকা অবশ্য শেষ অবধি উৎসাহ দিয়েছেন। আমার যতদূর মনে হয়, উনি শ্রান্ত ও অবসন্ন বোধ করছিলেন, তাছাড়া অর্থেরও একটা বড় সমস্যা দেখা দিল। কাগজ সত্যি সত্যি বন্ধ হয়ে গেল। কিন্তু যতদিন চলেছিল, রবিকাকার ব্যক্তিগত উৎসাহ ও অজস্র আনুকূল্য থেকে 'সবুজপত্র' কোনদিনও বঞ্চিত হয়নি।[৩]

---

২ পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়ের 'চলমান জীবন' দ্রষ্টব্য।

[বর্তমান রচনাটি শ্রীমতী ইন্দিরাদেবী চৌধুরানীর শেষ রচনা। উত্তরসূরী 'কার্তিক ১৩৬৭' সংখ্যায় তার আর একটি লেখা আমরা প্রকাশ করেছি। এ দুটি রচনাই তিনি ব্যক্তিগতভাবে আমাকে দিয়েছিলেন 'রবীন্দ্রস্মৃতি' উপলক্ষে নিবেদন স্বরূপ। স. উত্তরসূরী]

৩ 'সবুজপত্র' প্রকাশের আংশিক ইতিহাস সুধীন্দ্রনাথ দত্তকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের চিঠিতে পাওয়া যাবে (পরিচয় ১ম বর্ষ ২য় সংখ্যা, কার্ত্তিক ১৩৩৮)

নবপ্রকাশিত 'পরিচয়' পত্রিকায় লেখবার জন্য রবীন্দ্রনাথকে আমন্ত্রণ জানালে সম্পাদক সুধীন্দ্রনাথকে তিনি দীর্ঘ চিঠি লেখেন। তার অংশবিশেষ প্রকাশিত হল :

বিশিষ্ট সাহিত্যকে অবলম্বন ক'রে একটি মাসিক পত্র প্রকাশের প্রস্তাব নিয়ে একদিন মণিলাল আমার কাছে এসেছিল। আমি জানতুম, এটা কঠিন কাজ,—আমার অন্য কর্ত্তব্যের উপর এটা চাপালে বোঝা দুঃসহ ভারী হবে তাই নিজে এ-দায় নিতে রাজি হলুম না। অথচ অত্যন্ত প্রয়োজন আছে একথা অনেকদিন ভেবেচি—তাই সংকল্পটাকে একেবারে নামঞ্জুর ক'রতে পারলুম না। নৌকো ভাসাবার জন্যে প্রথম ধাক্কাটা দিতে এবং কিছুদিনের জন্যে লগি ঠেল্‌তে রাজি হলুম। তখন বয়স এখনকার চেয়ে অল্প এবং সাহস এখনকার চেয়ে বেশি ছিল। প্রমথকে সম্পাদক ক'রতে পরামর্শ দিয়েছিলুম। কেননা যদিও তিনি পড়াশুনো ক'রেচেন আমাদের চেয়ে অনেক বেশি, তবু সংকলনের দ্বারা ঝুলি ভর্ত্তি করা মন তাঁর নয়। ভাবনা-সম্বন্ধে তাঁর নিজের মনের একটা স্বকীয় প্রবর্ত্তনা ও লেখবার সম্বন্ধে একটা স্বকীয় ছাঁদ আছে। সম্পাদকের এই গুণ থাকলে কাগজটা বেগবান হ'য়ে ওঠে। এই বেগ তাঁর সহযোগী লেখকদের মনকে ঠেলা দিয়ে তাঁদের চিত্তকে সতর্ক ও উদ্যমশীল ক'রে রাখতে পারে।

মণিলালের সঙ্গে প্রথম সর্ত্ত এই হোলো যে, যারা ওজন দরে বা গজের মাপে সাহিত্য-বিচার ক'রে তাদের জন্যে এ-কাগজ হবে না। সব লেখাই পয়লা নম্বরের হওয়া অসম্ভব, দ্বিতীয় শ্রেণীতেও ভিড় হয় না, অতএব আয়তন ছোটো করতেই হবে। গল্প না দিলে মরণং ধ্রুবং, তবু বাড়াবাড়ি বর্জ্জনীয়, অর্থাৎ গল্প স্বল্প হবে, এক গ্রাসে দুটো চারটে চলবে না। ছবি দেওয়া নিষেধ, বিজ্ঞাপনের বোঝাও পরিত্যাজ্য, তা'র মানে, মুনফার লোভ থেকে দৃষ্টি যথাসম্ভব ফিরিয়ে আনা চাই। লোকসান জিনিষটা কারো পক্ষে প্রার্থনীয় নয়, তা হোক্, ছোট আয়তনের কাগজে ছোটো আয়তনের লোকসান সাংঘাতিক হবে না এই ভেবে মনটাকে বেপরোয়া এবং কলমটাকে নিঃসঙ্কোচ রাখাই ভালো। মণিলাল রাজি হলেন, বল্‌লেন, এ-কাগজে ব্যবসার ছোঁয়াচ একটুও লাগবে না। লক্ষ্মী দেবী সকৌতুকে হাস্‌লেন কিন্তু ভ্রূকুটি ক'রলেন না।

বিনয় রক্ষা ক'রে সাবধানে কথা কওয়া শাস্ত্রবিহিত। আমরাই উঁচুদরের

লেখার আদর্শ প্রবর্ত্তন করবার জন্যে সংসারে এসেচি এই কথা সর্ব্বদা মনে রেখে লেখকীয় উচ্চ বর্ণের ছুঁৎমার্গ অবলম্বন ক'রে চলার ভঙ্গীটাকে ইংরেজীতে বলে হাই-ব্রাউয়িজ্‌ম্‌, উঁচু-কপালেগিরি। এটা ভালো নয়,—তাই ব'লে নত-চক্ষু অতি-নম্র ছদ্ম বিনিময়ের আত্মলাঘবভঙ্গীটা মাটির মানুষের লক্ষণ ব'লে সাধারণ্যে প্রশংসিত হ'লেও সেটাকে পরিহার করা চাই। আমাদের মধ্যে পরিমাণ কার কত তা নিয়ে নিজের মনে বা পরের কানে কথা তুলতে গেলে অত্যুক্তি এসে পড়বে। কিন্তু একথা বলতে দোষ নেই, যে, যার যত শক্তি থাক্ তা'র উপযুক্ত প্রকাশের জন্যে বাইরের দাবীটা একটা মস্ত প্রেরণা। আকাশে আষাঢ়ের সজল মেঘ ফিরে ফিরে আসে অথচ পৃথিবীর হাওয়ায় রসের অভ্যর্থনা নেই—মেঘ অল্প স্বল্প জল ছিটিয়ে ছিটিয়ে চ'লে যায়, মাটি যথেষ্ট ভেজে না। দানের জল আষাঢ়ের কমণ্ডলুতে পুরো পরিমাণ আছে কিন্তু ধরবার অঞ্জলি ঠিক মতো ক'রে তুলে ধরা হয় নি ব'লে ঋতুর দানসত্র ব্যর্থ হ'য়ে গেল এমন ঘটনা বারবার ঘটে। সাহিত্যেও সে-কথা খাটে। মণিলালকে এই কথাটি ব'ললুম, "তুমি যে-কাগজ বের ক'রবে তাতে পাঠকদের দেবার বরাদ্দটাই বড়ো কথা নয়, লেখকদের উপর দাবীর কথাটা তা'র চেয়েও বড়ো কথা। সে-দাবী অর্থযোগে বা শব্দযোগে প্রবন্ধ চাওয়া নয়,—কাগজের চরিত্রের মধ্যেই সে-দাবী থাকবে। সে-চরিত্র অলক্ষিতে লেখককে উদ্বুদ্ধ ক'রে সাবধান করে, লেখায় অপরিচ্ছন্নতা, শৈথিল্য, চিন্তার দৈন্য আপনিই সঙ্কুচিত হয়, অন্তত আপন উত্তরীয়টাকে ধোপ দিয়ে না আনলে মান রক্ষা হয় না। তোমার পত্রিকার একটা চারিত্রবৈশিষ্ট্য থাকা চাই—অর্থাৎ অন্যের প্রতি নিজের ব্যবহারেও সে সৃষ্টি ক'রে তুলবে।"

অবশেষে 'সবুজপত্র' বাহির হোলো। এই পত্রকে প্রতিষ্ঠিত ক'রে তোলবার জন্যে কিছুকাল সাধ্যমতো চেষ্টা ক'রেছিলেন সে কথা তোমাদের জানা আছে। আশা ছিল ক্রমে আমার ভার লাঘব হবে এবং একদল নতুন লেখক নিজের শক্তিকে আবিষ্কার ক'রে নতুন উদ্যমে এ'কে এগিয়ে নিয়ে যাবে। দুজনে লগি ঠেলার জায়গায় পাঁচ-সাতজন দাঁড়ি জুটে গেলে তখন হাঁক ছাড়ব।

এই অধ্যবসায়ে অন্তত একজন ওস্তাদ লেখকের সাড়া পাওয়া গেল। তখন তাঁর নাম ছিল অজানা, আশা করি, এখন তাঁর নাম জানে এমন লোক খুঁজলে মেলে। তিনি শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গুপ্ত। তিনি নিজের চিত্তের জোরে

নিজেব মতো ক'বেই ভাবেন এবং স্বচ্ছন্দে সেটা স্বচ্ছ ক'রে প্রকাশ ক'বতে পাবেন। তিনি নতুন কালের নতুন লেখক তাতে সন্দেহ নেই, সেইজন্যেই তাঁকে বাইবেব নূতনত্বেব ভেক ধাবণ ক'বতে হয় নি, চিন্তাশক্তিব অন্তর্নিহিত সহজ নূতনত্ব নিয়েই তিনি নিশ্চিন্ত।

যাই হোক্ ভাব কম্‌ল না। সাময়িক কাগজেব বাঁধা ফর্‌মাস জুগিয়ে চলা সেকেলে ট্রামগাড়িব ঘোড়াব মতো দুঃখী জীবেব কাজ। মন ছুটি চাইল, ক্লান্তি হ'যে শেষকালে জবাব দিলুম। বন্ধ হোলো চিত্রবিহীন ফর্মাবিবল সবুজপত্র।

কিন্তু এ-ক্ষেত্রে ফর্মা গণনা ক'বে 'সবুজপত্রে'ব আয়ু নির্ণয় কোবো না। 'সবুজপত্র' বাংলা ভাষাব মোড় ফিবিয়ে দিয়ে গেল। এ-জন্যে যে-সাহস যে-কৃতিত্ব প্রকাশ পেয়েচে তা'ব সম্পূর্ণ গৌবব একা প্রমথনাথেব। এব পূর্ব্বে সাহিত্যে চলতি ভাষাব প্রবেশ একেবারে ছিল না তা নয় কিন্তু সে ছিল খিড়কিব বাস্তায় অন্দবমহলে। অবগুণ্ঠন খুলে ফেলে সদবেব সভায় এখন সে যে-প্রশস্ত আসন নিয়েচে সেটা আজকাল তকমা-পবা চোপদাবেবও চোখে পড়ে না। এ নিয়ে তর্কবিতর্ক বিবাদ বিদ্রূপ যথেষ্ট হ'যে গেছে কিন্তু শুধু যুক্তিতর্কেব দ্বাবা এ-সব জিনিসেব যাথার্থ প্রমাণ হয় না। একবাব যেম্‌নি একে আত্মপ্রমাণেব অবকাশ দেওয়া গেছে, অম্‌নি আপন সহজ প্রাণশক্তিব জোবেই সমস্ত বাঁধা আল ডিঙিয়ে আজ বাংলা সাহিত্যেব ক্ষেত্রে সে আপন দখল কেবলি এগিয়ে নিয়ে চলেছে। তা'ব কাবণ, এটা জবব দখল নয়, এই দখলেব দলিল ছিল তা'ব নিজেব স্বভাবেব মধ্যেই।

রবীন্দ্রপ্রতিভার নেপথ্যভূমি

কানাই সামন্ত

রবীন্দ্রপ্রতিভার নেপথ্যভূমি। তেমনি কারুক্ষেত্রও বলা চলে, কারু শব্দটি যদি সুপ্রচলিত অর্থে ব্যবহার করি। কেননা কবি স্বয়ং বলেছেন—

আপন-মনে গোপন কোণে   লেখাজোখার কারখানাতে
দুয়ার রুধে বচন কুঁদে   খেলনা আমায় হয় বানাতে।
এই জগতের সকাল সাঁজে   ছুটি আমার সকল কাজে,
মিলে মিলে মিলিয়ে কথা   রঙে রঙে হয় মানাতে।

সরলহৃদয় পাঠককে অবশ্য বলা দরকার, কবি-অত্যুক্তির প্রচুর পরিচয় যদি বা যত্র তত্র পেয়ে থাকেন, এখানে যার-পর-নেই ঊনোক্তি হয়েছে সে যেন খেয়াল রাখেন।

কে গো আছে ভুবনমাঝে   নিত্যশিশু আনন্দেতে,
ডাকে আমায় বিশ্বখেলায়   খেলাঘরের জোগান দিতে

এ কথা সত্য। তবু এটাই সব সত্য নয় যে, কথার সঙ্গে কথা মিলিয়ে, তুলি ধরে বিচিত্র লেখাজোখা এঁকে আর রঙ চড়িয়ে কবিপ্রতিভা নিষ্কৃতি পেয়েছে। কবির সাধনা আরও ব্যাপক, বিশাল, নিগূঢ়, সিদ্ধি আরও শত দিকে শত ভাবেই চমৎকারজনক, আর, কবি রবীন্দ্রনাথ জীবনের সকাল-সাঁজে কবিতা লেখা ও গান রচনা ছাড়া অন্য সকল কাজেই ছুটি চেয়েছিলেন অথবা পেয়েছিলেন এটাও নিতান্তই অবিশ্বাস্য কাহিনী। কোনো মহর্ষি সহস্র জনের অন্নপান আত্মসাৎ করে বলেছিলেন শুনতে পাই—'আজ তো আমার নিরম্বু উপবাস', এ দেখি সেই প্রকার। হাজারো কাজের সঙ্গে সঙ্গেই অবাধ ছুটি থেকে থাকে তো আলাদা কথা, নইলে, সারা জীবনে সহস্র মানুষের কাজই করে গেছেন তিনি আর ঘটিয়ে তুলেছেন আরও লক্ষ লোকের করণীয়। সে-সবের বহুশ্রমসাধ্য খতিয়ানে আমরা প্রবৃত্ত হই নি এখানে। আমরা স্রষ্টাকে দেখব শুধু তাঁর সৃজনক্ষেত্রে, রবীন্দ্রকল্পলোকের কুশীলবরূপী কত কথা, কত কল্পনা, কত ভাব, কত চিত্র ও চরিত্র— সাজঘরের

রবীন্দ্রনাথের পাণ্ডুলিপি

পর্দাটি ঈষৎ সরিয়ে চকিতে একবার দেখে নেব তাদেরই কয়েক জনকে কিছুবা অপ্রস্তুত অসজ্জিত বেশে, সহজ অথচ শোভন স্বরূপে। তবু সত্যকার চেনা-পরিচয় হবে কি না নিশ্চিত বলা যায় না. কেননা চুরি ক'রে বা সুপারিশ সংগ্রহ ক'রে সজন নেপথ্যে ঢুকে পড়া এক কথা, আর সঙ্গে সঙ্গেই একক স্রষ্টার অন্তর্লোকেও পৌঁছে যাওয়া আর এক কথা। যথার্থ কবিপ্রতিভা একপ্রকার open secret বলা চলে —খুলে-বলা হেঁয়ালি। 'যত জানি তত জানি নে', শেষ পর্যন্তই রহস্যময়তা তার দূর হবার নয়।

২

কবির স্বহস্তে লেখা যে কবিতার খাতা প্রথম হাতে তুলে দেখি সে হল—'মানসী'। তার মলাটের ভিতর পিঠে লেখা ছিল *Think not bitterly of me*। কবির পূর্ণপরিণত ইংরেজি হাতের লেখার সঙ্গে মেলে না হয়তো, তাৎকালিক ছাঁদে ধ'রে ধ'রে লেখা. আর এটি কোনো উদ্ধৃতি কি না তাও নিশ্চিতভাবে বলতে পারি নে— তবে, তরুণ কবির ভাবোচ্ছলিত স্নেহ-প্রেম-আনন্দ-বেদনা-বিদ্ধ হৃদয়েরই নিখুঁত প্রতিচ্ছবি নয় যে তাই বা কেমন করে বলি? বস্তুতঃ মানসবাসিনী বীণাপাণির সুরে ছন্দে সে দিন যিনি লিখেছিলেন—

কে আমারে যেন এনেছে ডাকিয়া, এসেছি ভুলে

অথবা—

তোমারেই যেন ভালোবাসিয়াছি যুগে যুগে অনিবার

তাঁরই কবিমানসের চকিত একটি ছবি দেখি যেন ঐ ক'টি সহজ সরল কথায়। প্রসঙ্গক্রমে মনে পড়ে আমার পিতৃপ্রতিম এক বন্ধুর কাছে শুনেছি, তরুণ কবির প্রথমোক্ত ঐ কবিতা যখন প্রথম প্রকাশিত হয় আর তাঁরও তরুণতর বয়সে ওর প্রথম রসাস্বাদন করেন, মনে এমন একটি ভাবের ঘোর লেগেছিল, সুখ-না-দুঃখের অনির্বচনীয় একটি আমেজ, যে, সে নেশা সপ্তাহে বা পক্ষকালেও এতটুকু ফিকে হয়ে যায় নি। হায়, রসজ্ঞতা-অভিমানী আমাদের কাব্য-সম্ভোগও এমন নিবিড় গভীর বা সুস্থির এ কথা হলপ করে বলা যায় না। আমরা অক্ষর দেখি তো কথা দেখি নে, কথা দেখি তো কথার অন্তর্লীন ছন্দস্পন্দে হৃদয় দুলে ওঠে না, আর ভাব ভাষা তত্ত্ব তথ্য সব-কিছুই যদি বা অনুধাবন করি— সমুদয় কবিতাটির যুগপৎ আধার ও আধেয় -স্বরূপ যে রসাত্মা

তার কি কোনো উপলব্ধি ঘটে? ঘটলেও, সে বোধ কতই আবৃত, অগভীর ও ক্ষণস্থায়ী।

'মানসী'র খাতাটি হাতে তুলে নিয়ে মনে হল, এ মুহূর্তে আমার মনের ভাবটি কথঞ্চিৎ ব্যক্ত করতে হলে চন্দনপিঁড়ির উপর এই অমূল্য পুঁথিখানি রেখে, শতদলসম্ভারে ও গোলাপ-চাঁপা-চন্দ্রমল্লিকায় সাজিয়ে, ধূপ গুগ্‌গুল জ্বেলে, সামনে ভূলুণ্ঠিত হয়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত ভিন্ন কী আর করতে পারি। কিন্তু, শিক্ষিত সজ্জন মাত্রেই সেটা অতিভক্তির বাড়াবাড়ি ব'লেই গণ্য করবেন আর আমারও স্বভাবে সৎসাহস পদার্থটি অল্প, তাই শুধু পাতার পর পাতা উল্‌টিয়ে বহুক্ষণ ঐ খাতাখানি দেখেছি, পরে বহুবার দেখেছি এবং হয়তো কখনো নিজেরই অজ্ঞাতসারে দীর্ঘশ্বাস ফেলে মনে মনে বলে থাকব— হায় রে সেদিন হায় রে। যে কবিযুবার ঘনিষ্ঠ করস্পর্শ রয়েছে এই পাণ্ডুলিপির প্রত্যেক পৃষ্ঠায়, ভাববৈদ্যুতীময় সমুদয় সত্তারই স্পর্শ, কোথা সেই কবি, যৌবনবেদনারসে-উচ্ছল কোথা সেই দিনগুলি— কালের অধীশ্বর অন্যমনে ভুলে না গেলেও, আপনাতে তবু সংহরণ করে নিয়েছেন। সেই তাঁর লীলা, সেই হল পার্থিব জীবনের অবশ্যম্ভাবী পরিণাম। হাতের লেখাতেই ব্যক্তির সত্যপরিচয়— অশরীরী হলেও, কোনো একটি স্থগিত মুহূর্তের সম্পূর্ণ পরিচয়। ব্যবহৃত তৈজসপত্রে পোশাকে, চিত্রে বা মূর্তিতে, চিরচলিষ্ণু চির-পরিণামী ব্যক্তিসত্তার এতখানি পরিচয় ধরা থাকে না। ফোটোগ্রাফে একটি নিমেষের নির্ভুল সাক্ষ্য বর্তমান সন্দেহ নেই, কিন্তু সে তো শুধু মায়াময় কায়ারই ছবি, উজ্জ্বলস্মিত চক্ষুতারায়-তারায় অজ্ঞাত অপঠিত স্বাক্ষর— অন্তঃ-পুরুষের সেই ইঙ্গিতময় মূক ভাষা কে বা বুঝতে পারে। অথচ, হাতের লেখার প্রত্যেক রেখায় রেখায়, সাবলীল ভঙ্গীতে, দৃঢ়তায় বা আকম্পনে, এমনকি চ্যুতিবিচ্যুতিতেও, মানুষের মন কথা কয়, জীবজীবনের নিগূঢ় কাহিনী লিপিবদ্ধ হয় তৎকালীন সুখদুঃখের আর চিরকালীন আশাস্বপ্নের নিশ্চিত ব্যঞ্জনা ফোটে, মরতায় নিহিত যা কিছু অমরতার বীজ সেও অঙ্কুরিত হয়ে ওঠে— তেমন তেমন ক্ষেত্রে তার কোনো ক্ষয় নেই, লয় হতে পারে না। এই খাতার পাতায় এই মুক্তাপংক্তিসদৃশ অক্ষরগুলি লেখার আবেগে শুধু কি কলম ছুঁয়েছে কাগজ? কালো কালীর ধারা বয়ে গেছে রেখার প্রবাহে? না, মানুষের মনই ছুঁয়েছে কাগজ, সাকার সচেতন হয়ে

উঠেছে পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠায়। কাগজ কালী কলম উপলক্ষ্য মাত্র, তেমন ভাবের আবেশে, একান্ত তন্ময়তায়, তাদের সকল অস্তিত্ব লীন হয়ে গেছে অন্য এক 'অস্তি'তে, সেটি হল ব্যক্তির আসল সত্তা, চেতনসত্তা। কাগজ কলম কালী কিছু নয়, এমন-কি ভাব ভাষাও গৌণ। এগুলি সেই অপরূপ বস্তুরই আধার যাকে ধরে রাখার কোনো সম্ভাবনা ছিল আদিম মানুষের স্বপ্নঅগোচর। বিজ্ঞানের প্রসাদে আজ মানুষের কণ্ঠস্বর ধরে রাখা যায় নিখুঁত ভাবে। সে বড়ো আশ্চর্য সন্দেহ নেই, কিন্তু একটি যান্ত্রিক প্রক্রিয়ার লক্ষ্যগোচর বাধা থাকেই বক্তা ও শ্রোতার মধ্যে। হাতের লেখার মতো এমন সহজ সাবলীল নয়, আত্মবিস্মৃত আত্মসৃষ্টির এবং সেটি গ্রহণের এমন অবাধ সুযোগ সেখানে নেই।

হাতের লেখা নিয়ে বর্তমান লেখকের অসীম বিস্ময় বা শ্রদ্ধা জানি না কতখানি ব্যক্ত হল। এটুকু ভাবলেই চলবে-- আজ যদি কোনো অভূতপূর্ব উপায়ে বুদ্ধ বা খৃষ্টের, ব্যাস-বাল্মীকি অথবা কৃষ্ণার্জুনের হস্তলিপি কেউ আবিষ্কার করে, কী পর্যন্ত পুলক ও বিস্ময়ের সৃষ্টি হবে। কতখানি সম্ভ্রমে ও সমাদরে মানুষ তা রক্ষা করবে। হয়তো নূতন মঠ বা মন্দির উঠবে তাকে ঘিরে। যদিও বুদ্ধ খৃষ্ট ব্যাস ও বাল্মীকির জীবনবেদ ও বাণী অন্য আকারে আজও ভাগ্যবান জনের ভোগ্য হয়ে নেই এমন নয়।

বহু দেশে বহু যুগ ধরে গুণীর হাতের লেখার বা লেখাঙ্কনের মান ও মর্যাদা তাই শ্রেষ্ঠ শিল্পীর হাতে আঁকা উৎকৃষ্ট চিত্রকৃতির সমানই মনে করা হয়। লেখশিল্পীগণ নৈষ্ঠিক পূজার্চনার মতোই সংযত পবিত্র চিত্তে এর চর্চা করেন— বীর না হলে অভয় বাক্ ফুটে ওঠে না রেখায় রেখায়, মহাপুরুষ হলেই মহত্ত্বের ব্যঞ্জনা ফোটে শব্দের অর্থে শুধু নয়, লিপিবদ্ধ আকারে, এ তাঁরা নিশ্চিত জানেন। প্রসঙ্গক্রমে বলি, এক বিদুষী পাশ্চাত্য মহিলা সারাজীবন কাটিয়েছিলেন দেশবিদেশের উৎকৃষ্ট 'লেখা'র সংগ্রহে ও গুণগ্রাহিতায়। রবীন্দ্রনাথের সুশ্রী সুগঠিত ও সচ্ছন্দপ্রবাহিত হস্তলিপি তিনি যেদিন প্রথম চোখে দেখলেন, বিস্তারিত বিচার বিশ্লেষণের পূর্বেই একেবারে অ-বাক্ অভিভূত হয়ে পড়লেন, অশ্রুপূর্ণ হয়ে উঠল তাঁর মুগ্ধ দুটি চক্ষু। সেটি বাংলা অথবা ইংরেজি লেখা ছিল জানি না, তেমনি আমাদের জানা নেই ঐ ভাষায় তাঁর অক্ষরপরিচয় ছিল কতদূর।

লেখা সম্পর্কে আমরা বিশেষবিৎ নই, সুতরাং এ প্রসঙ্গে আর অধিক আলোচনা না'ই করা গেল। তবু আরও একটি কথা মনে উদয় হচ্ছে। রবীন্দ্রনাথের হাতের লেখার শোভন সচ্ছন্দ অনুকরণ হয়েছে প্রচুর। তাঁরই নিকটে থেকে সময়ে সময়ে তাঁর লেখার 'কপি' প্রস্তুত করেছেন অন্য, বিশেষত: কবির প্রাচীন বয়সে— অসতর্ক পাঠক সেই হস্তলিপি রবীন্দ্রনাথের ভেবেই ভ্রান্ত হবেন। অথচ সূক্ষ্ম তফাত অবশ্যই আছে। যে ক্ষেত্রে নকলকারীর অক্ষরগুলি নিটোল, নিখুঁত, কবির হয়তো তেমন নয়— যেন রসে-পরিপূর্ণ এক-একটি ফলের মতো, কোথাও কোথাও ররং টোল খেয়েছে অলক্ষ্য বোঁটায় লেগে আছে আলতো ভাবে।

৩

'আমার বয়স তখন সাত-আট বছরের বেশি হইবে না। আমার এক ভাগিনেয় আমার চেয়ে বয়সে একটু বড়ো একদিন দুপুরবেলা তাঁহার ঘরে ডাকিয়া লইয়া বলিলেন, তোমাকে পদ্য লিখিতে হইবে। কোনো-একটি কর্মচারীর কৃপায় একখানি নীল কাগজের খাতা যোগাড় করিলাম। তাহাতে স্বহস্তে পেন্সিল দিয়া কতকগুলা অসমান লাইন কাটিয়া বড়ো বড়ো কাঁচা অক্ষরে পদ্য লিখিতে শুরু করিয়া দিলাম।' এই হল কবির অন্যূন সপ্ততিবর্ষ-ব্যাপী গান ও কবিতা রচনার প্রথম সূত্রপাত, অবিচ্ছিন্ন অক্লান্ত সাহিত্যসাধনার প্রথম সোপান। 'ক্ষ্যাপা খুঁজে খুঁজে ফিরে পরশপাথর'— তেমনিভাবে পাঁতি পাঁতি করে খুঁজেও বন্ধুবর পুলিন সেন বা ক্ষিতীশ রায় এ খাতাখানি আজও আবিষ্কার করতে পারেন নি। অজস্র সোনার ফসল সঞ্চিত হয়েছে স্বদেশের গোলায়, কিন্তু সোনার তরীর প্রথম খেয়ার প্রথম ক্ষেপণীপাতে মানসসরসে লহরী উঠেছিল কোন্ মাসের কোন্ তারিখে কোন্ লগ্নে সেটি জানা যায় নি। আরও কিছু পরের ঘটনা নিয়ে জীবনস্মৃতি গ্রন্থে কবি বলেন, 'ইতিমধ্যে সেই ছিন্নবিচ্ছিন্ন নীল খাতাটি বিদায় করিয়া একখানা বাঁধানো লেট্স্ ডায়ারি সংগ্রহ করিয়াছিলাম। শুধু কবিতা লেখা নহে, নিজের কল্পনার সম্মুখে নিজেকে কবি বলিয়া খাড়া করিবার জন্য একটা চেষ্টা জন্মিয়াছে। বোলপুরে বাগানের প্রান্তে একটি শিশু নারিকেল গাছের তলায় মাটিতে পা ছড়াইয়া বসিয়া খাতা ভরাইতে ভালোবাসিতাম। এটাকে বেশ কবিজনোচিত বলিয়া

বোধ হইত। তৃণহীন কঙ্করশয্যায় বসিয়া রৌদ্রের উত্তাপে 'পৃথ্বীরাজের পরাজয়' বলিয়া একটা বীররসাত্মক কাব্য লিখিয়াছিলাম। প্রচুর বীররসেও উক্ত কাব্যটাকে বিনাশের হাত হইতে রক্ষা করিতে পারে নাই। লেট্‌স ডায়ারিটিও জ্যেষ্ঠা সহোদরা নীলখাতাটির অনুসরণ করিয়া কোথায় গিয়াছে তাহার ঠিকানা কাহারও কাছে রাখিয়া যায় নাই।'

ডায়ারিটা পাওয়া না গেলেও সুধীজন মনে করেন, 'পৃথ্বীরাজ পরাজয়' কাব্যই ভাবান্তরে ও রূপান্তরে 'রুদ্রচণ্ড' নাটিকা আকারে বর্তমান। বালক কবির প্রথম কাব্যকৃতির এই পুনর্জন্মলাভের পূর্বেই আরও বহু কাব্যই মুদ্রিত হয়েছে সত্য— বনফুল, কবিকাহিনী, বাল্মীকিপ্রতিভা ও ভগ্নহৃদয়। এগুলির রসাস্বাদন আজও সম্ভবপর, কোনো কোনো পাণ্ডুলিপি হয়তো রবীন্দ্রসদনে সংগৃহীত হয়ে থাকতে পারে। ঠিক জানি না। এটুকু জানি— একটি পুঁথি দিয়েছেন শ্রীমতী মালতী সেন, 'মালতী পুঁথি' ব'লেই এটি সহজ পরিচিতি অর্জন করেছে। এটির থেকে পুরাতন কবির কোনো কবিতার খাতা আজও আমাদের চোখে পড়ে নি। খাতাটি কত পুরাতন তারই প্রমাণস্বরূপে উল্লেখ করা যায়— ১২৮৪ অগ্রহায়ণের 'ভারতী'তে মুদ্রিত 'ঝাসীর বাণী' নীজাকারে এই পুঁথিতে নিবদ্ধ। হাতের লেখা, অবশ্য, রবীন্দ্রনাথের কিনা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না। এটির 'প্রেরণা'য় ভারতীর প্রবন্ধটি যে অনধিক সোনো বছর বয়সে রবীন্দ্রনাথ লেখেন তার প্রমাণ আছে সেই লেখার ভাবে ভাষায় ও প্রবন্ধশেষে মুদ্রিত 'ভ' অক্ষরে, যেটি ভানুসিংহ ঠাকুরের জ্ঞাপক মনে করা যেতে পারে। মালতী-পুঁথিতে মেঘনাদবধ কাব্যের প্রসঙ্গ আছে, তেমনি আছে ইউনাইটেড স্টেট্‌স্'এ নিগ্রোদের শিক্ষাধিকারের আলোচনা। জীবন-স্মৃতির 'ঘরের পড়া' অধ্যায়ে কবি যে সময়ের উল্লেখ করেছেন তারই কিছু কিছু লুপ্তাবশিষ্ট চিহ্ন এগুলিকে সহজেই মনে করা যেতে পারে। এ বিশ্বাস আরও দৃঢ়ীকৃত হয় যখন দেখি কবির সুন্দর সচ্ছন্দ হাতের লেখায় কুমারসম্ভব কাব্যের অংশবিশেষের অনুবাদ। পিতৃদেবের সঙ্গে কিছুকাল হিমালয়-বাসের পর, গৃহপ্রত্যাগত বালককে স্কুলের আটঘাট-বাঁধা পড়াশুনার মধ্যে ধরে রাখা যখন উত্তরোত্তর কঠিন হয়ে উঠল, জ্ঞানচন্দ্র ভট্টাচার্য ছিলেন কবির গৃহশিক্ষক, নিরুপায়ের উপায় হিসাবে তিনি এক দিকে কুমারসম্ভব আর অন্য দিকে ম্যাক্‌বেথ নাটক রবীন্দ্রনাথকে বাংলায় অর্থ করে পড়াতে লাগলেন। আর,

কুমারসম্ভবের অনেকটা না হলেও, ম্যাকৃবেথের সবটাই রবীন্দ্রনাথকে দিয়ে কবিতায় অনুবাদ করিয়ে নিলেন —এ কথা আজ আমাদের অবিদিত নেই। 'রবীন্দ্রজীবনী'কার বলেন খৃষ্টীয় ১৮৭৩ সনে জ্ঞানচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের গৃহশিক্ষক ছিলেন, আর বেশিদিন তিনি এই কাজে থাকেন নি। শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন মনে করেন ১৮৭৪ সনের শেষার্ধেই রবীন্দ্রনাথ পুরো ম্যাকৃবেথ এবং কুমারসম্ভবের তৃতীয় সর্গ থেকে মদনভস্মের কিছুটা প্রসঙ্গ কবিতায় অনুবাদ করেন। শেষোক্ত অনুবাদ মিলহীন চতুর্দশমাত্রার পয়ারে করা হয়েছিল। এই অনুবাদের থেকেই রূপান্তরিত একটি পাঠ পরে ভারতী পত্রিকার ১২৮৪ মাঘ সংখ্যায় মুদ্রিত হয়। মালতী পুঁথিতে রবীন্দ্রনাথের হাতের লেখায় রবীন্দ্রনাথের অনুবাদটি আছে (পৃ ৫-৬), তেমনি আছে পরিবর্তিত একটি পাঠ অন্যের হস্তাক্ষরে (পৃ ৪৩-৪৮)— ভালো করে মিলিয়ে দেখা যায় ভারতীর পাঠের থেকে এর খুব বেশি পার্থক্য নেই— হস্তাক্ষরের বিচারে ও ভাষার বিচারে অর্থাৎ বাহ্য এবং আভ্যন্তরীণ প্রমাণে, আমরা মনে করি যে, সম্ভবতঃ এটির রচয়িতা দ্বিজেন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথের অনুবাদটি সচ্ছন্দ, কিন্তু যথেষ্ট মূলানুগ নয়। এ জন্য দ্বিজেন্দ্রনাথ (?) যে রবীন্দ্রনাথের হাতের লেখার উপরেই সংশোধন করতে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন মালতীপুঁথির উল্লিখিত ৫-৬ পৃষ্ঠায় কিছু কিছু তার চিহ্ন নেই এমন নয়। অবশেষে সবটাই তিনি পুনর্লিখন করেন (পৃ ৪৩-৪৮) —এটিকে রবীন্দ্রনাথের অনুবাদ মনে করবার কারণ নেই। রবীন্দ্রনাথের নিজের অনুবাদটি এ পর্যন্ত জনসাধারণের কাছে অজ্ঞাত অপরিচিত আছে এজন্য পাণ্ডুলিপি স্থানে স্থানে ছিন্ন হলেও, যতটা পাঠ উদ্ধার করা যায় তাই আমরা এ স্থলে সংকলন করে দিচ্ছি। মালতী পুঁথি চোখে দেখলে তো বটেই, তা ছাড়া এটিকে নিয়ে মদনভস্মের মোট তিনটি পাঠ মিলিয়ে দেখলেই, যে-কোনো সুধী ব্যক্তি বুঝতে পারবেন, উপস্থিত আমরা কেন বা এটিকে (মালতী পুঁথি, পৃ ৫-৬) রবীন্দ্রনাথ-রচিত বলছি আর অন্য দুটিকে বলছি না।

[মদনভস্ম]

সময় লঙ্ঘন করি নায়ক তপন
উত্তর অয়ন যবে করিল আশ্রয়
দক্ষিণের দিক্‌বালা হেরিয়া তাহাই
ধীরে ধীরে ফেলিলেন বিষণ্ণ নিশ্বাস ।২৫
অমনি উঠিল ফুটি অশোকের ফুল,
অমনি পল্লবজালে ছাইল পাদপ। ২৬

নবীন পল্লব দিয়া রচি পক্ষগুলি
ভ্রমর-অক্ষরে লিখি মদনের নাম
নবচূতবাণচয় নির্মিল বসন্ত। ২৭
মনোহরবর্ণময় কর্ণিকার ফুল
ফুটিল, নাইক তাহে সুবাসের লেশ।
বিধাতা সকল গুণ দেন কি সবারে?২৮
মর্মর শবদ করি জীর্ণ পত্রগুলি
ফেলে ধীরে বনস্থলী বায়ুর পরশে,
মদোদ্ধত হরিণেরা করে বিচরণ
পিয়ালমঞ্জরী হ'তে রেণু ঝরি ঝরি
যাদের বিশাল আঁখি হয়েছে আকুল।৩১
যখন মদন বসি বনশ্রীর কোলে
পুষ্পশরে গুণ তার করিল বন্ধন
স্নেহরসে মগ্ন হল যত ছিল প্রাণী। ৩৫
একই কুসুমপাত্রে ভ্রমর প্রিয়ার
পীত-অবশেষ মধু করিল গো পান।
স্পর্শনিমীলিতচক্ষু মৃগীর শরীরে
কৃষ্ণসার শৃঙ্গ দিয়া করিল আদর। ৩৬
আধেক মৃণাল খেয়ে সুখে চক্রবাক
আধেক তুলিয়া দিল প্রিয়ার মুখেতে।
৩৭ শেষার্ধ
পুষ্পমদ পান করি ঢলঢল আঁখি—
কিম্পুরুষললনারা গাইতেছে গান,
প্রিয়তম তাহাদের হইয়া বিহ্বল
থেকে থেকে প্রিয়ামুখ করিছে চুম্বন।৩৮
কুসুমস্তবকগুলি স্তন যাহাদের
নবকিসলয়গুলি ওষ্ঠ মনোহর
বাঁধিল সে লতিকারা বাহুপাশ দিয়া
নম্রশাখা তরুদের গাঢ় আলিঙ্গনে। ৩৯

লতাগৃহদ্বারে নন্দী করি আগমন
বামকরতলে এক হেমবেত্র ধরি
অধরে অঙ্গুলি দিয়া করিল সঙ্কেত। ৪১
[অমনি] নিষ্কম্প বৃক্ষ, নিভৃত ভ্রমর,
হইল মূক, শান্ত হল মৃগ
কাঁপিল সঙ্কেতে। ৪২
নন্দীর সতর্ক আঁখি এড়ায়ে মদন
নমেরু গাছের তলে লুকায়ে লুকায়ে
শিবের সমাধিস্থান করিল দর্শন। ৪৩
দেখিল সে— মহাদেব শার্দূল-আসনে
দেবদারুবেদী 'পরে আছেন বসিয়া।৪৪
উন্নত প্রশস্ত অতি স্থির বক্ষ তাঁর,
শোভিতেছে সন্নমিত দৃঢ় স্কন্ধদেশ,
কোলে তাঁর হাত দুটি রয়েছে অর্পিত
প্রফুল্ল পদ্মের মতো শোভিছে কেমন।৪৫
বদ্ধ তাঁর জটাজাল ভুজঙ্গবন্ধনে।
কর্ণে তাঁর অক্ষসূত্র রয়েছে জড়িত—
গ্রন্থিবদ্ধ কৃষ্ণসারহরিণ-অজিন
ধরিয়াছে নীলবর্ণ কণ্ঠের প্রভায়। ৪৬
ঈষৎ প্রকাশে যার স্তিমিত তারকা
শান্ত যার ভ্রূযুগল অচল নিস্পন্দ,
অকম্পিত পক্ষ্মমালা ভেদ করি যার
বিকীরিত হইতেছে শান্ত জ্যোতিরাশি
সে নেত্র নাসাগ্রভাগ করিছে বীক্ষণ।৪৭
অবৃষ্টিসংরম্ভস্তব্ধ মেঘের মতন
তরঙ্গবিহীন শান্ত সমুদ্রের মতো
নির্বাতনিষ্কম্প অগ্নিশিখার সমান
মহাদেব শান্তভাবে ধেয়ানে নিমগ্ন।৪৮
মস্তক করিয়া ভেদ উঠিয়াছে জ্যোতি

কপালের শশধরে করিয়া মলিন। ৪৯
মনের অগম্য সেই মহাদেবে হেরি
মদনের সকম্পিত হস্তদ্বয় হতে
থর থর কাঁপি খসি পড়িল ধনুক। ৫১
হেনকালে বনদেবীদের সাথে সাথে
উমা পশিলেন সেই বনস্থলীমাঝে—
হেরি সে অতুল রূপ পাইয়া আশ্বাস
মদন তুলিয়া নিল ধনুর্বাণ তার। ৫২
পদ্মরাগ মণি জিনি আশোককুসুম
কনকবরণ জিনি কর্ণিকার ফুল
মুকুতাকলাপসম সিন্ধুবারমালা
আবণ্য বসন্তফুলে
• ••• । ৫৩
স্তনভারে নতকায়া ঈষৎ অমনি
অবনত কুসুমের মঞ্জরীর ভারে
সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতাটির মতো। ৫৪
থেকে থেকে খুলে পড়ে বকুলমেখলা,
বারবার হাতে করে রাখেন আটকি।
৫৫ প্রথমার্ধ
ভ্রমর তৃষিত হয়ে নিশ্বাসসৌরভে
বিম্ব-অধরের কাছে করে বিচরণ,
সম্ভ্রমে বিলোলদৃষ্টি উমা প্রতিক্ষণ
লীলাশতদল নাড়ি দিতেছেন বাধা।৫৬
যাঁর রূপরাশি হেরি রতি লজ্জা পায়
অকলঙ্ক সে উমারে করি নিরীক্ষণ
জিতেন্দ্রিয় শূলীরেও বাণ সন্ধানিতে
মদন হৃদয়ে নিজ বাঁধিল সাহস। ৫৭
শৈলসুতা ভবিষ্যৎপতি শঙ্করের
লতাগৃহদ্বারমাঝে করিলা প্রবেশ।

পরমাত্মাসন্দর্শনে পরিতৃপ্ত হয়ে
যোগ ভাঙি উঠিলেন মহেশ তখন। ৫৮
নন্দী তাঁর পদতলে প্রণিপাত করি
উমা-আগমনবার্তা কবিল জ্ঞাপন।
ঈষৎ ভ্রূক্ষেপমাত্রে মহেশ অমনি
পার্বতীরে প্রবেশিতে দিলা অনুমতি।৬০
উমার স্বহস্তে তুলা পল্লবে-জড়িত
হিমসিক্ত ফুলগুলি অর্পি পদতলে
সখীগণ মহাদেবে করিল প্রণাম। ৬১
উমাও সে পদতলে হইলেন নত—
চঞ্চল অলক হতে পড়িল খসিয়া
নবকর্ণিকার ফুল মহেশচরণে। ৬২
[অন্য] -নারী -অনুরক্ত নহে যেই জন
[হেন] পতি লাভ করো আশীষিলা দেব
[ক] থার কভু হয় না অন্যথা। ৬৩
[অ] বসর প্রতীক্ষা করিয়া
পতঙ্গের মতো
• করি। ৬৪
পদ্মবীজমালা লয়ে আরক্তিম করে
মহেশের হস্তে উমা করিলা অর্পণ। ৬৫
সম্মোহন পুষ্পধনু করিয়া যোজনা
অমনি শিবের প্রতি হানিলা মদন। ৬৬
অমনি হইলা হর ঈষৎ অধীর
সবেমাত্র চন্দ্রোদয়ে অম্বুরাশি-সম,
উমার মুখের 'পরে মহেশ তখন
একেবারে ত্রিনয়ন করিলা নিবেশ। ৬৭
অমনি উমার দেহ উঠিল শিহরি,
সরমবিভ্রান্ত নেত্রে লাজনম্র মুখে
পার্বতী মাটির পানে রহিলা চাহিয়া।৬৮

দুর্তে ইন্দ্রিয়ক্ষোভ করিয়া দমন বিকৃতির হেতু কোথা দেখিবার তরে দিশে দিশে করিলেন ত্রিনয়নপাত।৬৯	তপস্যার বিঘ্ন হেরি ক্রুদ্ধ অতিশয় ভ্রূভঙ্গদুষ্প্রেক্ষ্যমুখ মহাতপস্বীর তৃতীয় নয়ন হতে ছুটিল অনল। ৭১
দেখিয়া জ্যাবদ্ধমুষ্টি সশর মদন তাঁর [প্রতি] লক্ষ নিজ করেছে নিবেশ। ৭০	ক্রোধ সম্বর প্রভু ক্রোধ সম্বর স্বর্গ হতে দেবতারা কহিতে কহিতে হইল মদনতনু ভস্ম-অবশেষ। ৭২ *

মালতীপুঁথিতে যেমন আছে প্ল্যাঞ্চেটযোগে (?) ইহ-পর-লৌকিক আলাপের কিঞ্চিৎ বিবরণ, তেমনি রবীন্দ্রনাথের পাকা হাতের লেখায় বহুপরবর্তী সারস্বত সমাজের সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন— ভিন্‌দেশী কবিতার অনুবাদ, ভানুসিংহ ঠাকুরের অন্যতম 'পদ', রবীন্দ্রনাথের আনুমানিক তেরো থেকে আঠারো বৎসর বয়সে রচিত কোনো কোনো গান, তা ছাড়া ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দের ৬ই জুলাই (২৩ আষাঢ় শনিবার ১২৮৫) তারিখে আমেদাবাদের শাহীবাগে বসে লেখা এই কবিতা—

হে কবিতা, হে কল্পনা,
জাগাও জাগাও, দেবি, উঠাও আমারে দীনহীন।
ঢালো এ হৃদয়মাঝে জ্বলন্ত অনলময় বল—
দিনে দিনে অবসাদে হইতেছি অবশ মলিন
নির্জীব এ হৃদয়ের দাঁড়াবার নাই যেন বল।
নিদাঘতপনশুষ্ক ম্রিয়মাণ লতার মতন
অবসন্ন হয়ে যেন ভূমি'পরে পড়িছি লুটায়ে—
চারি দিকে চেয়ে দেখি ক্লান্ত আঁখি করি উন্মীলন
বন্ধুহীন প্রাণহীন জনহীন মরু মরু মরু ইত্যাদি।

প্রথম বিলাতযাত্রার প্রাক্কালে রবীন্দ্রনাথ তখন আঠারো বৎসর বয়সে প্রবেশ করেছেন মাত্র। এই 'আঠারো বৎসর' বয়সের ভাবাকুলতারই অন্য একটি

* তুলনার আলোচনার সুবিধার্থে কুমারসম্ভবম্ কাব্যের অর্থাৎ মূলের শ্লোক-সংখ্যা আমরা বসিয়েছি। মালতী-পুঁথির ৪৩-৪৪ পৃষ্ঠা-গত কাব্যানুবাদ 'বিশ্বভারতী পত্রিকা'র ১৩৫০ বৈশাখ সংখ্যায় (পৃ ৫৮৫-৫৯১) মুদ্রিত, 'ভারতী' ১২৮৪ মাঘ সংখ্যায় মুদ্রিত পাঠান্তরটি ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'রবীন্দ্র-গ্রন্থ-পরিচয়' (১৩৫০, পৃ ৮২-৮৫) পুস্তিকায় সংকলিত।

নিদর্শন (পৃ ৫৭) এখানে উদ্ধৃত করি। এটির উদ্দিষ্টা কোনো মনোময়ী কল্পনা অথবা একই কালে ভক্তি-প্রীতি আদর-আবদার ও সখ্যের পাত্রী কোনো পার্থিবা নিশ্চিত করে কে বলবে ?—

ছেলেবেলা হতে বালা যত গাঁথিয়াছি মালা
যত বনফুল আমি তুলেছি যতনে
ছুটিয়া তোমারি কোলে ধরিয়া তোমারি গলে
পরায়ে দিয়েছি, সখি, তোমারি চরণে।
আজও গাঁথিয়াছি মালা তুলিয়া বনের ফুল,
তোমারি চরণে, সখি, দিব গো পরায়ে—
নাহয় ঘৃণার ভরে দলিয়ো চরণতলে
হৃদয় যেমন ক'রে দলেছ দু পায়ে

এটি কি কোনো পরিকল্পিত গ্রন্থের উৎসর্গপত্রের প্রাথমিক খসড়া ? না জানি কার উদ্দেশে কবি লিখেছেন (পৃ ২০)—

কাছে থাকি দূরে থাকি, দেখো আর নাই দেখো,
শুধু স্নেহ দাও।
স্নেহ করে ভালো থাকো, স্নেহ দিতে ভালোবাসো,
কিছু নাহি চাও।
দূরে থেকে কাছে থাকো আপনি হৃদয় তাহা
জানিবারে পায়।
সুদূর প্রবাস হতে স্নেহের বাতাস এসে
লাগে যেন গায়।
এত আছে এত দাও, কথাটি নাহিক কও
—স্নেহপারাবার—
প্রভাতশিশিরসম নীরবে ঝরিছে সুধা
প্রাণের মাঝার।
তব স্নেহ প্রাণে মম নীরবে ভাসিয়া আসে
সৌরভের প্রায়,
উষার কিরণ-সম নীরবে বিমল হাসি
প্রাণেরে জাগায়।

এক'কেই বিচিত্ররূপে দেখা ভাবুকমনের স্বতঃসিদ্ধ প্রবণতা। কাজেই যিনি নিষ্ঠুর তিনিই যে করুণ-কোমল নহেন এমন নিশ্চিতভাবে বলা যায় না। দরদের তুলি দিয়ে আঁকা এই দুটি চিত্রের সম্পর্কে এই পর্যন্তই বলা যায় যে, একটি হয়তো ভাবাবেগে বিশেষভাবে অনুরঞ্জিত আর অন্যটি সেই একই প্রিয়জনের প্রতিকৃতি হলেও বাস্তবের আরও কাছাকাছি।

৪

মালতীপুঁথির মতো অতিপ্রাচীন নয় অথচ দীর্ঘকাল ধরে রবীন্দ্র-মানসের একখানি অপরূপ মায়ামুকুর হয়ে রয়েছে আর-একখানি বাঁধানো খাতা। শ্রীসমীরচন্দ্র মজুমদারের সংগ্রহভুক্ত, তাঁরই সৌজন্যে এটি দেখা বা এটির আদ্যন্ত আলোকচিত্র-গ্রহণ সম্ভবপর হয়েছে— তাই এটিকে মজুমদার পুঁথিও বলা যেতে পারে। এর সম্যক পরিচয় দিতে গেলে হয় সমস্তটি যথাযথ ছেপে, আঁকিবুকি-কাটাকুটি-সমেত, রবীন্দ্রজিজ্ঞাসুদের হাতে হাতে দিতে হয়, নয়তো বাধ্য হয়ে একখানা ভারী গ্রন্থই লেখা দরকার। উপস্থিত তদুপযোগী সময় ও সুযোগের অসদ্ভাবে সংক্ষেপে কতকগুলি বিশেষ বিশেষ বিবরণ মাত্র আহরণ করতে চেষ্টা করব। এখানে বলে নিই, মালতীপুঁথি হোক আর মজুমদার-পাণ্ডুলিপি হোক, কোনোটি নিয়েই নিখুঁত এবং সর্বাঙ্গীণ, বিজ্ঞান-সম্মত অথবা একেবারে বস্তুতন্ত্র গবেষণা করবার শক্তি আমাদের নেই— আর, হয়তো বা প্রবৃত্তিও নেই। সহৃদয় সুধীজন বর্তমান লেখকের এই অসামান্য ত্রুটি নিজগুণে মার্জনা করবেন।

আলোচ্য পুঁথিখানির মলাটে দপ্তরীর নৈপুণ্যগুণে গোটা গোটা অক্ষরে মুদ্রিত আছে : R N Tagore/Pocket Book/ 1889। অর্থাৎ, আশ্চর্য হব না যদি বা ১২৯৫ বঙ্গাব্দের শেষের দিক থেকে সর্বদা এই খাতাখানি সঙ্গে নিয়ে ফিরে থাকেন কবি কলকাতায়, শান্তিনিকেতনে, পদ্মাতটে, হাজারিবাগে আর গিরিরাজ হিমালয়ের স্নিগ্ধশীতল স্নেহচ্ছায়ে। খাতা খুলেই দেখা যায় যুগলপক্ষী পেন্সিলের যদৃচ্ছ লেখাজোখার রেখাজাল ভেদ করে সূচ্যগ্র দীর্ঘচঞ্চু বাড়িয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে আমাদের দিকে। পক্ষীতত্ত্বে অনভিজ্ঞ হওয়ায় বলতে পারি নে একদা এরা দুটিতে পদ্মার তীরে তীরে বালিকাদায় খোঁচা দিয়ে দিয়ে ফিরেছিল কি না, উপস্থিত পদ্মাপ্রেমিক কবির খাতায়

এসে বাধা বেঁধেছে। যে দিকে দপ্তরী নাম ছেপেছে সে দিক থেকেই-যে অবিচ্ছেদ লেখা চলেছে এমন নয়, খাতাটি উল্টে নিয়ে অন্য দিক থেকেও অনেক কিছু লেখা হয়েছিল। সামনের দিকে প্রথমে পাই—

শুধু যাওয়া আসা
শুধু স্রোতে ভাসা।

সমস্ত গানটি লিখে কেটে দেওয়া হয়েছে। রচনাকাল ১২৯৮ সনের শেষ হওয়াই সম্ভব, কেননা ১২৯৯ বৈশাখের 'সাধনা'য় 'নূতন গান' এই পরিচয়ে স্বরলিপি-সহ ছাপা হয়েছিল। এ দিকে খাতা উল্টে নিয়ে প্রথমে পাই—

গগনে গরজে মেঘ
ঘন বরষা।

এ কবিতা আমরা সকলেই জানি, শিলাইদহের বোটে লেখা ১২৯৮ ফাল্গুন মাসে। অর্থাৎ, মলাটে ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দের নিশানা থাকলেও ঐ সময়ের কোনো জানা-চেনা সাহিত্য-রচনা এই পাণ্ডুলিপিতে আমাদের চোখে পড়ছে এমন বলতে পারি নে। অবশ্য, এই পকেট-খাতার প্রথম দিকে অন্যের পাকা হাতে যে-সব কাঁচা হিসাব আছে জমিদারি সেরেস্তার, তা ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দের হলেও হতে পারে, সেই হিসাবে সমস্ত খাতা ভরে নি, অতঃপর কালাতিক্রম-গুণে হঠাৎ কবিতাদেবীর ব্যবহারে লেগে গেছে, স্বকীয় স্নেহগুণে আর তাকে ত্যাগ করেন নি— বাণীর অলংকারে, কনকে রতনে, তার শিখনখ, কি না প্রতিটি পৃষ্ঠা, ভরে দেওয়ার আগে। সে হিসাবে বা আনন্দবেদনার বেহিসাবে দেখতে পাই— 'সোনার তরী' পর্বের সোনার ফসলে বোঝাই হয়ে এই নূতন খাতার সূচনা পদ্মাতীরে ১২৯৮ ফাল্গুনে আর শেষ, যতদূর দেখছি, ২৩শে আষাঢ় ১৩১১, শুক্রবার, মজঃফরপুরে। মধ্যে কর্মময় ভাবসমৃদ্ধ জীবনের একটি যুগের বিস্তার। কত ভাব ও কল্পনা, সুর ও ছন্দ, নিত্য এবং নৈমিত্তিক ঘটনা, দিনজীবী মানুষ আর চিরজীবী কবির মিলিত মিশ্রিত পরিচয়লিপি— কত বেদনা, কতই-না বিস্ময় এই সময়ের মধ্যে আর এই খাতার পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় স্তরে স্তরে পুঞ্জিত হয়ে রয়েছে। অনাগত অভাবিত আশাতীত ভাবীকাল বর্তমানের বেশে ক্ষণমাত্র দেখা দিয়ে কেবলই দূর অতীতে, ক্রমশ দূরতর বিস্মৃতিতে বিলীন হয়ে গিয়েছে।

সামনের প্রথম পৃষ্ঠায় 'শুধু যাওয়া আসা' গানটির উল্লেখ পূর্বেই করেছি।

পরপৃষ্ঠায় শুধু দেনাপাওনার হিসাব ছিল মনে হয়—ক্ষেত্রবসু যজ্ঞেশ্বর হরিবোলা দ্বারিকসা শুকচাঁদ-নায়েব অথবা বিহারী ডাক্তারের নামোল্লেখ ক'রে। পেন্সিলে হিজিবিজি কেটে সে-সবই বাতিল ক'রে দেওয়ার পর বিচিত্র কতকগুলি মুখাকৃতি ফুটে উঠেছে— সে যে ওঁদেরই প্রতিকৃতি অসংশয়ে তা বলা যায় না। (স্যাটীকৃত নারীপুরুষের মুখাকৃতি আছে মালতীপুঁথিতে নানা লেখার আশেপাশে।) পরবর্তী একটি পৃষ্ঠায় দেখি শব্দতত্ত্ব-আলোচনার সূত্রপাতে বহু শব্দবিকৃতির উদাহরণ। আরও পরের পৃষ্ঠায় কাঁচা হাতের লেখায় টাকা-আনা-পাই-ঘটিত কিছু যোগ-ভাগের নমুনা এবং ঐ হাতেই অথবা অন্য কোনো কাঁচা হাতে সহসা—

তোমার কি
হি হি হি।

আমাদের আধুনিক বানানে অনূলিখিত হতে পারবে: তোমার কী। হি হি হী। সন্দেহ হয় এটি পঞ্চমবর্ষীয়া (?) কন্যা বেলার বিদ্যাভ্যাসের নমুনা নয়, পরন্তু কবিজায়ার রহস্যপ্রিয়তার নিদর্শন— তা ছাড়া বিশুদ্ধ অত্যুক্তিমাত্র। যেমন অত্যুক্তিতে কবি নিজেও জানিয়েছিলেন

[তাঁর] আকাশ ঘিরে জাল ফেলে তারা ধরাই ব্যবসা।
থাকৃগে তোমার পাটের হাটে মথুরকুণ্ডু শিবুসা।

আসলে কিন্তু পুরো আশমানদারি বজায় রেখেও আদর্শ জমিদার হতে তাঁর কোথাও কিছু বাধে নি। তার কিছু প্রমাণ পূর্বেই পাওয়া গেছে আর পরেও 'যেতে নাহি দিব' কবিতা শেষ না হতেই পাতা উল্টে পাওয়া যায় (অন্যের হাতে)—

১২ জানুয়ারির দেয় সদর খাজনাদি
বিরাহিমপুর, সদকি, মকলুতচর ধোকড়া কোন্ সংক্রান্ত
টাকা কলিকাতায় আইসে ইত্যাদি ইত্যাদি।

এবং কবিতাটি এই হিসাবপত্র ডিঙিয়ে ভাবের স্রোতে অভীষ্ট রসের মোহানায় পৌঁছুতেই আবার নূতন চর জেগে ওঠে— কালীগ্রামের সদর খাজনার হিসাব। অতঃপর কবির নিজেরই হস্তাক্ষরে বলুর জুতো ৬।০, আমার জুতো ৫৸০, চৌকি মেরামত ১৲, পুরীতে স্নানের ধুতি একজোড়া ২৲, খণ্ডগিরি গাড়ি-টানা কুলি ৷৷০, বলু (গয়না) ১০৲, পাল্কি ২২৲ টাকা ইত্যাদি।

সুতরাং কবি ব'লেই রবীন্দ্রনাথ যে সাংসারিক কোনো দায়-দায়িত্বের ধার ধারেন না, কবিজায়ার এ প্রচ্ছন্ন (খুব কি প্রচ্ছন্ন?) নিন্দার ইশারা একেবারেই অমূলক। কবির ঘরণী বিধায় কবিতা-রচনায় হাত দিলে তিনিও যশস্বিনী হতে পারেন এটি প্রমাণ করবার ইচ্ছা থাকলে অনেকটা সফল হয়েছেন বলতেই হবে। যে ধ্বনি বা ব্যঙ্গ্য হল কবিতার প্রাণ, এই দু ছত্রে সে তো বেশি বৈ কম নেই। অথবা সবই কি আমাদের 'রীতিমত গবেষণা' অথবা অলীক কল্পনামাত্র? আসলে লক্ষ্য করা হয় নি যে, এই দু ছত্রের আগে এই পৃষ্ঠার শীর্ষদেশেই ছিল—

থাকো তুমি ওইখানে থাকো
অন্তরের চোখে চোখে আমার আনন্দলোকে
সেথা হতে কাছে এসো নাকো।
থাকো তুমি ওইখানে থাকো—
ওই পারে ওই দূরে বিরহ-অলকাপুরে
আমার হিয়ার মাঝখানে।

কবিজায়ার মনে রোষ বা সন্তোষ কী ভাব জেগেছিল কে জানে, যুগপৎ মিলন ও বিরহের আকুতি-মিশ্রিত, নিষেধ ও মিনতি-ভরা, এই পদাবলীর গূঢ় তাৎপর্য তিনি কেমন বুঝেছিলেন— যেমনই বুঝুন, হাসতে হাসতে কবির কলম কেড়ে নিয়ে এই পরমকৌতুকী মন্তব্যটুকু না লিখে পারেন নি।

কিন্তু, এভাবে মজুমদার-পাণ্ডুলিপির ধারাবিবরণী কতই বা দেওয়া যাবে? 'সোনার তরী' থেকে 'উৎসর্গ' পর্যন্ত এর ব্যাপ্তিকাল। বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যায় আর হিমাচলপ্রদেশে, গৃহে পথে ও নদীবক্ষে, বসবাস ও চলাচলের সাক্ষ্য পত্রে পত্রে। বেলা রথী ও অন্যান্য সন্তানের কলকাকলিমুখর শৈশবে পরিবৃত সুখের ও স্নেহের গার্হস্থ্যজীবনের আদিপর্ব থেকে শুরু ক'রে ক্রমশ মৃণালিনী দেবীর অকালমৃত্যু, রেণুকার ক্ষয়রোগ, কবির জীবনে নানা বৈষয়িক দুর্ভাবনা, সমস্যা ও সমাধানের ইঙ্গিত— এ-সমস্তই মিলিয়ে মিশিয়ে নিয়ে এর অগ্রগতি। বোধ করি নব রসের স্মিত করুণ মধুর শান্ত অদ্ভুত সব কটি এর বিভিন্ন পত্রপুটে বারবার পূরে উঠেছে— রুদ্র বীর বীভৎস ভয়ানক না'ই থাক্— এ-সবের ফাঁকে ফাঁকে আছে শব্দতত্ত্বের অনুশীলন, হবু-চিত্রকরের খেয়াল-খুশি-প্রেরিত আঁকিবুঁকি, রেখাজালের আবরণ ছিন্ন করে স্থানে অস্থানে

বিচিত্র রূপের চকিত আভাস— তা ছাড়া নিজের বা অন্যের হাতে বিবিধ আয়ব্যয়ের হিসাব, যজ্ঞে আমন্ত্রণযোগ্য লোকের নামের তালিকা, এমন-কি অজ্ঞাত পাক-প্রণালীর বা রসায়ন-প্রস্তুতির বিচ্ছিন্ন সূত্র। কোনো-একটি গান বা কবিতার জন্মলগ্নে আকাশে বাতাসে কেমন হুলুরব উঠেছিল, জল-স্থলের পরিবেশটি কেমন ছিল, সে-সবও জানা যায় না বা অনুমান করা চলে না এমন নয়। কখনো ইছামতী কখনো আত্রাই, কখনো বড়ল কখনো নাগরনদী, আর কখনো পদ্মা। সকাল সন্ধ্যা অথবা ভোর-রাত্রি। ঝড়বৃষ্টিতে বোট টলোমলো অথবা প্রসন্ন জলস্থল আকাশে আলোকের ব্যাপ্তি। এই খাতার কল্যাণে আমরা জানতে পারি— ফাল্গুনের দিনে কবি ধ্যান করেছেন ঘনবরষার, অসুস্থ অবস্থায় রামপুর-বোয়ালিয়ায় লিখছেন 'ওরে মৃত্যু জানি তুই আমার বক্ষের মাঝে বেঁধেছিস বাসা' আর নাটোর হয়ে শিলাইদহে পৌঁছে, ১২৯৯ অগ্রহায়ণের ১৬,২০,২৭ তারিখে, ক্রমে এ কবিতা শেষ করেছেন। জানতে পারি কোন্ কবিতা কিরূপে প্রথম আবির্ভূত হয়ে কোন্ রূপে বা রূপান্তরে অবশেষে সার্থক হয়েছে। কে বা অকালে এসে দ্বিধাভরে ফিরে গেছে, বহুকাল পরে 'যৌবন গঠিতা পূর্ণপ্রস্ফুটিতা' তার অলৌকিক প্রকাশ দেখে কেউ বোঝে নি কোন্ প্রচ্ছন্ন বৃন্তে বিধৃত এই অপরূপ। পূর্বে 'সোনার তরী' থেকে 'স্মরণ' 'উৎসর্গ' পর্যন্ত এই পুঁথির সীমানা নির্দেশ করে থাকলেও এখন বলি— 'খেয়া'র কোনো কোনো কবিতার পূর্বাভাসও এ ক্ষেত্রে আবিষ্কার করা যায় আর বহুপরবর্তী শিশুশিক্ষার 'সহজ পাঠ' (১৩৩৬) সেও বীজাকারে বর্তমান। অল্প পরিসরে ও অল্প সময়ে সব বিবরণ কখনোই দেওয়া যাবে না, প্রধান প্রধান তথ্য যতটা দেওয়া যায় অতঃপর সে বিষয়ে আমরা যত্ন করব।

এক স্থলে আপন কবিকর্ম সম্পর্কে কৌতুক করে লিখছিলেন রবীন্দ্রনাথ— পরে কেটেও দিয়েছেন—

নাহি অবসর।
আঁখি ভরা ঘুমঘোরে, উঠিয়াছি কোন্ ভোরে,
বসিয়াছি ঘড়ি ধ'রে— রুধিয়াছি ঘর।
কলমের খোঁচা লেগে ভাবগুলো রেগে-মেগে
কাঁচা ঘুমে উঠে জেগে নাহি পায় পথ।

১৩০২, ৫ আশ্বিনেব এই লেখা। অন্যত্র এমন আক্ষেপ প্রকাশ কবেছেন স্পষ্টভাষী গদ্যে, পূর্বাপব ববীন্দ্রসাহিত্যে হঠাৎ যাব জুড়ি মেলানো যায় না।—

'পূর্বজন্মে অবশ্য একটা মহাপাপ কবিযাছিলাম, নতুবা লেখক হইযা জন্মিলাম কেন? মনেব ভাবগুলা যখন বাহিবে আনিযা ফেলিযাছি তখন বাহিবেব লোক উচিত অনুচিত যে কথাই বলে না-শুনিযা উপায নাই। সুধাকব চন্দ্র, তুমি যদি ক্ষীবোদসমুদ্রেব মধ্যেই আবামে শযান থাকিতে তাহা হইলে কবিদেব কবিত্ব কবিবাব কিঞ্চিৎ ব্যাঘাত হইত বটে, কিন্তু নিশীথেব শৃগাল তোমাব দিকে মুখ তুলিয়া অকস্মাৎ তাবস্ববে অসম্মান জানাইতে যাইত না।

'মনেব ভাব যখন মনে ছিল সে যেন গৃহদেবতা ইষ্টদেবতা ছিল এখন কী মনে কবিযা তাহাকে চতুষ্পথে বটবৃক্ষেব তলায স্থাপন কবিলাম? সকল জীবজন্তুই কি তাহাব সম্মান বোঝে? যদি বা না বোঝে তবুও কি তাহাকে বিশ্বেব চোখেব সামনে পাথর হইযা বসিযা থাকিতে হয না?

'তাহাব পব আবাব আত্মীয় বন্ধুদেব কাছেও জবাবদিহি আছে। এটা কেন লিখিলে? ওটা কিভাবে বলিলে? সেটাব অর্থ কী? এও তো বিষম দায। যেন আমি কোদাল দিযা পথ কাটিতেছি বলিযা গাড়ি কবিযা মানুষকে পাব কবিযা দেওযাও আমাব কতব্য।

'যাহা হউক, ঝগড়া কাহাব সহিত কবিব? জন্মকালে অদৃষ্টপুরুষ ললাটে এইরূপ লিখিযা গিয়াছেন। কিন্তু সেই প্রবীণ ভাগ্যলিপিলেখক মহাশযকে তাঁহাব কোনো লিখনেব জন্য সহস্র লাঞ্ছনা কবিলেও তিনি দিব্য গা-ঢাকা দিয়া বসিযা থাকেন। আব তাঁহাবই বশবর্তী হইযা আমবা যদি দুটো কথা লিখি তাহা হইলে কথাব আব শেষ থাকে না।'

এই আক্ষেপেব শিবোদেশে—

হে সিন্ধু ধবিত্রী তব গর্ভেব সন্তান
অনিন্দ্য সুন্দবী। কত দীর্ঘ যুগ ধবে
আঁধাব জঠবে

এই কয ছত্র লিখে কেটে দেওযা হযেছে। তাবও পূর্বে— কাটজুড়ি, বালুহস্তা, ভার্গবী, সর্দাইপুব, ভুবনেশ্বব, ধৌলি, খণ্ডগিবি, দূবে জগন্নাথেব মন্দিব, সমুদ্রতীব, এ-সব ভ্রমণেব বা দর্শনেব বে-তাবিখ স্থত্রাকাব বিববণ

আর তৎপূর্ববর্তী পৃষ্ঠাগুলিতে জোড়াসাঁকোর গৃহে লেখা 'যেতে নাহি দিব' কবিতা।

৫

পূর্বেই বলা হয়েছে, মজুমদার-পুঁথির যত্রতত্র শব্দতত্ত্ব-সন্ধানের নানা নিদর্শন বিকীর্ণ আছে। 'শব্দতত্ত্ব' গ্রন্থের প্রকাশ বাংলা ১৩১৫ সালে হলেও, গ্রন্থভুক্ত প্রবন্ধগুলি তৎপূর্বে ১২৯২ থেকে ১৩১১ বঙ্গাব্দের মধ্যে 'বালক' 'সাধনা' 'ভারতী' প্রভৃতি পত্রিকায় প্রচারিত হয়। আলোচ্য পুঁথিও প্রায় সমকালীন। শব্দতত্ত্বের অনুধাবনে কবি মন দেন আরও বহু বৎসর পূর্বে প্রথম ইংলন্‌ড্-প্রবাসের সময়, স্কট-পরিবারের প্রিয়সখীসমা কন্যা দুটিকে বাংলাভাষা শেখানোর উৎসাহে। চারুহাসিনী চারুভাষিণী কোন্ কন্যা বাংলাভাষা কতদূর শিখেছিলেন আমরা জানি নে, ইংলন্‌ডে কবির স্থিতিকালও সুদীর্ঘ হয় নি। ভাষা শেখানোর সঙ্গে ভাষাতত্ত্বের আলোচনা এক সূত্রে গাঁথা এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। বিশেষতঃ বিদেশের মানুষকে শেখাতে হলে। অতএব আলোচ্য পুঁথিতে আমরা যে-সব শব্দতত্ত্ব-সন্ধানের নমুনা দেখি তারও বহু পূর্বেই কবির এ বিষয়ে চিন্তা ও চেষ্টা আবদ্ধ হয়েছিল, তেমনি বাঙালির ঘরে প্রথমশিক্ষার্থীর উপযোগী 'সহজ পাঠ'-মালা-প্রণয়নের অল্প যে নিদর্শন আলোচ্য পাণ্ডুলিপিতে আবিষ্কৃত হয়েছে সেও পূর্বের এই-জাতীয় অন্য কোনো উদ্যমের ধারাবাহী নয় যে তাই বা কেমন করে বলব? যা হোক, প্রথমভাগ সহজপাঠ প্রকাশিত হয় ১৩৩৬ সালে তারই বীজাকার বা ভ্রূণরূপ এখানে দেখা দিয়েছে ১৩০২-১৩০৩ বঙ্গাব্দের কোনো সময়ে। ১৩১১।১২ সালের পরেও দীর্ঘকাল এ খাতা কবির নিকটে ছিল এমন আমরা অনুমান করি নে। অথবা, খাতায় সাদা পাতা আর যখন রইল না, মুখ্য লেখাগুলি বিভিন্ন কাব্যগ্রন্থে ছাপা হয়ে গেল, তখনও এ খাতা কোনোদিন খুলে দেখেছিলেন এমন মনে হয় না। তা হলে, অন্তর্বর্তী প্রায় বত্রিশ-চৌত্রিশ বৎসরেও কবির সংকল্পে বা চিন্তাপ্রণালীতে কোনো দিগ্‌ভ্রংশ হয় নি এটি স্পষ্টই দেখা যায়, বিষয়টির আসল কাঠামো সহজেই তাঁর স্মৃতিবিধৃত হয়ে ছিল, যথাকালে পূর্ণ আকার অবয়ব নিয়ে লোকসমাজে প্রকাশ পেয়েছে। ঘটনাটি যেমন কৌতূহলোদ্দীপক তেমনি বিস্ময়কর। 'সহজ পাঠ' আজ প্রায় ঘরে ঘরে আছে, নিম্নের উদ্‌ধৃতি-

টুকু যে-কোনো অনুসন্ধিৎসু পাঠক তারই সঙ্গে তুলনা করতে পারবেন। পদ্ধতির মিল তো আছেই, ভাষা ও ভঙ্গী -গত সাদৃশ্যও অল্প নয়।—

ক কাটে কাঠ। খ খায় খই।
গ গায় গান। ঘ ঘুমোয় ঘরে।
ঙ করে উঁ আঁ। তার চোখে লাগে ধুঁয়া।
চ চড়ে চালে। ছ ছেঁড়ে ছাতা।
জ জড়ায় জাল। ঝ ঝাড়ে ঝুলি।
কুকুরছানা ঞ কাঁদে। ইঁ যঁ ইঁয।
ট টানে টিকি। ঠ ঠেলে ঠিলি।
ড ডোবে ডোবায়। ঢ ঢোকে ঢাকে।
ণ বলে শোনো
আমি মূর্দ্ধণ্য ণ।
ত তোলে তেঁতুল। থ থাকে থামে।
দ দোলে দোলায়। ধ ধোয় ধুতি।
ন বলে শোন ত
আমার নাম দন্ত্য।
প পড়ে পাঁকে। ফ ফেলে ফল।
ব বেড়ায় বনে। ভ ভাঙে ভাঁড়।
ম বলে মামা
আমায় মাচা থেকে নামা।
য যায় যশোরে। র বাঁধে রাস্তায়।
ল লাগায় লাঠি। ব বাজায় বীণা।
শ ষ স তিন ভাই শোনায় শানাই।
হ হাঁচে হক্ষ।
ক্ষ কাশে খক্ষ।
দুই বাবু অ আ বসে খায় হাওয়া।
দুই মেয়ে ই ঈ শীতে কাঁপে হী হী।
দুই বুড়ি উ ঊ কাঁদে বসে হু হু।
দুই বুড়ো ঋ ৠ চলে ধীরি ধীরি।

দুই বোন ৯ ঃ হাসে খিলি খীলি।
দুই ভাই এ ঐ হেঁকে বলে দে দই।
গুটিসুটি ও ঔ বসে আছে দুই বৌ।

সংকলিত পাঠগুলিতে গূঢ়ভাবে বা স্পষ্টতই ছন্দস্পন্দ বর্তমান এ কথা না বললেও চলে। অক্ষরগুলির প্রত্যেকটি যেন মনের পটে এঁকে নিয়ে প্রত্যক্ষ করেছেন কবি— বিশেষতঃ স্বরবর্ণগুলির কৌতুককর ও মনোহর রূপ ফুটিয়ে তোলা দক্ষ শিল্পীর তুলিতে সহজেই সিদ্ধ হবে। স্বরবর্ণ এ ঐ অঙ্গুলি-নির্দেশে দেখাতে গিয়ে 'দে দৈ' লিখতে পারতেন কবি এমন আমাদের ধারণা। অপর পক্ষে, 'খিলি খীলি' ধ্বনিতে কতকটা স্বরবৈচিত্র্যের ইঙ্গিত করলেও, 'হী হী'তে করেন নি আর হুহূ লিখেও পরিবর্তন করেছেন মনে হয়, তার কারণ এই যে, শেষোক্ত দুটি ক্ষেত্রে ছন্দোমাধুর্যের অনুরোধে জোড়া জোড়া দীর্ঘস্বরের উচ্চারণই প্রশস্ত এবং কর্ণে মধুবর্ষণও করবে যদি হয় 'বালভাষিতম্'।

৬

অতঃপর বিভিন্ন হিন্দি গানের সুর ভেঙে বিচিত্র নূতন গান রচনার বহুতর নিদর্শন দেখি। আরও পরে ২৯ ভাদ্র ১৩০৩ তারিখের রচনা কে যায় অমৃতধামযাত্রী। এক এক সময় ঝাঁকে ঝাঁকে নূতন গান এসে জুটেছে কবিমানসের বিজন কূলে, শীতান্তে মানসপ্রতিবর্তী হংসপংক্তির মতো। মজুমদার-পুঁথির সমুদয় গানের একটি তালিকা দিলে ক্ষতি আছে কি? তালিকার প্রথম গানটির রচনাকাল জানা যায় নি, পরবর্তী তিনটি ছত্রে তিনটি গানের আভাস মাত্র এসে পৌঁছেছে। অতঃপর বলা যায় যে, ১৩০২ আশ্বিনে, শিলাইদহের পদ্মাতটে, অশ্রুত বিভাস-ভূপালি সুরের গুঞ্জরণে রবিকরোজ্জ্বল অপরূপ এক দৃশ্যপট উদ্‌ঘাটিত হল।—

আমার মন মানে না দিনরজনী
তুমি নূতন কি তুমি চিরন্তন [ওহে নবীন অতিথি]
ঝর ঝর বরষে [ঝর ঝর বরিষে]
ফিরে এস ফিরে এস [এস এস ফিরে এস। ভাদ্র ১৩০১। শিলাইদহ]
ওলো সই, ওলো সই। ৫ আশ্বিন ১৩০২। বোট। শিলাইদহ

মধুর মধুর ধ্বনি বাজে। ৬ আশ্বিন ১৩০২। বোট। শিলাইদহ
বেলা গেল তোমার পথ চেয়ে। ৮ আশ্বিন ১৩০২। বোট। শিলাইদহ
বিশ্ববীণারবে বিশ্বজন মোহিছে। ৪-৯ আশ্বিন
আহা, আজি মোর দ্বারে কাহার মুখ হেরেছি
কে দিল আবার আঘাত আমার। ১২ আশ্বিন ১৩০২ বিজয়াদশমী। শিলাইদহ
এসো গো নূতন জীবন। ১৩ আশ্বিন ১৩০২
পুষ্পবনে পুষ্প নাহি। ১৪ আশ্বিন
আহা জাগি পোহালো বিভাবরী। ১৫ আশ্বিন
হে অনাদি অসীম সুনীল অকূল সিন্ধু। ১৬ আশ্বিন
উঠ রে মলিনমুখ। ২৬ ভাদ্র ১৩০২। জোড়াসাঁকো
তোমার গোপন কথাটি সখি। ১৮ আশ্বিন
চিত্ত পিপাসিত রে। ২৩ আশ্বিন
আমি চিনি গো তোমারে। ২৫ আশ্বিন
আমরা লক্ষ্মীছাড়ার দল। ২৯ আশ্বিন
ওগো ভাগ্যদেবী পিতামহী। ১ কার্তিক
একি আকুলতা ভুবনে। ১৬ কার্তিক ১৩০২। জোড়াসাঁকো
তুমি রবে নীরবে হৃদয়ে মম। ১৮ কার্তিক। জোড়াসাঁকো
সে আসে ধীরে। ২১ কার্তিক
কে উঠে ডাকি। ২২ কার্তিক। জোড়াসাঁকো
ওহে সুন্দর, মম গৃহে আজি। ২৩ কার্তিক
তুমি যেয়ো না এখনি। ২৪ কার্তিক
আকুল কেশে আসে, চায় ম্লান নয়নে। ২৫ কার্তিক
হৃদয়চন্দ্র হৃদিগগনে। ২৯ কার্তিক
কী রাগিণী বাজালে হৃদয়ে। ২৯ [কার্তিক]

অতঃপর মাত্র ৪ পৃষ্ঠায় সহজপাঠের খসড়া। পরবর্তী তারাচিহ্নিত গানগুলি 'ছিন্নভাঙা' মনে হয়।—

* শীতল তব পদছায়া
* আজি রাজ-আসনে তোমারে

আজি কোন্ ধন হতে বিশ্বে আমারে [১৪ শ্রাবণ ১৩০৩]
* তোমাহীন কাটে দিবস
* হৃদয়-আবরণ খুলে গেল
আমার সত্য-মিথ্যা সকলি ভুলায়ে দাও
মধুর রূপে বিরাজ'
আর কত দূরে আছে
কে যায় অমৃতধামযাত্রী। ২৯ ভাদ্র ১৩০৩
* আজি মম মন চাহে জীবনবন্ধুরে
* হরষে জাগো আজি
শান্ত হ রে মম চিত্ত নিরাকুল
* শান্তি করো বরিষণ
* সুন্দর বহে আনন্দমন্দানিল
* ভক্ত হৃদয় [হৃদি] বিকাশ
* পান্থ, এখনো কেন অলসিত অঙ্গ
* আনন্দ-উষাকালে মঙ্গলরবি। এক ছত্র। পরে হয় আনন্দ তুমি স্বামী
* বহে নিরন্তর অনন্ত আনন্দধারা
কেন ধরে রাখা, ও যে যাবে চলে
বৃথা গেয়েছি বহু গান। ২৮ ভাদ্র ১৩০৪
কেন বাজাও কাঁকন কনকন [১৩০৪]
হেরি নবীন শ্যামল ঘন। ৬ আশ্বিন। ইছামতী। ঝড়বাদলা
এবার চলিনু তবে। ৭ আশ্বিন ১৩০৪। ইছামতী
যামিনী না যেতে জাগালে না। ৭ আশ্বিন ১৩০৪। যমুনা নদী
বন্ধু, কিসের তরে অশ্রু ঝরে। খসড়া। ৭ আশ্বিন ১৩০৪। বড়ল
আমি কেবলই স্বপন করেছি বপন। ৮ আশ্বিন ১৩০৪। বলেশ্বরী
ভালোবেসে, সখী, কোমল যতনে। ৮ আশ্বিন ১৩০৪। সাজাদপুর
তুমি সন্ধ্যার মেঘ শান্ত সুদূর। ৯ আশ্বিন ১৩০৪। চলন বিল। ঝড়বৃষ্টি
যদি বারণ করো তবে। ৯ আশ্বিন ১৩০৪। চলন বিল। দিনে দু তিন
বার করে ঝড় হচ্চে। বোট টলমল
'আমি চাহিতে এসেছি শুধু একখানি। ১০ আশ্বিন। নাগর নদী

সখি, প্রতিদিন হায় এসে ফিরে যায় কে। ১০ আশ্বিন ১৩০৪। নাগরনদী। মেঘবৃষ্টি। শনিবার অমাবস্যা

বিধি ডাগর আঁখি যদি ১০ আশ্বিন। নাগরনদী। ধানক্ষেতের ভিতর

বঁধু, মিছে রাগ কোরো না। ১০ আশ্বিন। পতিসর

একি সত্য, সকলই সত্য। ১৩ আশ্বিন। রেলপথে

* তারকা-চিহ্নিত গানগুলি কোনো-না-কোনো হিন্দিগানের আদর্শে বা প্রভাবে রচিত। শ্রীমতী ইন্দিরাদেবী -রচিত 'রবীন্দ্রসংগীতের ত্রিবেণী সংগম' দ্রষ্টব্য।

* নিত্য সত্যে চিন্তন করো রে

* কে বসিলে আজি হৃদাসনে

* উঠি চলো, সুদিন আইল

লহ লহ, তুলি লহ হে

কে এসে চলে যায় ফিরে আকুল নয়নের নীরে

তরী আমার হঠাৎ ডুবে যায়

দুইটি হৃদয়ে একটি আসন

* স্বপন যদি ভাঙিলে

* দুঃখরাতে, হে নাথ, কে আসিলে

* আনন্দ তুমি, স্বামী, মঙ্গল তুমি

* মন্দিরে মম কে আসিলে

দুয়ারে দাও মোরে রাখিয়া

নিবিড় আঁধারে জ্বলিছে ধ্রুবতারা

আছে দুঃখ, আছে মৃত্যু

গভীর রজনী নামিল হৃদয়ে

প্রভু, দাঁড়াও আমার আঁখির আগে। ২২ জ্যৈষ্ঠ ১৩১১। শান্তিনিকেতন

আজি যত তারা তব আকাশে। ২৪ জ্যৈষ্ঠ ১৩১১। শান্তিনিকেতন

মন তুমি, নাথ, লবে হ'রে। ২০ জ্যৈষ্ঠ ১৩১১। শান্তিনিকেতন

গরব মম হরেছ প্রভু। ২৬ জ্যৈষ্ঠ ১৩১১

সবার মাঝারে তোমারে স্বীকার করিব হে। ২৬ জ্যৈষ্ঠ ১৩১১

যে কেহ মোরে দিয়েছ সুখ। ২৬ জ্যৈষ্ঠ ১৩১১

কী সুর বাজে আমার প্রাণে। ২৩ আষাঢ় ১৩১১। মজঃফরপুর

তুমি যে আমারে চাও আমি সে জানি। ২৩ আষাঢ় ১৩১১। শুক্রবার

মজুমদার পুঁথি উল্টে নিলে অন্য দিকেও কতকগুলি গান পাওয়া যায়—

উজ্জ্বল করো হে আজি। ৯ বৈশাখ ১৩০৩

অয়ি ভুবনমনোমোহিনী। পৌষ ১৩০৩

১৩০৯, ১০ মাঘের পরবর্তী—

যে তরণীখানি ভাসালে দুজনে
দুজনে যেথায় মিলেছে সেথায়

কবির লুপ্তাবশিষ্ট কয়েকটি পদাঙ্ক অনুসরণ ক'রে, শূন্যে-বিলীন ভূতকালের দীর্ঘপথ বেয়ে, উজ্জ্বলমধুর শারদদিবসের মাধুরী থেকে কখন এসে পড়েছি শোক ও সান্ত্বনার গভীর গম্ভীর রহস্যচ্ছায়ায়। মৃণালিনীদেবী ১৩০৯ সালের ভাদ্রে শান্তিনিকেতনে অসুস্থ হয়ে প'ড়ে অগ্রহায়ণের ৭ তারিখে কলিকাতায় দেহত্যাগ করলেন। কবি শীঘ্রই ফিরে এলেন বোলপুরের নিঃশব্দ-শান্তিমন্ত্র-ধ্বনিত আকাশের তলে প্রান্তরের কোলটিতে। অন্তর্হিতা যে গৃহলক্ষ্মী কবিজীবনের অন্তর্যামিনী জীবনলক্ষ্মীতে লীন হতে চললেন তাঁরই উদ্দেশে উদ্‌গত অশ্রুর প্রেমপূত তর্পণবারি ধরে রাখলেন কবিতার পর কবিতায়। উচ্ছ্বাসে আবেগে ও উচ্চস্বর হাহাকারে পূর্ণ নয় ব'লেই সেই কবিতাবলীর অকৃত্রিম আন্তরিকতা ও গভীরতা সমধিক। কালে ব্যক্তিগত শোক পরিণত হল জগতের সবজনীন সর্বকালীন প্রিয়বিচ্ছেদের করুণ বেদনায় — তার রূপ ক্রমেই অন্তরিত হল স্ফটিকোপম স্বচ্ছ রূপকের অন্তরালে। ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথ ও কবি রবীন্দ্রনাথের মানসের এই-যে গতি ও পরিণতি, তার সকল কথাই মেলে ধরেছে এই পাণ্ডুলিপি এবং পরে সমগ্র 'স্মরণ' কাব্যে ও 'উৎসর্গে'র অনেকগুলি কবিতায় সহৃদয়জনের চিরস্মরণীয় হয়েছে। স্মরণের কবিতাগুলি সকলেই চেনেন, উৎসর্গের যে অপূর্ব রূপকগুলির কথা বলেছি, গুণ্ঠন মোচন ক'রে একবার দেখি তাদের সিক্তপক্ষ্ম করুণ মাধুরী। সেই কবিতাগুলি হল—

আমাদের এই পল্লীখানি পাহাড় দিয়ে ঘেরা।

১৩০৯, ১০ মাঘ তারিখে জোড়াসাঁকোর বাড়িতে এর রচনা অনেক সংস্কার করে গ্রন্থে মুদ্রিত হয়েছে। (স্মরণের পঁচিশটি কবিতার মধ্যে উনিশটি এই

খাতায় আছে এবং সম্ভবতঃ সেগুলি সবই বোলপুর-শান্তিনিকেতনে লেখা।)
কয়েক মাস পরে, ১৩০৯, ১০ চৈত্র তারিখে হাজারিবাগে লিখলেন—

মন্ত্রে সে যে পূত
রাখীর রাঙা সুতো
বাঁধন দিয়েছিনু হাতে।

প্রিয়বিয়োগব্যথা মধুর ভাবনায় পরিণত হয়েছে আরও পরে, ১৩১০, ২৯ বৈশাখের এই কবিতায়—

আমি যারে ভালোবাসি সে ছিল এই গাঁয়ে।

বৎসর ঘুরে গেছে। অসুস্থ কন্যা রেণুকার পরিচর্যায় নিযুক্ত আছেন কবি আলমোড়ায়। কার মর্মব্যথা ফুটে উঠেছে কার ভাষা-ভরা চাহনি চলা হাস্য কটাক্ষের অতর্কিত বিলয়ে, উভয়েরই নাম একেবারে মুছে গেছে এই রচনা থেকে। 'বিশ্বের বিরহী যত', যে দেশের যে কালের হোক তারা, প্রত্যেকেরই বিষণ্ণ দীর্ঘশ্বাস এর ছত্রে ছত্রে সঞ্জীবিত। তেমনি আরও অনেকগুলি কবিতায়, যেমন—

'আজিকে গহন কালিমা লেগেছে গগনে'
'পথের পথিক করেছ আমায় সেই ভালো ওগো সেই ভালো'
'সেদিন তুমি কি এসেছিলে ওগো সে কি তুমি মোর সভাতে'
'আলো নাই দিন শেষ হল ওরে পান্থ বিদেশী পান্থ'

ব্যক্তির একই বিষাদ ও বেদনা, পরিণামে আত্মনিবেদনপর শান্তি ও প্রণতি, নানা রূপে ও রূপান্তরে ফুটে উঠেছে। উল্লিখিত কবিতাচতুষ্টয়, বা সগোত্র আর-কয়েকটি, বর্তমান পাণ্ডুলিপিতে না পেলেও প্রসঙ্গক্রমে স্মরণ করতে হল।

অন্ধকার ফিকে হয়ে কখন ভোরের আলো ফুটে উঠতে চাইছে, 'ভোরের পাখি'র কাছে সে বার্তা পেয়েছেন কবি। নব-প্রভাতের আলোকে জেগে উঠে মনে হল—

না জানি কারে দেখিয়াছি, দেখেছি কার মুখ—
প্রভাতে আজ পেয়েছি তার চিঠি।

কবিচিত্তের কুঞ্জবনে আবার নানা দিকে গেয়ে উঠল নানা বনবৈতালিক, গাছের চিকন-কচি পাতায় পাতায় ঠিকরে পড়ল আলো, যেন ইন্দ্রাণীর

অলোককঙ্কণেব চকিত দ্যুতি আপন চিবকিশোব সত্তাকেই আহ্বান কবে আবাব গেয়ে উঠলেন—

ওবে আমাব কর্মহাবা, ওবে আমাব সৃষ্টিছাডা
ওবে আমাব মন বে আমার মন।

আশ্চর্য কবিচিত্তবৃত্তি, আশ্চর্য প্রতিভাব ধর্ম। কত অল্পকালে কী পবিণতি। (পূর্বোক্ত 'ভোবেব পাখি' বা অন্য দুটি কবিতা-বচনাব স্থানকাল হল—হাজাবিবাগ, ১১-১২ চৈত্র ১৩০৯।) কিন্তু এখানেই সকল বহস্যেব শেষ নয়, আব শেষ যদি হত তা হলে 'পুষ্পাঞ্জলি' ধবত না 'লিপিকা'ব রূপ। তেইশ বছবেব শোক ষাট বছবেব কাছাকাছি এসে যে গদ্য কবিতাগুলিতে আকাব পেয়েছে সে তো কোনো-একজন মানুষেব ক্ষণকালীন অশ্রু-আসাব নয়, পবন্তু এক-একটি নিটোল মুক্তা বললেই চলে। 'পুষ্পাঞ্জলিব' চিহ্ন না থাকলে 'লিপিকা'ব 'সন্ধ্যা ও প্রভাত' 'একটি দিন, 'একটি চাউনি' বা 'প্রথম শোক'বে যেমন "সনাক্ত" কবা যেত না— সেজন্য কাব্য-বসাস্বাদে ব্যাঘাত বা অসুবিধা কিছু হত এমন আমবা মনে কবি নে— মজুমদাব-পুঁথিব নেপথ্যভূমিতে তেমনি চুবি ক'বে প্রবেশ ক'বে জেনেছি এক দিকে 'চিত্রা'ব অন্য দিকে 'খেযা'ব দু-একটি কবিতাব 'জননান্তবসৌহৃদানি'— না হলে জানবাব কোনোই উপায ছিল না। চিত্রাব সম্পর্কে কৌতূহল চবিতার্থ হয এই পর্যন্ত। দেখি 'সিন্ধুপাবে' কবিতাব সূচনা হযেছিল এই ভাবে—

ঘুমাতেছিলাম গভীব নিশীথে
পৌষবজনী আডষ্ট শীতে
খণ্ডচন্দ্র পাণ্ডুবৰণ
হিমবিজডিত জ্যোৎস্নাকিবণ।

মনেব মতো না হওয়ায কেটে দিয়ে আবার লিখেছিলেন—

পৌষবজনী শীতজর্জব
নিবাণদীপ নির্জন ঘব
তপ্তশয়ন প্রিযাব মতন
বেখেছিল মোবে সোহাগে বেড়িয়া

ইত্যাদি। সেও বর্জন কবে এই প্রথম ছত্রটি যেই পাওযা গেল—

পৌষপ্রখব শীতে জর্জব ঝিল্লিমুখব বাতি

আপন বেগে আপনি পথ কেটে প্রবাহিত হল ছন্দ, ভাব ও কল্পনা সচ্ছন্দে উপনীত হল অভীষ্ট লক্ষ্যে। খাতার উল্টোদিকের মুখপাতে 'কপাল-টুকুনি' একটি ছত্র পাই—

যাছিলদিশুআজকিদিবকাল।

চিনতে দেরি হয় না এটি 'চিত্রা'র কোন্ কবিতার পূর্বাভাস। আর পূর্বোক্ত পৃষ্ঠাতেই দেখি—

আমার বক্ষপরে
মৃত্যু এসে নৃত্য করে গো
তার কেশ আলুলিত।

এটি কোনোদিন পরিপূর্ণ রূপে-রাগে ছন্দে-সুরে গান বা কবিতা হয়ে উঠেছে কি না সে তো আজ বলা যায় না। এহ বাহ্য। কৌতুক বা কৌতূহলের নিবৃত্তি শুধু। কিন্তু, নানা বর্জিত অসম্পূর্ণ লেখার মধ্যে হঠাৎ যখন আবিষ্কৃত হয় (পাঠক, 'খেয়া'র ১৩৬১ বা তৎপরবর্তী মুদ্রণের পাণ্ডুলিপিচিত্রখানি দেখে নেবেন)—

এক বরষার রাত্রে এ আমার অশ্রুসরোবর
কূল ছাপাইয়া কোথা গেছে চলি দিক্‌দিগন্তর।
প্রভাতে উঠিয়া দেখি
মাঝে ফুটিয়াছে একি
শূন্যবনে একমাত্র শতদল সম্পূর্ণ সুন্দর।

সমস্ত আকাশ আজ অনিমেষ তারি মুখ'পরে
নিস্তব্ধ চাহিয়া আছে সুগভীর প্রশান্ত আদরে।
বাতাস থামিয়া আছে
সুদূর তারের কাছে —
বিহঙ্গ গাহে না গান জানি না কী বিস্ময়ের ভরে।

আমাদেরও বিস্ময়ের অন্ত থাকে না। বিস্ময় এজন্য নয় যে মৃণালিনীদেবীর বিয়োগব্যথাহত কবি ঠিক মনের মতো শব্দ ও ছন্দ খুঁজে পান নি ভাবকে ভাষা দিতে গিয়ে, অর্ধপথে অচল হয়েছে লেখনী, তাই স্মরণের কবিতাবলীতে এটির স্থান হয় নি। বিস্ময় এ জন্যই যে—

এক রজনীর বরষণে শুধু কেমন করে
আমার ঘরের সরোবর আজি উঠেছে ভরে।
নয়ন মেলিয়া দেখিলাম ওই
ঘননীল জল করে থই থই—
কূল কোথা এর তল মেলে কই কহ গো মোরে।
এক বরষায় সরোবর দেখো উঠেছে ভরে।

হেরো হেরো মোর অকূল অশ্রুসলিলমাঝে
আজি এ অমলকমলকান্তি কেমনে রাজে।
একটি মাত্র শ্বেতশতদল
আলোকপুলকে করে টলোটল—
কখন ফুটিল বল্ মোরে বল্ এমন সাজে
আমার অতল অশ্রুসাগরসলিলমাঝে।

'খেয়া'র এই অপরূপ কবিতাটি যে বৃন্তহীন পুষ্প নয়, অবস্তু নয় বা কল্পনা-মাধুরী মাত্র নয়, জীবনের একান্ত বাস্তব অভিজ্ঞতারই পরমব্যঞ্জনা বা পারগামী তাৎপর্য— এ কথাটি তো জানা গেল। অন্ধকার হয়ে গিয়েছে আলো, ধুলোমাটি হয়েছে পেলবসুগন্ধি শুভ্রকুসুম। কল্পনা নয়, রূপক নয়— নিজের জীবনেই নিখিলজীবনের প্রত্যক্ষতা ও প্রতিভাস। কবি সুখদুঃখে অবিচল থাকতেন, শোকতাপের ঊর্ধ্বে উঠে যেতেন, ব্যক্তিগত রাগবিরাগের তুলনায় ভাবনাকল্পনা ও আত্মগত ধ্যানধারণা ছিল তাঁর কাছে সত্যতর, এ-সব বলতে কোনো বাধা না থাকলেও, সবই অর্ধসত্য মাত্র। 'কাব্য পড়ে যেমন ভাবো কবি তেমন নয় গো।' দ্বন্দ্বময় দুঃখময় মানবজীবনেরই অপূর্ব রূপান্তর হল কবিতা। পূর্বেই বলেছি ধুলো হয়েছে ফুল। ফুল গন্ধ হয়ে আকাশে বাতাসে নিঃশব্দে ছেয়ে গেছে, তারই 'অপরশ' আলিঙ্গনে চকিত হয়ে নির্জন পথচারী হয়তো জানতে পারে না অথবা জানতে চায় না কোথাকার কোন্ ফুলে এই সৌরভ জেগেছে। অথচ জানলে কি বিস্মিত হবে না? ভালো লাগবে না? 'ভাব হতে রূপে অবিরাম যাওয়া আসা' অথবা 'কখনো বা ভাবময় কখনো মুরতি' —এ কথার নিগূঢ় তাৎপর্য তখনই বোঝা যাবে।

যা হোক, রবীন্দ্রকাব্যগ্রন্থ খুলে 'বিশ্বের কবিতা'য় আমরা যখন খুশি মগ্ন

হতে পারি, 'গৃহের বনিতা' সম্পর্কেই আরও একটু বলবার কথা ছিল— যথাস্থানে বলা হয় নি। পাণ্ডুলিপির যে পৃষ্ঠায় স্মরণের প্রথম কবিতাটি দেখি, 'তুমি মোর জীবনের মাঝে মিশায়েছ মৃত্যুর মাধুরী', তার পূর্ববর্তী পৃষ্ঠায় পাই—

কুঞ্জকুটিরের স্নিগ্ধ অলিন্দের 'পর
কালিন্দীকমলগন্ধ বহিবে সুন্দর,
মুদিতনয়না লীনা তব অঙ্কতলে,
বাসন্তী সুবাস উঠে এলানো কুন্তলে,
তাঁহার কবির সেবা সেদিন কি হবে
কিসলয়-পাখাখানি দোলাইব যবে ?

এই অনূদিত কবিতাটি যে ঈষৎ-পরিবর্তন-সহ 'প্রজাপতির নির্বন্ধ' বা 'চির-কুমারসভা'য় ব্যবহৃত হয়েছে সে তো অনেকেরই মনে পড়বে। বৈষ্ণবকবির উজ্জ্বল রসের শ্লোক বড়ো ভালো লেগেছে বলেই রবীন্দ্রনাথ ব্যবহার করেছেন সন্দেহ নেই। এই কবিতার অব্যবহিত পূর্বেই কবি তাঁর খাতার পাতায় সংকলন করেছেন শ্রীমদ্‌শঙ্করাচার্যের বহুখ্যাত 'আনন্দলহরী' বা 'সৌন্দর্যলহরী' কবিতার শ্লোক—

বহন্তী সিন্দুরং প্রবলকবরীভারতিমির-
দ্বিষাং বৃন্দৈর্বন্দীকৃতমিব নবীনার্ককিরণম্।
তনোতু ক্ষেমং ন স্তব বদনসৌন্দর্যলহরী-
পরীবাহস্রোতঃসরণিরির সীমন্তসরণিঃ ॥

উত্তরকালে কবি এর এই ভাষান্তর করেন—'ঐ সিঁথির রেখা আমাদের কল্যাণ দিক, যে রেখাটি তোমার মুখসৌন্দর্যধারার স্রোতঃপথের মতো। আর, যে সিঁদুর আঁকা রয়েছে তোমার ঐ সিঁথিতে সে যেন নবীন সূর্যের আলো, তাকে ঘনকবরীভারের অন্ধকার শত্রু হয়ে বন্দী করে রেখেছে।'

কবি মন্তব্য করেছেন— সাধারণ নারী এ নয়, 'বিশ্বসৌন্দর্যের প্রতিমা অল্প কথায় ভাবের যে স্তবকগুলি সংবদ্ধ তাতে কবিহৃদয়ের আনন্দ দিয়ে আঁকা একটি ছবি দেখতে পাচ্ছি, সেই ছবিটি বিশ্বপ্রকৃতির নারীরূপ।'

আমরা বলব, গৃহলক্ষ্মীরূপ। গৃহে যখন থাকেন বিশ্বসৌন্দর্যের প্রতিমা ব'লে সব সময় তাঁকে জানি নে, আর না জানাতে ক্ষতিও হয় না। তিনি

নিজেও যে আত্মবিস্মৃতা। চকিতে তাঁকে চিনিয়ে দিয়ে যায় অদ্ভুত কবিদৃষ্টি অথবা অকরুণ মৃত্যু।

পাঠকের ধৈর্যের পরীক্ষা হল কতদূর সে আমরা অনুমান করতেও চাই না। উপস্থিত প্রসঙ্গটির সম্পর্কে বিশেষ সুবিচার করা হয়তো আমাদের সাধ্যের অতীত। প্রতিভার মায়াদণ্ডস্পর্শে কী থেকে কী হয় তারই আর-একটি দৃষ্টান্ত সংকলন করে ক্ষান্ত হব। 'হিন্দিভাঙা' গানের বিষয় পূর্বে বলা হয়েছে। সর্বদাই হিন্দি গীতপংক্তির ফাঁকে ফাঁকে বাংলা কথার সংযোজনা হয়েছে যে এমন নয়। কদাচিৎ হিন্দিগানের কথাই শুধু পাওয়া গিয়েছে। এই যেমন—

বাজা দুলারকা বনারা আইল মা রাতচো
লেরা সুধরীনি মেরোরি আঙ্গন রা।
ধনরী তেরো ভাগ যো এসো বর
পায়া, নিরখি রহী কহুঁ কোন
সাজন রা। মেরোরি আঙ্গন রা।*

সঙ্গে সঙ্গেই মনে পড়ে না কি ?—

ওগো মা,
রাজার দুলাল যাবে আজি মোর
ঘরের সমুখ পথে।
বলে দে আমায় কী করিব সাজ,
কী ছাঁদে কবরী বেঁধে লব আজ,
পরিব অঙ্গে কেমন ভঙ্গে

* মূলগান স্বরলিপি-সহ শ্রীরামপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় -প্রণীত 'সঙ্গীত-মঞ্জরী'তে (১৩১৪) মুদ্রিত আর 'সংশোধিত' দ্বিতীয় সংস্করণেও (১৩৪১) সুলভ্য এই তথ্য বন্ধুবর শ্রীক্ষিতীশ রায় আমাদের জানিয়েছেন। যুক্তিযুক্ত বাংলা ভাষান্তর কী হওয়া উচিত সে বিষয়েও আলোকপাত করতে ত্রুটি করেন নি, তবে রবীন্দ্রনাথ যদি মূলানুসরণে সম্পূর্ণ অবহিত না হয়ে থাকেন (না হওয়ার নানা কারণই ছিল), আমরা যে হতে পেরেছি সে দাবিও করা চলে না।

কোন্ ববনেথ বাস।...

ওগো মা,

বাজাব ছুলাল গেল চলি মোর

ঘরেব সমুখপথে।

ছিঁড়ি মণিহাব ফেলেছি তাহাব

পথেব ধূলাব পরে।

মা গো,

কী হল তোমাব অবাক্ নয়নে

চাহিস্ কিসেব তবে।

ভাষাবিৎ মনে-মনে হাসুন। একটিব সঙ্গে অন্যটির নাহয 'না-বোঝাব প্রদোষ-আলোকে'ই দৃষ্টিবিনিময হয়েছে। পুবাতন ঠাটেব এই হিন্দি আমবা অনেকেই বুঝি না আব হযতো বা ববীন্দ্রনাথও বোঝেন নি। অপূর্ব সুবেব আনন্দ-বেদনাময় লোকে কল্পনা কবেছেন—

কোন্ বাজাব ছুলাল এল আমাব আঙিনায মা।

তাব ভাগ্য ভালো এমন বব যে পেযেছে!

চেযে আছিস মুখেব দিকে।

বলে দে আমায কোন্ সাজে

সাজব। আমাব আঙিনা বেয়ে এসেছে।

কী জানি বসন্তে বাহাবে পবজে বা সাহানাতে, কেমন মীড়ে মূর্ছনায, প্রবাহিত স্ববলহবীতে, অন্তবে বাহিবে আনন্দ-ঔদাস্যেব ঢেউ তুলে দিয়েছিল মূল গান। সে তো থাকবে না কবিতায। কবিতায সুবেব লীলা ও নৃত্য লীন হযে যায ছন্দোবদ্ধ বাগর্থে। সুস্বব ঘণ্টাব ধ্বনি দিশে-দিশান্তে দূবে-দূবান্তবে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হযে শেষে নীবব হল যখন, হযতো কান পেতে শোনা যাবে সূক্ষ্ম বেশ বাজছে তখনো, কাঁপছে তখনো ঘণ্টাব ঝঙ্কৃত 'অণুপবমাণু'তে ; তেমনি অন্তর্লীন ধ্বনিকেই আনন্দবর্ধন বা অভিনবগুপ্ত কবিতাব 'ধ্বনি' 'বসধ্বনি' বলেছেন এই আমাদেব 'নিশ্চিত অনুমান'। সেই ধ্বনিবই চমৎকাবিত্বে সমগ্র ববীন্দ্রসাহিত্যেও ঐ 'শুভক্ষণ' কবিতাটি অতুলনীয। নাহয ববীন্দ্রনাথ শব্দ ভুল শুনেছেন, স্বেচ্ছায বা অনবধানে শব্দার্থ ভুলই বুঝেছেন, তাতে কিছু ক্ষতি হয নি। বুঝি হিন্দিগানেব সুবটি আত্মসাৎ কবেছেন গূঢ় অন্তবে।

এবাব আব নূতন গান বচনা কবেন নি তাবই প্রেরণে, নূতন কবিতারূপে তা আমাদের গোচব হযেছে। ববীন্দ্রনাথ ঋণ নিয়েছেন অথবা ঋণী কবেছেন সকল কালেব সকল বসিকজনকে কে তা বলবে? আনন্দবেদনাব আবেদনে মূল গানটি হযতো অপূর্বই। তাবই চকিত স্ফুলিঙ্গপাতে কাব্যলোকে এই যে বসেব দীপটি জ্বলে উঠেছে, আপনাব সঞ্চিত স্নেহে, আপনাবই অলৌকিক দীপ্তিতে, জানি তাব কোনো তুলনা হয না।*

জোড়াসাঁকো

১৯ জুন ১৯৬০

---

* ববীন্দ্রসদন-কর্তৃপক্ষেব সৌজন্যে মালতী-পুঁথি ও অন্যান্য ববীন্দ্র-পাণ্ডুলিপি দেখাব সুযোগ হযেছে, বিশ্বভাবতী ও ববীন্দ্রসদনেব সৌজন্যে ববীন্দ্রবচনাব নানা অংশ, বিশেষতঃ ববীন্দ্রনাথ-কৃত অপ্রকাশিত 'মদনভস্ম' সংকলন কবা সম্ভবপব হল— এজন্য লেখক বিশেষ কৃতজ্ঞ আছেন।

এই প্রবন্ধেব অধিকাংশ উদ্‌ধৃতিব বানান এবং বিবামচিহ্ন প্রচলিত বীতি-সম্মত কবা হযেছে, স্তবকভাগ বা ছত্র-সাজানো আমাদেব প্রযোজন-উপযোগী। বর্তমান প্রবন্ধ, লেখকেব যন্ত্রস্থ 'ববীন্দ্রপ্রতিভা' গ্রন্থেব অন্যতম অধ্যায। লেখকেব নিজেব সন্তোষেব উদ্দেশে আব জিজ্ঞাসু পাঠকদেব বিচিত্র দাবি মেটাবাব কামনাতেও বটে, নানা টীকা-টিপ্পনি যোগ কবা যেত— কিন্তু সে-সব গ্রন্থেই থাকবে, উপস্থিত 'উত্তবসূবী' পত্রেব আব অধিক জাযগা জোড়া সমুচিত নয।

রবীন্দ্রনাথের কাব্যপ্রত্যয়

অশ্রুকুমার সিকদার

দান্তে-সম্পর্কে লিখিত তাঁর বিখ্যাত নিবন্ধে এবং অন্যত্রও এলিয়ট কাব্যের সঙ্গে কবির প্রত্যয়ের সম্বন্ধ বিষয়ে সবিশেষ আলোচনা করেছেন। কবির প্রত্যয়কে উপেক্ষা করে কাব্যরস পরিপূর্ণত উপভোগ করা অসম্ভব, কেননা কাব্যের মূল্য তার উপাদানসমূহের গাণিতিক যোগফলে নয়, কাব্য একটি সার্বভৌমিকতা—শব্দ ছন্দের মতই তার প্রত্যয় এক অপৃথকসম্ভব সমবায়ের অঙ্গ। কবির ব্যবহারিক বিশ্বাস আমাদের আলোচ্য নয়, কাব্যের মধ্যে একাত্ম যে প্রত্যয় তাই কাব্যপাঠকের আলোচ্য। আর কাব্যপ্রত্যয়ে রূপান্তরিত হয়ে ব্যবহারিকজীবনের ধর্মনৈতিক বা রাজনৈতিক মতবাদের চরিত্রই যেন পরিবর্তিত হয়ে যায়। সুতরাং কবি যে মতবাদে মানুষ হিসাবে বিশ্বাস করেন সেই মতবাদে অবিশ্বাসী হয়েও পাঠকের পক্ষে কাব্যরস আস্বাদ করা সম্ভব কিন্তু কাব্যপ্রত্যয় সম্বন্ধে যদি অন্তত পাঠকের 'poetic assent' (এলিয়ট) বা 'provisional acceptance' (রিচার্ডস্) না থাকে তবে সেই কাব্য আস্বাদ্য হতে পারে না। ব্যক্তিগত বিশ্বাস-অবিশ্বাসকে নিরুদ্ধ রেখে উপলব্ধির দ্বারকে আমরা উদার করে দিই এবং সম্পূর্ণ বিরোধী প্রত্যয়ের কাব্যও তাই আস্বাদনীয় হয়ে ওঠে। পূর্বোক্ত প্রবন্ধের পাদটীকায় এলিয়ট বলেছেন "the reader can obtain the full 'literary' or 'aesthetic' enjoyment without sharing the beliefs of the author"—কিন্তু কাব্যের পরিপূর্ণ উপভোগের কথা বলছি আমি, শুধু সাহিত্যিক বা নন্দনতাত্ত্বিক উপভোগের সংকীর্ণতার কথা বলছি না। যে মুহূর্তে আমরা কবির জগতে প্রবেশ করি, সেই কাব্যকে পরিপূর্ণ উপভোগের প্রয়োজনে, অন্তত সাময়িকভাবে আমরা সেই কাব্যের প্রত্যয়ের অংশীদার হয়ে যাই। কিন্তু তার মানে এই নয় যে আমরা কবির ব্যক্তিগত ব্যবহারিক বিশ্বাসগুলিও সমর্থন করি।

যে প্রত্যয়সমূহে আমরা ব্যক্তিগত জীবনে বিশ্বাসী নই, কাব্যপাঠকালে

কোন সরল শক্তিতে সেগুলি বিশ্বাস্য হয়ে ওঠে, এটি একটি মৌলিক প্রশ্ন। এই প্রশ্নের কতকটা উত্তর এম্পসনের উক্তির মধ্যে পেতে পারি—"For poetry has powerful means of imposing its own assumptions, and is very independent of the mental habits of the reader."২ এতদ্ব্যতীত কবিতার প্রধান ও মৌলিক বিষয়বস্তুগুলি অধিকাংশই রহস্যময়, যুক্তিসিদ্ধান্তের আয়ত্তের অতীত, অসমাধিত এবং দুঃসমাধেয়—প্রেম, নিঃসঙ্গতা, জীবন, মৃত্যু, ঈশ্বর। বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের মত এই সম্বন্ধে কোন বিশ্বাস বা প্রত্যয়কেই সত্য বা মিথ্যা বলে কোন নিশ্চিন্ত ল্যাবোরেটরীতে নির্ণয় করা যায় না। নারকেলফল বৃন্তচ্যুত হয়ে মাটিতে না পড়ে আকাশে ধাবমান হচ্ছে একথা বিশ্বাসযোগ্য নয়, কেননা এর ভ্রান্তি সহজেই পরীক্ষা করে দেখানো যেতে পারে। কিন্তু প্রেম নিঃসঙ্গতা জীবন মৃত্যু ঈশ্বর সম্বন্ধে ব্যক্তিগতভাবে কোন বিশ্বাস আমরা পোষণ করা সত্ত্বেও, সে সম্বন্ধে অপর সব বিশ্বাসই ভ্রান্ত একথা যেহেতু আমরা মনে করতে পারি না, সেইকারণে এই সমস্ত দুঃসমাধেয় রহস্যের বহুমুখী উত্তরের সকলকেই আমাদের মন মেনে নিতে প্রস্তুত থাকে। সেই কারণে কবি যে কোন প্রত্যয়ে বিশ্বাসী হয়েই এই সব প্রশ্ন সম্বন্ধে তাঁর অভিজ্ঞতাকে কাব্যে রূপান্তরিত করুন না কেন, কাব্যপাঠকালে সেই বিশ্বাসে আমরা সহজেই সায় দিতে পারি। এমন বিশ্বাস যে সম্ভব তার কারণ দার্শনিক মতবাদ যুক্তির উপর নির্ভর করে, যুক্তি দিয়ে তাকে খণ্ডনও করা যায়, কবিতা আবেগের উপর নির্ভর করে, আবেগ-প্রাপ্ত উপলব্ধিকে যুক্তি দিয়ে খণ্ডন করা যায় না। দার্শনিক তাঁর মতবাদকে একটি যুক্তিশৃঙ্খলাবদ্ধ সুকঠিন বিন্যাসের মধ্য দিয়ে, ব্যাখ্যা-উদাহরণ-সিদ্ধান্তের মাধ্যমে উপস্থিত করেন, তার মধ্যে জীবনরহস্যের বহুমুখী উত্তর দেবার, অন্তর্দৃষ্টিতে উপলব্ধ উত্তরকে সত্য বলে মেনে নেবার উদারতা নেই। কিন্তু এই দার্শনিক মতবাদই যখন কাব্যপ্রত্যয়ে রূপান্তরিত হয় তখন প্রথমত তার মধ্যে যুক্তি-শৃঙ্খলার অনড় সংকীর্ণতা থাকে না, দ্বিতীয়ত সেই কাব্যপ্রত্যয়ের সত্য অন্য কবির কাব্যপ্রত্যয়কে ভ্রান্ত প্রমাণিত করবার উদ্ধত দাবী করে না। সেই কারণে সন্ত আকুইনাসের রচনাবলী পাঠকালে পাঠক যে সমস্ত মতবাদকে

২ এম্পসন, Seven Types of Ambiguity Chap. I

স্বীকার করে নিতে পারেন না, দান্তের কাব্যে সেই মতবাদই কাব্যপ্রত্যয়ে রূপান্তরিত হলে কাব্যপাঠকালে তাকে মেনে নিতে পাঠক কোন বাধা বোধ করেন না। যদি এই প্রত্যয় কাব্যে রূপান্তরিত হবার পরেও শুধুমাত্র সেই প্রত্যয়ে বিশ্বাসীর কাছেই সত্যের মর্যাদা পায়, তবে বুঝতে হবে সেই প্রত্যয় তত্ত্বমাত্রই রয়ে গেছে, কাব্যের জাদুবৃত্তের মধ্যে সে প্রবেশাধিকার পায় নি। কিন্তু যদি সেই প্রত্যয় কাব্যে রূপান্তরিত হয়ে শুধুমাত্র বিশ্বাসীদের কাছে স্বীকৃতি না পেয়ে, সামগ্রিক মানবতার দ্যোতনায়, বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী নির্বিশেষে সমস্ত পাঠকের নিরঙ্কুশ সায় পায়—অর্থাৎ যখন প্রত্যয় গোষ্ঠীগত মতবাদ থেকে বৃহত্তর মানবিক উপলব্ধিতে রূপান্তরিত হয় তখনই তা কাব্যের মধ্যে পরম সার্থকতা পায়। যেমন হয়েছে রোমান ক্যাথলিক ধর্মে অবিশ্বাসীর কাছেও দান্তের 'দিব্যমিলন' কাব্য, বা খ্রীষ্টান পাঠকের কাছে 'শ্রীমদ্ভাগবতগীতা'।

এবং কবি ব্যক্তিগত জীবনে যে দার্শনিক মতবাদ পোষণ করেন কাব্যে যখন তা রূপান্তরিত হয়ে একটি ব্যাপকতা অর্জন করে তখন তাই প্রজ্ঞার মর্যাদা পায়। সেই প্রত্যয় তখন আর কঠিন সংকীর্ণ দার্শনিক মতবাদমাত্র থাকে না, জীবনের উপলব্ধি ও অস্তিত্ব-বিষয়ে অন্তর্দৃষ্টির আলোকে সেই প্রত্যয় একটি উদার ব্যাপকতা পায়, প্রজ্ঞার স্তরে উন্নীত হয়। দার্শনিক মতবাদটিকে যুক্তিবাদী মন অগ্রাহ্য করতে পারে, কিন্তু ব্যাপক প্রজ্ঞাদৃষ্টিতে প্রাপ্ত কাব্যের ফসল যা আমাদের সামগ্রিক অস্তিত্বের আবেগময় উপলব্ধির জন্য বিশেষ জরুরী, তাকে অগ্রাহ্য করা যায় না। "Whether the 'philosophy' or the religious faith of Dante or Shakespeare or Goethe is acceptable to us or not . there is the Wisdom that we can all accept."[৩] যখন কাব্যপ্রত্যয়ের মধ্যে প্রজ্ঞাদৃষ্টির এই উদারতা বর্তমান থাকে তখন কোন প্রত্যয়ে ব্যক্তিগত জীবনে পাঠকের বিশ্বাস-অবিশ্বাস কাব্যপাঠের পক্ষে কোন বাধা হয় না। এই কারণে এমন ঘটনা অনুমান করতে পারি যেখানে অন্যসব বিষয়ে মিল আছে এমন দুজন কাব্যপাঠক, যাদের একজন কবির প্রত্যয়ে বিশ্বাসী, অন্যজন অবিশ্বাসী, তারা কাব্যকে কাব্য হিসাবে উপভোগে সমান রস-পরিতৃপ্তি পেতে পারেন। যিনি বিশ্বাসী

৩ এলিয়ট, Goethe as a Sage.

তিনি রস-পরিতৃপ্তির আনন্দের সঙ্গে হয়তো উপরন্তু নিজের বিশ্বাসে কবির সমর্থন প্রাপ্তির আনন্দ অর্জন করবেন—কিন্তু সেই আনন্দ কাব্যের লক্ষ্যের পক্ষে অবান্তর। সেই কারণে কালান্তরে নানা বিশ্বাস নানা মতবাদ রূপান্তরিত হয়ে যায়, কিন্তু সেই সব বিশ্বাসের উপর ভর করে যে সব কাব্য রচিত হয় তার চিরন্তনমূল্য হ্রাস পায় না। চিরন্তনমূল্য তখনই হ্রাস পায় যখন যুগ-সংকীর্ণ দার্শনিক বা ধর্মনৈতিক মতবাদের বাইরে সেই কাব্যে মানুষের সর্বকালাতীত সামগ্রিক অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোন প্রজ্ঞাদৃষ্টি অনুপস্থিত থাকে।

কাব্যপ্রত্যয়-প্রসঙ্গে এলিয়টের দীর্ঘকাল পূর্বে মনে হয়েছিল কাব্যপ্রত্যয়ে কবির বিশ্বাসও বোধহয় জরুরী নয়, মনে হয়েছিলো পাঠকের মতো কবির প্রত্যয়ও বুঝি সাময়িক হলে চলে—"Dante, qua poet, did not believe or disbelieve the Thomist Cosmology or theory of the soul, he merely made use of it,"[৪] কিন্তু দীর্ঘ ত্রিশ বৎসরকাল পরে এলিয়ট উপলব্ধি করেছিলেন এই কথাকে সত্য বলে মেনে নিলে কবির আন্তরিকতা আর বজায় থাকে না, "Such a suggestion would appear to be a justification of insincerity, and would annihilate all poetic values except those of technical accomplishment."[৫] কাব্যপ্রত্যয়ে কবির আন্তরিক বিশ্বাসের এই প্রশ্নই উদাহরণসহ শ্রীযুক্ত অমলেন্দু বসু (চতুরঙ্গ '৬৬) উত্থাপন করেছেন, "প্যারাডাইজ লস্টের সৌরজগৎ টলেমির মতানুসারী যদিচ মিলটন শুধু যে গ্যালিলেওর সঙ্গেই পরিচিত ছিলেন এমন নয়, তৎকালীন ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিক চিন্তার সূক্ষ্ম আবিষ্কারাদি সম্বন্ধেও ওয়াকিফ্‌হাল ছিলেন আর বিলক্ষণ জানতেন যে কোপার্নিকাসের নব গণনার অভিসংঘাতে প্রাচীন গ্রীক জ্যোতিষশাস্ত্র অচল হয়ে গেছে।" এই প্রশ্ন যতোটা ব্যাসকূট মনে হয়, প্রকৃত প্রস্তাবে ততোটা জটিলতা তার মধ্যে নেই। প্রথমত, কাব্যপ্রত্যয়ে আন্তরিকতার বিচার একমাত্র কবিতার কষ্টিপাথরেই করণীয়। কবির প্রত্যয় তখনই আন্তরিক যখন সেই প্রত্যয় কল্পনা ও প্রতিভাকে প্রদীপ্ত করতে পেরেছে, জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে কোন প্রজ্ঞাকে প্রকাশ করতে পেরেছে,

---

৪ এলিয়ট, Shakespeare and the Stoicism of Seneca

৫ এলিয়ট, Goethe as a Sage

কাব্যপ্রত্যয়েব আন্তবিকতা বিচাবেব জন্য কাব্যাতিবিক্ত কোন তথ্যসংগ্রহের প্রয়োজনীয়তা নেই। দ্বিতীয়ত, এই বকম কোপার্নিকাসেব জ্যোতিবশাস্ত্রে পরিচয় সত্ত্বেও কাব্যে টলেমিব মতানুসারী বর্ণনা অর্থাৎ ব্যক্তিগত বিশ্বাসে ও কাব্যপ্রত্যযে এই দ্বিধা একমাত্র বর্ণনামূলক কাব্য বা নাট্যকাব্যেই সম্ভব, যেখানে কবি অনেক পবিমাণে ব্যক্তিনিবপেক্ষভাবে বস্তু বা কাহিনীব বিববণ দেন। এ ব্যাপাব ঘটে দ্বিতীয় বা তৃতীয় স্তবেব কাব্যে যেখানে প্রত্যক্ষভাবে কবি স্বযং বক্তা নন, কিন্তু প্রথম স্তবেব কবিতায়, যেখানে স্বযং কবিই বক্তা সেখানে কবিব ব্যক্তিগত বিশ্বাসে ও কাব্যপ্রত্যয়ে বিবোধ সম্ভব নয়।

কবিব কাব্যপাঠ কবতে গেলে প্রথমেই পাঠককে তাঁব কাব্যপ্রত্যযেব সম্মুখীন হতে হবে। সেই প্রত্যযে পাঠকও যদি বিশ্বাসী হন তবে অবলীলা-ক্রমে তিনি সেই উদ্যানে প্রবেশ কবতে পাববেন। যদি পাঠক অপবপক্ষে অবিশ্বাসী হন, তবে তিনিও উদ্যানদ্বাবে সম্মতি ও আনুগত্যেব মূল্য দিযে যেতে কুণ্ঠিত হবেন না, কেননা তিনি জানেন পুষ্পসম্ভাবে পবিপূর্ণ উদ্যান তাঁব জন্য অপেক্ষায। যখন তিনি উদ্যানে ভ্রমণ কববেন, প্রতি পুষ্প প্রতি শোভা যখন তাঁকে মুগ্ধ কববে তখন তিনি বুঝবেন উদ্যানবক্ষা ও তাব শ্রীবৃদ্ধিব জন্য দ্বাবে ঐ মূল্য আদাযেব প্রযোজন ছিল। তিনি বুঝবেন, কাব্যেব বসাস্বাদ ও কাব্যেব মাধ্যমে জীবনোপলব্ধিব জন্য ঐ কাব্য-প্রত্যযে অন্তত সাময়িক আনুগত্য অনিবার্য, এই মূল্য প্রকৃত কাব্যপাঠক সানন্দে দান কববেন। পবে কবিতাব ছন্দ, সঙ্গীত-শব্দ-ইমেজ এবং বাক্যবিন্যাসেব অমব ভাস্কর্যেব প্রভাব পাঠককে মন্ত্রমুগ্ধ কবতে আবম্ভ কববে—সাময়িক সম্মতি দিয়ে, সাময়িক আনুগত্যেব মূল্যে যে কাব্যেব অভ্যন্তবে তিনি প্রবেশ কবেছিলেন, সেই কবিব কাব্যপ্রত্যযেব সঙ্গে দীর্ঘ পবিচয ও সহমর্মিতাব ফলে সেই প্রত্যযও পাঠকেব প্রজ্ঞাদৃষ্টিব মধ্যে স্থান পাবে। শুধু কাব্যপাঠকালে নয়, কাব্যপাঠেব পবেও সেই দিব্যপংক্তিগুলি পাঠকেব মনেব মধ্যে অনুবণন জাগাবে, তাঁব উপলব্ধি ও বোধিকে প্রসাবিত কববে, বিশেষত মহাকবিব কাব্যসম্বন্ধে পাঠকেব মনে হবে কবিব ব্যবহাবিক প্রত্যয সম্বন্ধে প্রাক্তন অবিশ্বাস সত্ত্বেও, পাঠক যেন মহাকবিব কাব্যপ্রত্যযে চিবকালেব অংশীদাব। "When all provisional acceptances have lapsed, when the single references and their connections which may have led upto the final response are forgotten, we may still have an

attitude and an emotion which has to introspection all the characters of a belief."৬

সাময়িক সম্মতির স্তর অতিক্রম করে কাব্যে-রূপায়িত বিরোধী বিশ্বাসেও পাঠকের স্থায়ী প্রত্যয় যে জন্মায় একথা কাব্যপাঠক মাত্রেরই বাস্তব অভিজ্ঞতা। তাই শুধুমাত্র কাব্যপাঠকালে বিরোধী বিশ্বাসে সাময়িক সম্মতির মধ্যে বিচার্ডস্ পাঠকের আন্তরিকতার অভাব দেখতে পেয়েছেন। তাঁর মতে এই সাময়িক সম্মতি বিশ্বাসের ভানমাত্র, প্রকৃত বিশ্বাস নয়। যে বিরোধী বিশ্বাসের কাব্য সাময়িক সম্মতির সহায়তায় ভোগ করতে হয়, তার চেয়ে যে কাব্যপ্রত্যয়ে পাঠক স্বয়ং বিশ্বাস করেন সেই কাব্যরসের উপভোগ যে অনেক নিবিড় হয়, অনেক তত্ত্বালোচনার পরে এলিয়ট এ কথা বিব্রতভাবে স্বীকার করেছেন। এই বিব্রত অবস্থা দূরীকরণের জন্য, কাব্যপ্রত্যয়ে কবির আন্তরিকতার মতো পাঠকের আন্তরিকতার প্রয়োজনকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য বিচার্ডস্ প্রত্যয়কে intellectual ও emotional belief-এ ভাগ করেছেন। কোন প্রত্যয়ে বুদ্ধিগ্রাহ্যভাবে বিশ্বাসী না হয়েও, সেই প্রত্যয় যখন কাব্যে রূপান্তরিত হয় তখন সেই প্রত্যয়জাত আবেগে আমরা বিশ্বাসী হই। সামান্য শিক্ষিতমাত্রেও বুদ্ধি দিয়ে জানে চাঁদ মেরুশীতল এক বস্তুপিণ্ডমাত্র, কিন্তু উচ্ছল জ্যোৎস্নার রাত্রে তাকে 'সুধাপাত্র' বলেই আমরা সহজে বিশ্বাস করি, বৈজ্ঞানিক তথ্য সে বিশ্বাস টলাতে পারে না। কাব্যপাঠকালে বুদ্ধিগত বিশ্বাস-অবিশ্বাসের প্রশ্ন যোগ্য পাঠকের মনে কখনই ওঠে না, প্রশ্ন ওঠে শুধু আবেগ ও অনুভূতিতে বিশ্বাস-অবিশ্বাসের। "The absence of intellectual belief need not cripple emotional belief."৭ তাই শুদ্ধচিত্ত কাব্যপাঠকের পক্ষে বিরোধী প্রত্যয়জাত কাব্যরসের পরিপূর্ণ আস্বাদন সম্ভবপর হয়ে ওঠে।

দুই

রবীন্দ্রনাথের কবিতায় আদ্যন্তকাল যে প্রত্যয় বর্তমান তাকে সংক্ষেপে অদ্বয়বাদে, শুভবাদে, আদর্শবাদে বিশ্বাস বলা যেতে পারে। এবং এই প্রত্যয়ের মধ্যে পাই ঐতিহ্যের প্রায় সামগ্রিক স্বীকৃতি। ভারতীয় জীবনাদর্শ,

---

৬ বিচার্ডস্, Principles of Literary Criticism, Chap XXXV

৭ বিচার্ডস্, Practical Criticism, Part II Chap VII

উপনিষদীয় ব্রহ্মতত্ত্ব রবীন্দ্রনাথের প্রত্যয়ের মৌলিক ও প্রধান উপকরণ— তার সঙ্গে পারিবারিক ব্রাহ্মধর্ম, মধ্য-ভিক্টোরীয় মনোভাবের প্রভাব এবং উনিশ শতকের রোমান্টিক কাব্যাদর্শ অল্পাধিক পরিমাণে সহায়ক শক্তি হিসাবে কাজ করেছে। এই অদ্বয়বাদ প্রকৃতি ও মানবজগতের মধ্যে, পাপ ও পুণ্যের মধ্যে জীবন ও মৃত্যুর মধ্যে কোন দ্বৈততা স্বীকার করে না। এই প্রত্যয় যেহেতু আদর্শবাদী, তাই বাস্তব পৃথিবীর বাইরে এক পরমরমণীয় উন্নত পৃথিবীকে সে অনুমান করে, আমাদের বাস্তব পৃথিবী যার হীন অনুকৃতি এবং প্রতিফলনমাত্র—আর এই কারণেই এই অদ্বয়বাদী শুভবাদী কাব্য-প্রত্যয়ের সঙ্গে উনিশ শতকের রোম্যান্টিক কাব্যাদর্শ এতো সহজে একাত্ম হয়ে যেতে পেরেছে। এই প্রত্যয়ের মধ্যে বোদলেয়ার-কথিত ঈশ্বর ও শয়তানের প্রতি 'two simultaneous and contradictory attractions'-এর কোন প্রশ্রয় নেই, কীটস্-কথিত 'the love of good and ill'-এর কোন প্রবেশাধিকার নেই।

একো দেব সর্বভূতেষু গূঢ়ঃ সর্বব্যাপী সর্বভূতান্তরাত্মা। সেই এক দেব, যিনি গোপনে সর্বভূতের মধ্যে সর্বব্যাপী হয়ে বর্তমান, সর্বভূতের যিনি অন্তরাত্মা, তিনি প্রকাশিত বলেই যদি সমস্ত প্রকাশিত হয়, তাঁর আলোকেই যদি সমস্ত বিভাসিত হয়, তবে প্রকৃতি-মানুষের মধ্যে, পাপ-পুণ্যের মধ্যে যে বিরোধ ও দ্বন্দ্ব আমাদের প্রত্যক্ষগোচর হয় তা নিতান্তই আপতিক। হিরণ্ময়পাত্রের সত্যের মুখটি ঢাকা পড়েছে বলেই মানুষ দ্বৈতের দ্বন্দ্বে বিচলিত হয়, কিন্তু সত্যধর্মের উপলব্ধির জন্য যদি সেই আবরণটি সরিয়ে নেওয়া হয় তবে দ্বৈতের সমস্ত দ্বন্দ্বের অবসান হবে এবং অদ্বৈত তাঁর সিংহাসনে নিশ্চিন্তে আসীন হবেন। "সমস্তটার দিকে সমগ্রভাবে যখন দেখি তখন দেখি ভূমার ক্ষেত্রে সুরের সঙ্গে সুরের মিল, রেখার সঙ্গে রেখার যোগ, রঙের সঙ্গে রঙের মালাবদল।" (কবির কৈফিয়ত—সাহিত্যের পথে)। অন্যত্র রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "এই সমস্ত শক্তি অসংখ্য বেগে এবং অসংখ্য তালে ক্রমাগতই আকাশময় ছুটে চলেছে—তার বেগ, তার বল, তার লক্ষ্য, তার বিচিত্রতা আমাদের ধারণাশক্তির অতীত, কিন্তু এই সমস্ত প্রবলতা বিরুদ্ধতা বিচিত্রতার উপরে অধিষ্ঠিত অবিচলিত অখণ্ড সামঞ্জস্য। আমরা যখন জগৎকে কেবল তার কোন একটামাত্র দিক থেকে দেখি তখন গতি এবং আঘাত এবং বিনাশ

দেখি, কিন্তু সমগ্রকে যখন দেখি তখন দেখতে পাই নিস্তব্ধ সামঞ্জস্য।" (সামঞ্জস্য—শান্তিনিকেতন ২)। যে ভারতীয় ঐতিহ্য এই সামঞ্জস্যেব মন্ত্র ওঙ্কাবেব সাধনা কবেছে সেই ঐতিহ্য বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে বিদ্যমান নেতিশক্তিকে অস্বীকাব কবেছে এবং এই উত্তবাধিকাবেব প্রবর্তনায় ববীন্দ্রকাব্যপ্রত্যয়ে সামঞ্জস্যেব মন্ত্র ওঙ্কাবেব এমন সার্বভৌম প্রভাব বিস্তাব কবেছে।

একদিকে ভাবতবর্ষ এই অদ্বযবাদে বিশ্বাস কবেছে, অপবপক্ষে যে গ্রেকো-বোম্যান জগৎ থেকে পশ্চিমী সভ্যতাব বিকাশ সেই গ্রীক ও বোমক দর্শন, কিছু বিপবীত উদাহবণ সত্ত্বেও, দ্বৈতবাদে বিশ্বাসী। গ্রীক দর্শনেব প্রাক্ সক্রেটিস যুগ থেকেই দ্বৈতবাদেব একটি প্রধান ও সুস্পষ্টধাবাব পবিচয় আমবা পাই। অবফিক্ মবমীযাবাদে, পীথাগোবাসেব মতবাদে দ্বৈতবাদ, বস্তু ও চৈতন্যে, দেহ ও আত্মায, ঈশ্ববে ও বস্তুব্রহ্মাণ্ডে, স্বাতন্ত্র্য স্বীকৃত হযেছে। বৈষম্যকে উপেক্ষাব অপবাধে হেবাক্লিটাস হোমাবকে তিবস্কৃত কবেছেন, তিনি বলেছেন "the hidden harmony of nature always restores harmony from the contraries"—সুতবাং তিনি নিজে সুষমাব ধ্যানে বৈষম্যকে বর্জন কবেন নি। প্লেটোব বচনাবলীতে এই দ্বৈতবাদী দর্শন তাব পবম বিকাশ লাভ কবে। অ্যারিস্টটল যদিও প্লেটোব দর্শনেব বহু মতামতকে বর্জন কবেছিলেন, তবু সেই দ্বৈতবাদেব প্রভাব তিনি সম্পূর্ণ উপেক্ষা কবতে পাবেন নি। বোমক সাম্রাজ্যেব দর্শন চিন্তাতেও, সেনেকা, এপিক্টেটস, মার্কাস অবেলিযসেব বচনাতেও এই দ্বৈতবাদেব প্রকট উপস্থিতি আমবা লক্ষ্য কবি। পশ্চিমী সভ্যতাব ফসল যে কাব্যসাহিত্য, তাব বিচাব ও সমালোচনাব মানদণ্ড প্রযোগে যখন আমবা প্রাচ্যসভ্যতাব উৎসমুখ থেকে উৎপন্ন কাব্য-সাহিত্যকে বিচাব কবতে যাই, তখন তাব পূর্বে ভাবতীয় অদ্বয়বাদী চিন্তার সঙ্গে পাশ্চাত্যদর্শনেব এই প্রধান দ্বৈতবাদী চিন্তার পার্থক্যেব কথা আমাদেব স্মবণে বাখা দবকাব।

এই প্রত্যয় যদি ববীন্দ্রনাথেব ব্যক্তিগত ব্যবহাবিক বিশ্বাসমাত্র হতো তবে সে বিষয়ে আলোচনা কবতো জীবনচরিতকার, কাব্যপাঠকের সে নিয়ে ব্যস্ত হবার কাবণ ঘটতো না। কিন্তু এই প্রত্যয় রবীন্দ্রনাথের সমগ্র কাব্যেব অন্তবালে প্রাণবস্তুরূপে সমুপস্থিত, তাই এই প্রত্যয় যদি পাঠকেব আবেগময় বিশ্বাস না জন্মায় তবে ববীন্দ্রকাব্যেব সমুন্নত বস-পবিতৃপ্তি পাঠকের আয়ত্তের

অতীত থেকে যাবে চিরকাল। সমগ্র বিশ্বের বিপর্যয়, বিশৃঙ্খলা এবং উন্মার্গ-গামিতার মধ্যে শুধু ব্যক্তিগত জীবনে নয়, কাব্যরচনাকালেও স্থৈর্যের সন্ধান রবীন্দ্রনাথ পেয়েছেন এই প্রত্যয়ের মধ্যেই—নিবিড় ঘন আঁধারে সেই ধ্রুবতারা জাজ্বল্যমান৮ এবং জাজ্বল্যমান বলেই কবির মন অন্ধকারের পাথারে দিশেহারা হয় না। জীবনের মাঝে যদি সেই একব্রহ্মার স্বরূপ রাখতে পারা যায় তবে 'অন্তরগ্লানি সংসারভার পলক ফেলিতে কোথা একাকার'। যদি সেই একমাত্র সত্য হয় তবে এই বহুধা-বিভক্ত বিশ্বের দ্বন্দ্ব-বিরোধ মিথ্যা, মায়া, অলীকমাত্র, এবং সেক্ষেত্রে সানন্দ চিত্তে উচ্চারণ করা যায়—'মন, জাগো মঙ্গললোকে অমল অমৃতময় নব আলোকে জ্যোতিবিভাসিত চোখে'।

'প্রভাত সংগীতে' যে ছন্দোবদ্ধ বিশ্ব-ঐক্যানুভূতি তিনি অর্জন করেছেন—'মহাছন্দে বন্দী হলো যুগ-যুগ যুগ-যুগান্তর'—তা শেষদিন পর্যন্ত অপরিবর্তিত-ভাবে কবিকে উদ্বুদ্ধ করেছে। দুঃখের রাতে নিখিলধরা যেদিন করে বঞ্চনা, সেই বঞ্চনার শূন্যতার দিনেও যেহেতু কবির প্রত্যয় সেই একব্রহ্মে, চৈতন্য-স্বরূপে অণুমাত্র শিথিল হয়নি সেইকারণে 'পরিশেষে'-ও একের চরণে বিচিত্রের নর্মবাঁশি রেখে প্রণাম জানাতে পেরেছেন। জীবনের পরিণামে ছন্দোবদ্ধ ব্রহ্মাণ্ডের সুরতাললয়ের মধ্যে যখন যুদ্ধে-যুদ্ধে রাষ্ট্রবিপ্লবে ছন্দ-ভাঙা অসংগতির কর্কশচিহ্ন বারবার চোখে পড়ছে তখনও 'সমস্ত এ ছন্দ-ভাঙা অসংগতি মাঝে সানাই লাগায় তার সারঙের তান' এবং 'কী নিবিড় ঐক্যমন্ত্র করিছে সে দান।'

তিন

যা-কিছু সমস্তই একই প্রাণে এজিত, অর্থাৎ কম্পিত, ধাবিত—কঠোপ-নিষদের এই উক্তি যদি সত্য হয় তবে সেই একই প্রাণ মানুষ পশুপাখী উদ্ভিদ্ তরুলতার মধ্যে সক্রিয় এবং মানবজগতে ও প্রকৃতিজগতে কোন মৌলিক পার্থক্য নেই। এবং সেই কারণেই—

নক্ষত্রবেদির তলে আমি
একা স্তব্ধ দাঁড়াইয়া, ঊর্ধ্বে চেয়ে কহি জোড় হাতে—

---

৮ নিবিড় ঘন আঁধারে জ্বলিছে ধ্রুবতারা—গীতবিতান, ১

হে পূষণ, সংহরণ করিয়াছ তব রশ্মিজাল,
এবার প্রকাশ করো তোমার কল্যাণতম রূপ,
দেখি তারে যে পুরুষ তোমার আমার মাঝে এক।

(অবসন্ন চেতনার গোধূলি-বেলায়, প্রান্তিক)

আকাশে ভাস্বর সূর্য এবং মানবচৈতন্য যদি একই পুরুষ, একই শক্তির দ্বারা অনুপ্রাণিত হয় তবে বস্তুবিশ্ব ও মানুষের মধ্যে কোন দ্বন্দ্ব বা সংঘাতই সম্ভব নয়। জড়বিশ্ব ও মানুষের মধ্যে যে স্বাতন্ত্র, পার্থক্য এবং বিরোধিতা আমাদের প্রত্যক্ষগোচর হয়, তা নিতান্তই অনুমান, নিতান্তই মায়া। শুধু তাই নয়, চৈতন্যের বাইরে বস্তুসত্তার কোন অস্তিত্বই নেই, দ্রষ্টার চৈতন্যেই দৃশ্যের উপস্থিতি, দ্রষ্টার চৈতন্যাতিরিক্ত দৃশ্যের নিজস্ব কোন সত্তা নেই। তাই 'যেদিন মানুষের যাবার দিনের চোখ বিশ্ব থেকে নিবিয়ে নেবে রঙ' সেদিন এই দৃশ্যমান পৃথিবীর সৌন্দর্য কিছুমাত্র অবশিষ্ট থাকবে না' তখন থাকবে শুধু 'ব্যক্তিত্বহারা অস্তিত্বের গণিততত্ত্ব', নির্বিকার abstraction।

মানবজগৎ ও প্রকৃতিজগতের এই ঐক্যবোধ শুধু প্রত্যয়ের দিক থেকে নয়, কাব্যসাহিত্যরচনার আদর্শের দিক থেকেও রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক স্বীকৃত। "ভাবে জানি আপনাকেই, বিষয়টা থাকে উপলক্ষ্যরূপে সেই আপনার সঙ্গে মিলিত।" (ভূমিকা—সাহিত্যের পথে)। অর্থাৎ সাহিত্যরচয়িতার চৈতন্যের ক্রমান্বয় আত্মপ্রসারই সাহিত্য, বিষয় বা বস্তু উপলক্ষ্যমাত্র। সেই কবিচৈতন্যের অংশরূপেই তাদের কাব্যে অস্তিত্ব, তাদের নিরপেক্ষ objective কোন সত্তা বা অস্তিত্ব নেই। এই কাব্যাদর্শে বিশ্বচরাচরের স্বাতন্ত্র্য স্বীকৃত না হওয়ায়, একমাত্র চৈতন্যের মৌলিকত্ব এই কাব্যাদর্শে স্বীকৃত হওয়ায় রোম্যান্টিক কাব্যভাবনার সংক্রাম রবীন্দ্রনাথে সক্রিয় হওয়া এতো সহজ হয়েছিল। অন্যত্রও রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "আমরা যাকে বলি সাহিত্য, বলি ললিতকলা, তার লক্ষ্য এই উপলব্ধির আনন্দ, বিষয়ের সঙ্গে বিষয়ী এক হয়ে যাওয়াতে যে আনন্দ। অনুভূতির গভীরতা দ্বারা বাহিরের সঙ্গে অন্তরের একাত্মবোধ যতোটা সত্য হয় সেই পরিমাণে জীবনের আনন্দের সীমানা বেড়ে চলতে থাকে অর্থাৎ নিজেরই সত্তার সীমানা।" (সাহিত্যতত্ত্ব, সাহিত্যের পথে)

প্রকৃতিজগতের জড়ত্ব, নির্মমত্ব, মানবজগতের সঙ্গে তার অভিসংঘাতের নিষ্ঠুর সত্য রবীন্দ্রকাব্যে দুইবার স্পষ্টত স্বীকৃত হয়েছে—একবার সিন্ধু তরঙ্গ,

কবিতায়, অন্যবার 'পৃথিবী' কবিতায়। 'সিন্ধুতরঙ্গে' সমুদ্রের ঢেউএর নিষ্ঠুর ক্ষুধায়, মহাশঙ্কা মহা-আশার বিষম সংশয়ে আন্দোলিত কবি আর্তস্বরে বলেছেন 'নাই সুর, নাই ছন্দ, অর্থহীন নিরানন্দ জড়ের নর্তন' এবং মমতামণ্ডিত মানবজগৎ ও এই নির্মম বস্তুজগতের মধ্যে দ্বন্দ্ব কবিকে ক্রমান্বয়ে প্রপীড়িত করেছে। 'পৃথিবী' কবিতাতেও এই দ্বন্দ্ব-সংঘাতের অভিজ্ঞতা অনবদ্যরূপ লাভ করেছে—'বিপরীত তুমি ললিতে কঠোরে' এবং এই বিচিত্র পৃথিবীর 'একদিকে আপকধান্যভারনম্র তোমার শস্যক্ষেত্র' আর 'অন্যদিকে তোমার জলহীন ফলহীন আতঙ্কপাণ্ডুর মরুক্ষেত্র' কিন্তু এই দ্বন্দ্বের পরিণাম এখন আর সংশয়ে নয়, এই দ্বন্দ্বের পরিণাম এখন স্বীকৃতিতে, আত্মসমর্পণে, মোহমুক্ত প্রণতিতে। অবশেষে সর্বদ্বিধা সর্বসংশয় অতিক্রম করে মৃত্যুর প্রাক্-লগ্নে পরিণামের পরম উচ্চারণে কবি আরো বহুদূর অগ্রসর হয়েছেন—'এ দ্যুলোক মধুময়, মধুময় পৃথিবীর ধূলি'।

'সিন্ধুতরঙ্গে' একবার প্রকৃতির জড়ত্ব ও মানবজগৎ থেকে তার স্বাতন্ত্র্যের স্বীকৃতির পর এই কাব্যধারায় প্রকৃতি ক্রমেই চৈতন্যময়ী হয়ে উঠেচে। 'সোনার তরী'র 'সমুদ্রের প্রতি' কবিতাতেই প্রকৃতি মানবজগতের মধ্যে এই একাত্মতা, বিরোধহীনতা ও সুনিবিড় আত্মীয়তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে—এখানে সমুদ্র আর জড়ের নর্তনে রত নয়, সে চরাচরের মাতা হিসাবে এখন স্নেহের ব্যাকুলতা ও গর্ভিনীর পূর্বরাগ অনুভব করে। এই জড়-জীবের মধ্যের একাত্মতার অনুভূতি 'ছিন্নপত্রে'র পত্রাবলীর মধ্যে নম্রতম অথচ গভীরতম উচ্চারণ অর্জন করেছে—"একসময় যখন আমি এই পৃথিবীর সঙ্গে এক হয়ে ছিলুম, যখন আমার উপর সবুজ ঘাস উঠত, শরতের আলো পড়ত, সূর্যকিরণে আমার সুদূরবিস্তৃত শ্যামল অঙ্গের প্রত্যেক রোমকূপ থেকে যৌবনের সুগন্ধি উত্তাপ উত্থিত হতে থাকত, আমি কত দূর-দূরান্তর কত দেশ-দেশান্তরের জল স্থল পর্বত ব্যাপ্ত করে উজ্জ্বল আকাশের নিচে নিস্তব্ধভাবে শুয়ে পড়ে থাকতুম—তখন শরৎ-সূর্যালোকে আমার বৃহৎ সর্বাঙ্গে যে একটি আনন্দরস, একটি জীবনীশক্তি, অত্যন্ত অব্যক্ত অর্ধচেতন এবং অত্যন্ত প্রকাণ্ডভাবে সঞ্চারিত হতে থাকত, তাই যেন খানিকটা মনে পড়ে।" (ছিন্নপত্র ৬৪)। সংসারের বেদনায় বিদ্ধ মানুষ যেমন মাতৃ-গর্ভের অন্ধকারে ফিরে যেতে চায়, তেমনি সমগ্রজীবন প্রকৃতিবন্দনার মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ যেন সেই প্রকৃতিমাতার গর্ভে ফিরে যেতে চেয়েছেন, যে

প্রকৃতি-মাতা 'শান্তি। শান্তি।' বলে আমাদের ঘুম পাড়িয়ে দেয়। ভারতীয় অন্বয়বাদের সঙ্গে আশৈশব পরিচিত হওয়ায় এই ব্যাপারে রবীন্দ্রকাব্য-প্রত্যয়ের উপর পাশ্চাত্যপ্রভাবের প্রশ্ন গৌণ কিন্তু তবুও ঊনবিংশ শতাব্দীতে পশ্চিমে যে রোম্যান্টিক অন্বয়বাদের আবির্ভাব হয়েছিল তার সঙ্গে এই ক্ষেত্রে রবীন্দ্রপ্রত্যয়ের ঘনিষ্ঠতা লক্ষ্য করা যায়। একটি উদাহরণ উল্লেখ করা যেতে পারে—'আধুনিক সাহিত্যে' সংগ্রথিত 'ডি প্রোফণ্ডিস' প্রবন্ধে টেনিসনের কয়েকটি পংক্তি রবীন্দ্রনাথ উদ্ধার করে ঐ কাব্যের আলোচনা করেছেন ১২৮৮ বঙ্গাব্দে, 'সমুদ্রের প্রতি' কবিতাটির রচনাকাল ১২৯৮ বঙ্গাব্দ। রবীন্দ্র-নাথ কর্তৃক উদ্ধৃত টেনিসনের পংক্তিগুলির ভাব ও ভাষার সঙ্গে 'সমুদ্রের প্রতি' কবিতার ভাব ও ভাষার সাদৃশ্য লক্ষ্য করলেই আমার বক্তব্য স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

এবং এই প্রকৃতি শুধু চেতন নয়, সে যেন কোন গূঢ় পরিণামকে, পরম অভিপ্রায়কে প্রতি মুহূর্তে সফল করে চলেছে—এই প্রকৃতি Purposive। রবীন্দ্রনাথের মতে প্রকৃতির সেই শুভ পরিণাম মানুষের মধ্যেই পরম চরিতার্থতা অর্জন করবে। 'বিশ্বপরিচয়ের' শেষে তাই তিনি বলেছেন "জড় থেকে জীবে একে একে পর্দা উঠে মানুষের মধ্যে এই মহাচৈতন্যের আবরণ ঘোচাবার সাধনা চলেছে। চৈতন্যের এই মুক্তির অভিব্যক্তিই বোধ করি সৃষ্টির শেষ পরিণাম।" অন্যত্র বলেছেন, "মানুষের আত্মা মুক্তিলোকে আনন্দলোকে জন্মগ্রহণ করবে বলে বিশ্বের সূতিকাগৃহে অনেকদিন ধরে চন্দ্রসূর্যতারার মঙ্গলপ্রদীপ জ্বালানো রয়েছে। যেমনি নবজাত মুক্ত আত্মার প্রাণচেষ্টার ক্রন্দনধ্বনি সমস্ত ক্রন্দসীকে পরিপূর্ণ করে উচ্ছ্বসিত হবে অমনি লোকে লোকান্তরে আনন্দশঙ্খ বেজে উঠবে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সেই প্রত্যাশাকে পূরণ করবার জন্যই মানুষ।" (সত্য হওয়া—শান্তিনিকেতন ২)। যখন আধুনিক কবি জন্মাবধি যুদ্ধে যুদ্ধে বিপ্লবে বিপ্লবে বিনষ্টির চক্রবৃদ্ধি দেখে মনুষ্যধর্মের স্তবে নিরুত্তর, অভিব্যক্তিবাদে অবিশ্বাসী, তখন এই কবি শুধু ব্যক্তিগত ব্যবহারিক প্রত্যয়ে নয়, কাব্যপ্রত্যয়েও প্রকৃতির সেই শুভ-পরিণামী ক্রমবিবর্তনে আস্থাবান—

> সাবিত্রী পৃথিবী এই, আত্মার এ মর্ত্য-নিকেতন,
> আপনার চতুর্দিকে আকাশে আলোকে সমীরণে

ভূমিতলে সমুদ্রপর্বতে

কী গূঢ় সংকল্প বহি করিতেছে সূর্য প্রদক্ষিণ। (জন্মদিনে)

আদি মহার্ণগর্ভ থেকে যে প্রকাণ্ড স্বপ্নের পিণ্ড অকস্মাৎ ফুলে ফুলে উঠেছে তাদের বিরূপ কদর্যতা নব সূর্যালোকে সুসংগত কলেবর পাবে। তখন বিধাতা মৃত্তিকার শিরে এসে মন্ত্র পড়ে বিধাতার অন্তর্গূঢ় সংকল্পের ধারা ধীরে ধীরে উদ্ঘাটিত করবেন।

রবীন্দ্রনাথ যে উত্তরাধিকারী হিসাবে পূর্বপুরুষানুক্রমে ভারতীয় জীবনাদর্শের উৎসমুখ থেকে সংস্কার হিসাবে রক্তরঙ্গের সঙ্গে প্রকৃতি ও মানবজগতের মধ্যে অদ্বৈততার এই প্রত্যয় লাভ করেছিলেন তাতে সন্দেহ নেই। যা উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত তারই সঙ্গে আশৈশব পরিচয় সেই মূলধনকে আরো বেশি পুষ্ট এবং সমৃদ্ধ করেছিল। "আমরা হয় জড়প্রকৃতির পশ্চাতে চৈতন্যের খেলা আবিষ্কার করিয়াছি, নতুবা প্রত্যেকটি জড়মূর্তির পশ্চাতেই অভিমানী দেবতার পরিকল্পনা করিয়াছি। গভীর দৃষ্টিতে দেখিলে, ইহাকে ভারতীয় অদ্বয়বাদেরই একটা বিশেষ প্রকাশ বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। এই অদ্বয়বাদ ভারতবর্ষে শুধু দার্শনিকরূপেই আত্মপ্রকাশ করে নাই, কবি অনুভূতির ভিতরেও ইহার একটি গভীর প্রকাশ রহিয়াছে। এই ইতিহাসের সূত্রপাত বৈদিক সাহিত্যে—প্রথম বিবর্তন 'আরণ্যক' এবং উপনিষদে,—তারপর তাহার রূপান্তর পাই রামায়ণে-মহাভারতে, কালিদাস-প্রমুখ মধ্যযুগের কবিগণের কাব্যের ভিতরে এই অদ্বয়বাদ দেখা দিয়াছে আলঙ্কারিক কারুকার্যে শ্রীমণ্ডিতরূপে—সেই ধারাই চলিয়া আসিয়াছে ঊনবিংশ এবং বিংশশতাব্দীর রবীন্দ্রনাথের ভিতরেও।"৯

শকুন্তলা নাটকের প্রারম্ভে বলা হয়েছে, আদি সৃষ্টি জল, বিধিহুত হবিকে বহনকারী অগ্নি, হোতা যজমান, দিবারাত্রিরূপ কালের জনক চন্দ্রসূর্য, শ্রুতির বিষয় বিশ্বব্যাপী আকাশ, সর্ববীজপ্রকৃতি ক্ষিতি, প্রাণিগণের প্রাণদানকারী বায়ু—এরা সকলেই সেই একই চৈতন্যময় পুরুষের প্রত্যঙ্গ প্রপঞ্চ তনু। তপোবনে ভারতীয় সভ্যতার জন্ম। শুধু বৈদিক ঋষিগণ নন, বুদ্ধও তপোবনচারী আম্রবনে-বেণুবনে তাঁর উপদেশবাণী উচ্চারিত। পবিত্র তপোবনে জাত

৯ শশিভূষণ দাশগুপ্ত, ত্রয়ী

বলেই দিলীপ-সুদক্ষিণার পুত্র রঘুর অনন্যসাধারণ মহত্ত্ব। শকুন্তলা নাটকে শান্তরসাস্পদ তপোবনের পাশে বিলাস-ঐশ্বর্যপূর্ণ রাজগৃহ ধিকৃকৃত। এই তাপসকন্যার বিদায়কালে দেখেছি যেমন আশ্রমমৃগ, তেমনি শকুন্তলা দ্বৌ অপি অত্র আরণ্যকৌ। পঞ্চবটীবনে রাম ও সীতা যে অপূর্ব সুখ ও আনন্দ লাভ করেছেন ঐশ্বর্য-পরিজন-বেষ্টিত অযোধ্যার রাজগৃহে তাঁরা তা কোনদিন আস্বাদ করেননি। হলক্ষতমুখে শস্যক্ষেত্রে সীতার জন্ম, বিরহিনী ক্রৌঞ্চীর ক্রন্দন রামায়ণের প্রেরণা। অপহৃতা দুঃখভারাবনতা সীতার ক্রন্দনে সমগ্র বনপ্রকৃতি সমবেদনার ক্রন্দন করেছিল এবং প্রত্যাবৃত্ত রাম মুহ্যমান লতাগুল্ম পশুপাখীর কাছে সীতার সন্ধান করেছিলেন। উত্তররামচরিতে দেখি রাম ও সীতার প্রেম যেন জলস্থল-আকাশের মধ্যে প্রতিবিম্বিত হয়েছে। গোদাবরীর গিরিতটসম্পর্কে রাম বলেছেন—যত্র দ্রুমা অপি মৃগা অপি বন্ধবো মে। মেঘদূতের বিরহী যক্ষ কাম-কাতরতায় সমস্ত প্রকৃতির মধ্যে নারীদেহের লাবণ্য কান্তি ও রেখাবিভঙ্গকে পরিব্যাপ্ত দেখেছে। শকুন্তলার পতিগৃহে যাত্রাকালের মত বিক্রমোর্বশী নাটকের চতুর্থ অঙ্কে বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে মানুষের অন্তরঙ্গ যোগের পরিচয় পাই। আরক্ত নবকন্দলী কুসুমগুলি কোপহেতু অন্তর্বাষ্প আরক্তিম প্রিয়ানয়ন দুটির কথা পুরূরবাকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে। উর্বশী-বিরহে বিষণ্ন রাজা পুরূরবার বারংবার মনে হলো—অসহিষ্ণু উর্বশী হয়তো নদীতে পরিণত হয়েছে, তরঙ্গ যেন তার ভ্রূকুটিভঙ্গ, ক্ষুভিত বিহগশ্রেণী তার মেখলা, ফেনপুঞ্জ তার রোষবিস্রস্ত বসন, অথবা মনে হলো অভিমানিনী প্রিয়া বোধহয় পার্বত্য বনলতায় পরিণত হয়েছে। ভারতবর্ষের চিরাগত বিশ্বাসের বিষয় এই অদ্বয়বাদের বৈজ্ঞানিক সমর্থনের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে বলেই বন্ধু জগদীশচন্দ্রের উদ্ভিদের প্রাণবিষয়ক গবেষণায় রবীন্দ্রনাথ অতোখানি উত্তেজনা বোধ করেছিলেন।

চার

এই একই অদ্বয়বাদী প্রত্যয়ের জন্য রবীন্দ্রনাথের কাব্যে পাপ ও পুণ্যের মধ্যে, মঙ্গল-অমঙ্গলের মধ্যে বিরোধ-সংঘর্ষ অস্বীকৃত। পাপ ও অমঙ্গলের কোন স্বতন্ত্র সমমর্যাদাময় অস্তিত্ব নেই, তাদের ক্ষণস্থায়ী আপতিক অস্তিত্ব শুধু পুণ্য এবং মঙ্গলের সেবায় নিযুক্ত। প্ররোচনাকারিণী ডাইনিরা যে বাইরে নেই, তারা যে ম্যাকবেথের অভ্যন্তরেই বর্তমান, মেফিস্টোফেলেস যে প্রলোভন

দেখিয়েছে সেই লোভের বীজ যে ফাউস্টের হৃদয়ক্ষেত্রে অঙ্কুরিত, মরুভূমি যে শুধু অগ্নিক্ষরা সুদূর ট্রপিকে নেই, সে যে আমার প্রেতিবেশীর এবং আমার নিজের হৃদয়ের গোপন প্রান্তরে বর্তমান—অস্তিত্বের এই জটিল পরিস্থিতি এই মঙ্গলবাদী শুভবাদী প্রত্যয়দ্বারা অস্বীকৃত। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের আপতিক মঙ্গলামঙ্গলে সংঘাতের ঊর্ধ্বে এই প্রত্যয় ধর্মবোধকে ধ্রুব বলে স্বীকার করেছে এবং এই ধর্মের অর্থই সামঞ্জস্য। এবং এই ধর্মবোধের উদ্দেশ্যে, পাপ বা অমঙ্গল কখনও অনাহূত অতিথির মত এসে উপস্থিত হলে তাকে ভিতর থেকে বিলুপ্ত করে সেই সামঞ্জস্যকে রক্ষা করা। "শকুন্তলায় আমরা অপরাধের সার্থকতা দেখিতে পাই সংসারে বিধাতার বিধানে পাপও যে কী মঙ্গলকর্মে নিযুক্ত আছে, কালিদাসের নাটকে আমরা তাহার সুপরিণত দৃষ্টান্ত দেখিতে পাই।" (শকুন্তলা, প্রাচীন সাহিত্য)। অর্থাৎ পুণ্য ও মঙ্গলকে উজ্জ্বলতর করার কাজে পরিচারকরূপে নিযুক্ত বলেই এই বিশ্ববিধানে পাপের যা কিছু সার্থকতা।

তাই যে 'দুঃসময়' কবিতায় মহা-আকাঙ্ক্ষা বিরাজমান, যেখানে অজাগর-গরজে সাগর স্ফীত এবং বিশ্বজগৎ যেখানে নিঃশ্বাসবায়ু সম্বরি স্তব্ধ আসনে প্রহর গণনায় রত সেখানেও পরিণামে অকূল তিমির সন্তরি দূরদিগন্তে বাঁকা ক্ষীণ শশাঙ্ক দেখা দিয়েছে।

কল্পান্ত যখন তার সকল প্রদীপ নিবিয়ে
সৃষ্টির রঙ্গমঞ্চ দেবে অন্ধকার করে—

তখন এই শুভবাদী প্রত্যয়ে বিশ্বাস টলে উঠবে না, বরং অটল ধৈর্যে

তখনো সে থাকবে প্রলয়ের নেপথ্যে
কল্পান্তরের প্রতীক্ষায়। (শেষসপ্তক ২১)

কবি অন্যত্রও বলেছেন—

পরুষ কলুষ ঝঞ্ঝায় শুনি তবু
চিরদিবসের শান্ত শিবের বাণী। (পত্রোত্তরে, সেঁজুতি)

'তপোবন' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ যে প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন "যে পাপদৈত্য কোথা থেকে প্রবল হয়ে উঠে হঠাৎ স্বর্গলোককে ছারখার করে দেয়, তাকে পরাভূত করবার মত বীরত্ব কোন উপায়ে জন্মগ্রহণ করে"—তার উত্তর রবীন্দ্রনাথ নিজেই দিয়েছেন ভারতীয় সাহিত্য ও দর্শনের দীর্ঘকাল প্রসারিত ঐতিহ্য

থেকে। মঙ্গলই এই পাপদৈত্যেব হাত থেকে বক্ষা কবে, সামঞ্জস্যই বক্ষা কবে। ত্যাগী শিব যখন একাকী সমাধিমগ্ন তখনো স্বর্গবাজ্য অসহায, আবাব পার্বতী যখন তাঁব পিতৃভবনেব ঐশ্বর্যে একাকিনী বন্দিনী তখনও দৈত্যেব উপদ্রব প্রবল। পবিপূর্ণতাব প্রতি ভাবতবর্ষেব যে প্রাণেব আকাঙ্ক্ষা আছে তাবই প্রেবণায ববীন্দ্রনাথ বলেছেন কবি হিসাবে তিনি শৈব। এই ব্রহ্মবাদী কবি সমগ্র ভাবতীয দেবমণ্ডলীব মধ্যে শিবকেই পবম দেবতারূপে নির্বাচিত কবেছেন, কাব্যে পুনঃ পুনঃ তাকে বন্দনা কবেছেন, কাবণ সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলযেব মধ্যে সক্রিয সামঞ্জস্য ও মঙ্গলেব শক্তি তাবই মধ্যে মূর্ত হযে উঠেছে।

এবং এই প্রত্যযেব জন্ম ভাববাদী বিশ্বাসেব উৎসমুখ থেকে। "শকুন্তলাব জীবনে 'যেমন হযে থাকে' তপস্যাব দ্বাবা অবশেষে 'যেমন-হওযা-ভালোব' মধ্যে এসে আপনাকে সফল কবে তুলেছে।" (তপোবন, শান্তিনিকেতন ১)। এই আদর্শবাদ, ঔচিত্যবোধ, 'যেমন-হওযা-ভালো' তাই বাস্তবজগৎকে অতিক্রম কবে আদর্শলোকে উত্তীর্ণ হতে আমাদেব সাহায্য কবে। প্রত্যাখ্যাত বমণীব পুনর্মিলনেব আশা বাস্তবজীবনে হযতো সুদূব পবাহত, সর্বগুণান্বিত পবিবাব হযতো বাস্তবজগতে মেলা দুঃসাধ্য, কিন্তু যে আদর্শলোকে শকুন্তলা ও পার্বতী বিবাজমানা, অযোধ্যাব বাজ-পবিবাব বিবাজমান, সেখানে সামঞ্জস্য ও ঔচিত্যবোধেব প্রযোজনে আমবা তাদেব সাক্ষাৎ পাই। যা নির্বিকাব বাস্তব ববীন্দ্রনাথ তাকে তাই তথ্যেব মর্যাদামাত্র দিযেছেন, সত্যেব মর্যাদা দেননি, যে-বস্তু আদর্শবাদেব দ্বাবা সংক্রামিত একমাত্র তাই এই কবিপ্রত্যযে সত্যেব সম্মানপ্রাপ্ত। এবং এই আদর্শবাদী বাস্তব বিবোধিতাব অতিবিক্ত প্রতিপত্তিব ফলেই ভাবতীয সাহিত্যে এবং তাবই উত্তবসূবী ববীন্দ্রনাথেব বচনায় sense of tragedy অনুপস্থিত। অথচ সমগ্র ইউবোপীয সাহিত্যে প্রাচীন গ্রীক কাব্য থেকে আধুনিককাল পর্যন্ত এই sense of tragedy-ই সাহিত্যবচনাব প্রধান প্রেবণা। দুটি সমকক্ষ শক্তির সংঘর্ষের মধ্য দিযে, কখনো কখনো পাপ ও অমঙ্গলেব কাছে শুভ ও মঙ্গলেব পবাজয়েব মধ্য দিযে এই কালান্তক্ গম্ভীব অনুভূতি প্রকাশ পায। sense of tragedy তখনই সম্ভব যখন দ্বৈততা স্বীকৃত হয, বিপবীত দুই শক্তিবই মৌলিকত্ব মর্যাদা পায় এবং পাপ যখন পুণ্যেব নিতান্ত আজ্ঞাবহ ভৃত্যে পরিণত হয় না। শযতান যখন ঈশ্ববেব সমকক্ষ তখনই ট্র্যাজেডীব জন্ম। কিন্তু ভারতীয দর্শনে দ্বৈতবাদ

স্বীকৃতি পায় নি, জীবনাদর্শে পাপের স্বতন্ত্র মর্যাদা নেই, দেবমণ্ডলী-পরিকল্পনায় শয়তানের কোন প্রতিভূর সাক্ষাৎ আমরা পাই না—এই সাহিত্যে তাই ট্র্যাজেডীও নেই। "The Indian culture as a rule does not believe that the world is disorderly and accidents and chance occurrences may frustrate good life and good intentions, or that the storms and stress of material events are purposeless and not inter-related with the moral life of man. On the other hand, the dominant philosophical belief is that the whole material world is integrally connected with the destiny of man and its final purpose is the fulfilment of the moral development of man. When we read the dramas of Shakespeare and witness the sufferings of Lear and of Desdemona or of Hamlet we feel a different philosophy. We are led to think that the world is an effect of chaotic distribution and re distribution of energy that accidents and chance occurrences are the final determinants of events and the principle of the moral government of the world is only a pious fiction."[১০] যে সভ্যতা 'যা কিছু হারায় সবই জেগে রয় তব মহামহিমায়' এই বিশ্বাসে সটলভাবে আত্মস্থ থাকতে পারে সেই সভ্যতার পরিমণ্ডলে লালিত মানুষের পক্ষে ট্র্যাজেডীর ভাবাক্রান্ত অনুভূতি উপলব্ধি করা সম্ভব নয়।

যে নীতিচিন্তাহীন সুন্দরের সাধনা কবিসম্প্রদায় করে গেছেন এই সর্বগ্রাসী শুভবাদের প্রাবল্যের ফলে সেই বিশুদ্ধ সুন্দরের প্রবেশাধিকারও এই কাব্যে বিরল। "আমাদের পুরাণে লক্ষ্মী কেবল সৌন্দর্য এবং ঐশ্বর্যের দেবী নহেন, তিনি মঙ্গলের দেবী। সৌন্দর্যমূর্তিই মঙ্গলের পূর্ণমূর্তি, এবং মঙ্গলমূর্তিই সৌন্দর্যের পূর্ণস্বরূপ।" (সৌন্দর্যবোধ, সাহিত্য)। কুসুমের কারাগারে রুদ্ধ এ বাতাসে যে ক্লান্তি রবীন্দ্রনাথ 'কড়ি ও কোমলেই' অনুভব করেছিলেন সেই অনুভূতি তিনি যে পুরুষানুগত উত্তরাধিকারসূত্রে অর্জন করেছিলেন তা তাঁর প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের আলোচনাসম্বলিত প্রবন্ধাবলী পাঠ করলেই বোঝা যাবে। সেই উত্তরাধিকারই ভোগক্লান্ত নায়কের উদ্দেশে চিত্রাঙ্গদার মুখ থেকে প্রশ্ন করিয়েছে, 'নারীর ললিত লোভন লীলায় এখনি কেন এ ক্লান্তি।'

---

১০ সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, Introduction, A History of Sanskrit Literature, Vol I.

যে ভালোবাসা একদিন এসেছিল তরুণবয়সে নির্ঝবেব প্রলাপকল্লোলে সেই ভালোবাসা অভিশপ্ত হয়েছিল, অচিবেই হয়ে উঠেছিল ক্লান্ত এবং গুরুভাব কেননা তাব মধ্যে কল্যাণ ছিলো না, কিন্তু কল্যাণবুদ্ধিসম্পন্ন আজকেব ভালোবাসা চবিতার্থ কেননা সে চাবিদিকেব নিখিলেব বৃহৎ শান্তিব সঙ্গে একাত্ম হয়ে যেতে পেবেছে।

মুণিগণ ধ্যান ভেঙে যাব পদপ্রান্তে তপস্যাব ফল অর্পণ কবে, যাব স্তনহাব হতে নভস্তলে তাবা নৃত্যেব উন্মাদনায় খসে খসে পড়ে সেই নীতিচিন্তাহীনা বিশুদ্ধ সৌন্দর্যেব প্রতিমূর্তি উর্বশীকে ববীন্দ্রনাথ একবাব বন্দনা কবেছিলেন। কিন্তু সেই একবাবমাত্র, পববর্তীকালে সেই বন্দনাব অপবাধ যেন তিনি স্খালন কবেছেন 'উর্বশী' যে 'চিত্রা'ব অন্তর্গত সেই কাব্যেবই অন্তর্ভুক্ত 'স্বর্গ হইতে বিদায়' 'বিজয়িনী' ও 'বাত্রে ও প্রভাতে' কবিতাব মধ্য দিয়ে—সংসাবেব সমদ্র শিযবে পূর্ণিমাব ইন্দুব মত সীমন্তসীমায় মঙ্গলসিন্দুববিন্দু-ধাবিণী গৃহলক্ষ্মীকে তিনি বন্দনা কবেছেন, অভিভূত পুষ্পধন্বা কল্যাণময়ীব পদপ্রান্তে পুষ্পশবভাব পূজা-উপচাব হিসাবে অর্পণ কবেছে। 'দুই নাবী' কবিতায় স্পষ্টতই উর্বশী ধিকৃকৃত, কল্যাণী গৃহলক্ষ্মীব উদ্দেশেই কবি তাঁব সর্বশেষেব গানটি উচ্চাবণ কবেছেন। 'মহুয়া'ব 'লগ্ন' কবিতায় নিবিড় আষাঢ় এবং প্রজাপতিসসংস্পূর্ণ বসন্তকে মিলনেব লগ্নরূপে নির্বাচিত না কবে শেষ পর্যন্ত আশ্বিনে উপযুক্ত শুভক্ষণ মনোনীত কবেছেন, যখন—

> বনলক্ষ্মী শুভব্রতা
> শুভ্রেব সেখানে তাব মেলিয়াছে অম্লান শুভ্রতা
> আকাশে আকাশে
> শেফালী মালতী কুন্দে কাশে।

এই বর্ণনাব সঙ্গে দীর্ঘ তপস্যাস পর প্রিয়মিলনেব উপযোগী শুভ্রবসন-পবিহিতা শুভ্রশিবেব ধ্যানবতা সদ্যঃস্নাতা কুমাবসম্ভবেব পার্বতীব বর্ণনাব আশ্চর্য সাদৃশ্য আছে—

> সা মঙ্গলস্নানবিশুদ্ধগাত্রী গৃহীতপত্যুদ্গমনীয়বস্ত্রা।
> নির্বৃত্তপর্জন্যজলভিষেকা প্রফুল্লকাশা বসুধেব বেজে॥—

এবং এই সাদৃশ্যেব মধ্য দিয়েই সুন্দবেব প্রধান উপকবণ যে শুভ্র শুভতা তাবই উত্তবাধিকাবগত স্বীকৃতিব প্রমাণ পাই।

ব্যক্তিগত জীবনের বহু দুর্যোগ সেই সর্বত্রব্যাপী শুভবাদে রবীন্দ্রনাথের অবিনাশী বিশ্বাস অণুমাত্র শিথিল করতে পারেনি, পরবর্তী জীবনে সভ্যতার সমূহ সংকটও ভাঙন ধরাতে পারেনি সেই বজ্রকঠিন মন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তরে। স্পেন-আবিসিনিয়ার ধর্ষণের দিনে, কঙ্কালে-পরিকীর্ণ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইউরোপের প্রান্তরে এই প্রত্যয় পুনঃ পুনঃ আহত এবং রক্তাক্ত হলেও শেষ পর্যন্ত আত্মবিস্মৃত হয়নি। ক্ষুধাতুর আর ভূরিভোজীদের নিদারুণ সংঘাতই জীবনের পরম পরিণাম নয়, সেই মহাপরিণামের রূপ, তাঁর মতে, স্বতন্ত্র—

সেই বিনাশের প্রচণ্ড মহাবেগে
একদিন শেষে বিপুল বীর্য শান্তি উঠিবে জেগে।

(প্রায়শ্চিত্ত, নবজাতক)

যুদ্ধের ভয়াবহ বীভৎসতায় যখন বন্যা নামে যমলোক হতে, যখন আদিম বন্যতা তার উদ্দাম নখর উদ্ঘাটিত করে পুরাতন ঐতিহ্যের পাতাগুলি ছিন্ন করে, তখনও কবি বিশ্বাস করেন এই কুৎসিত লীলার অবসান হবে, চিতাভস্ম-শয্যাতলে নবসৃষ্টির ধ্যান আরম্ভ হবে এবং 'আজি সেই সৃষ্টির আহ্বান ঘোষিছে কামান'। যখন স্পেন এবং চীন অন্তর্বিপ্লবে বিক্ষত হচ্ছে, কৃষ্ণাঙ্গী আবিসিনিয়া হচ্ছে ধর্ষিতা, যখন 'ফিনল্যাণ্ড চূর্ণ হলো সোভিয়েট বোমার বর্ষণে' তখনও এই দুর্যোগই যে শাশ্বত সত্য হবে এই কথা শুভ-প্রত্যয়ী কবি বিশ্বাস করতে পারেন নি, বিশ্বাস করতে পারেন নি যে মুখোশের নির্লজ্জ নকল শেষ পর্যন্ত মুখশ্রীর প্রতিবাদ করবে। এবং দৃঢ়বলে বিশ্বাস করেছেন দুর্যোগে দুঃখে পাপই শুধু ক্ষয় পেয়ে যায় যাতে সে পুনরায় নূতন সৃষ্টির বক্ষে কণ্টকিত হয়ে উঠতে না পারে। বলেছেন, "মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ, সেই বিশ্বাস শেষ পর্যন্ত রক্ষা করবো। মনুষ্যত্বের অন্তহীন প্রতিকারহীন পরাভবকে চরম বলে বিশ্বাস করাকে আমি অপরাধ মনে করি।" (সভ্যতার সংকট)। উৎক্ষিপ্ত পরমাণুভস্মের ছত্রছায়ায় বাস করলে তাঁর এই বিশ্বাস প্রলয়ঝড়ে ছিন্নভিন্ন হয়ে যেতো কিনা, এ প্রশ্নের উত্তর কারোই জানা নেই। হয়তো মানুষের মধ্যে প্রাগৈতিহাসিক পশুর বিকট পুনরুত্থান দেখে, আজীবন মিথ্যা ধ্রুবতারকার ধ্যান করেছেন বলে, তিনি বেদনায়-লজ্জায় মুখ ঢাকতেন অথবা হয়তো তিনি মঙ্গলদৃষ্টিকে আরো সুদূর ভবিষ্যতে প্রসারিত করে দিতেন অটল বিশ্বাসে সুষমা ও সামঞ্জস্যের অনুসন্ধিৎসায়।

পাঁচ

এই আদর্শবাদী প্রত্যয়ের মধ্যে ঈশ্বর, চৈতন্য ও মঙ্গল মৌলিকতা ও চরমতার স্বীকৃতি পেয়েছে, কিন্তু যেহেতু এই প্রত্যয় অদ্বয়বাদী, সেইকারণে শয়তান, বস্তুব্রহ্মাণ্ড ও পাপ এই সুষমামুখর ঐকতানপূর্ণ পরিমণ্ডল থেকে বহিষ্কৃত। একই কারণে এই প্রত্যয়ের মন্দিরে জীবন বর্তমান, মৃত্যু নেই। যদি কখনো মৃত্যু থাকে, তবে সে জীবনের সেবক, তবে সে মালিন্যলিপ্ত জীবনকে শুচিতাদানের উপায়মাত্র।

আমি মৃত্যুরাখাল
সৃষ্টিকে চরিয়ে চরিয়ে নিয়ে চলেছি
যুগ হতে যুগান্তরে
নব নব চারণক্ষেত্রে। (পুনশ্চ ৩৯)

এ মৃত্যু প্রকৃতপ্রস্তাবে জীবনেরই নামান্তর, জীবনেরই প্রতিকল্প—সে এই অনন্ত অচঞ্চল বর্তমানের হাত থেকে সৃষ্টিকে পরিত্রাণ করতে এসেছে অন্তহীন নব নব অনাগতে। কেননা বৃহদারণ্যকের যে আত্মা অজর অমর অমৃত অভয় এবং ব্রহ্ম—সেই অব্যয় এবং অবিকারকে স্বীকার করে নিলে 'আছে দুঃখ, আছে মৃত্যু, বিরহদহন লাগে, তবুও শান্তি, তবু আনন্দ, তবু অনন্ত জাগে' —অর্থাৎ এই দুঃখ মৃত্যু বিরহদহনের যন্ত্রণা আপতিকমাত্র হয়ে যায়, তাদের মধ্যে সত্যের পরমার্থ দ্যুতি বিকিরণ করে না। করে না বলেই আরো এক পদক্ষেপ করে পরমপ্রত্যয়ে উচ্চারণ করা 'তোমার অসীমে প্রাণমন লয়ে যত দূরে আমি ধাই—কোথাও দুঃখ, কোথাও মৃত্যু, কোথা বিচ্ছেদ নাই।'

'সঞ্চয়িতা'র প্রথম কবিতায় 'মরণ রে, তুঁহু মম শ্যাম সমান', আর তিরোভাবের অব্যবহিত-পূর্ব কবিতায় মরণ 'দুঃখের পরিহাসেভরা' 'ছলনাময়ী' —এবং কালগত এই দীর্ঘ ব্যবধানের মধ্যে মৃত্যুর অসংখ্য নব নব আবির্ভাবে আমরা রূপগত পরিবর্তন লক্ষ্য করি, কিন্তু গুণগত পরিবর্তন দেখি না। 'যদি মরণ লভিতে চাও, এসো তবে ঝাঁপ দাও সলিল মাঝে' এবং এই মরণ দীঘির অতল কালো রহস্যময় জলের মত 'স্নিগ্ধ শান্ত সুগভীর'।

মৃত্যুভয়
কী লাগিয়া হে অমৃত। দুদিনের প্রাণ
লুপ্ত হলে তখনি কি ফুরাইবে দান—

এত প্রাণদৈন্য প্রভু, ভাণ্ডারেতে তব ?
সেই অবিশ্বাসে প্রান আঁকড়িয়া রব ? (নৈবেদ্য ৫৩)

এই অবিশ্বাসী সন্দেহকে কবি সুগভীর প্রত্যয়ে দূরীকৃত করে দিয়েছেন, বরং বিশ্বাস করেছেন 'জ্যোতির্হীন সীমা মৃত্যুর অগ্নিতে জ্বলি যায় গলি, গড়ে তোলে অসীমে অলঙ্কার'। পশুকঙ্কালপরিকীর্ণ প্রান্তরে শ্বেত অস্থি মুহুর্মুহুঃ প্রাণচেষ্টাকে ব্যঙ্গ করে যখন বলে 'একদা পশুর যেথা শেষ সেথায় তোমারও অন্ত ভেদ নাই লেশ' তখন দুঃখের বক্ষের মাঝে কবি যেহেতু আনন্দের সন্ধান পেয়েছেন, যেহেতু শূন্যময় আঁধার প্রান্তরে জ্যোতির পথ অবলোকন করেছেন তাই তিনি দৃপ্ত কণ্ঠে বলেন, 'মৃত্যু, করিনা বিশ্বাস তব শূন্যতার উপহাস'। যে-চৈতন্য সর্বত্র এজিত, কম্পিত বলে বস্তুবিশ্ব ও মানবজগতে ভেদ নেই, সেই বিশুদ্ধ চৈতন্যই যেহেতু ব্রহ্মা, এবং ব্রহ্মা যেহেতু অজর, অমর এবং অমৃত, সেই কারণে চৈতন্যের অবলোপ নেই, কোন মৃত্যুর তাণ্ডবের গ্রাস তাকে নাস্তির অন্ধকারে নিয়ে যেতে পারে না—

রাহুর মতন মৃত্যু
শুধু ফেলে ছায়া
পারে না করিতে গ্রাস জীবনের স্বর্গীয় অমৃত। (শেষলেখা ২)

জীবন অমৃতেরই মত অবিকার, স্থায়ী এবং স্থায়িত্বদানের ক্ষমতাও তার মধ্যে বর্তমান। আর মৃত্যু রাহুর গ্রাসের মত আপাতত যতই বীভৎস হোক, পরিণামে তা সাময়িক ক্ষণস্থায়ী অমৃতপাত্র চন্দ্রের তা কোন শাশ্বত ক্ষতি করতে পারে না। মৃত্যু ছায়ার মত, তার কোন স্বতন্ত্র শরীর নেই, স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই। কিন্তু জীবনধারণের দেহধারণের সঙ্গে সঙ্গে এই অশরীরী অনিবার্য ছায়াকে আমাকে যে সঙ্গী করে ফিরতে হয়, এই অবশ্যম্ভাবী ছায়ার কলুষিত সংসর্গ থেকে আমাদের যে মুক্তি নেই, তার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই বটে, কিন্তু সে যে আমাদের অলোকিত অস্তিত্বের সঙ্গে একাত্ম এবং অনুস্যূত—মৃত্যুর এই জটিল অস্তিত্ববাদী স্বীকৃতি রবীন্দ্রকাব্যে নেই। প্রকৃতপ্রস্তাবে, মৃত্যুর জটিল অস্তিত্বের, রক্তগোলাপের বুকে পরিহাসনিপুণ কীটাণুর উপস্থিতি, জীবনের প্রতিটি তন্ত্রীতে, ধমনীর প্রতিটি রক্ততরঙ্গে মৃত্যুর বিলয়কারী ভীতিপ্রদ অবস্থানের এই ধারণা আমরা সাম্প্রতিককালে পশ্চিমী সাহিত্য ও দর্শনের প্রেরণায় উপলব্ধি করেছি। পাপ ও মৃত্যুর বোধ আমাদের প্রত্যক্ষ

পূর্বপুরুষের উত্তরাধিকার নয়, সুদূর অর্ধ-পরিচিত ইউরোপীয় আত্মীয়ের হাত থেকে সেই উত্তরাধিকার আমরা অর্জন করেছি।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যেহেতু প্রত্যক্ষ উত্তরপুরুষ সেই কারণে তাঁর রচনায় মৃত্যুর সূচিভেদ্য অন্ধকারের এই গুরুতর ভার নেই। বরং এই কাব্যে মৃত্যু খৃষ্টান মিষ্টিকদের মত, সূফীদের মত, স্বদেশী বৈষ্ণবদের মত প্রিয়মিলনের রূপকের মধ্য দিয়ে রমণীয় এবং আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। এই কাব্যে মরণ বৈষ্ণবদের শ্যামের সমান, মহাশান্তি আনয়ন করে যে মৃত্যু তার কান্তি শ্যামল। এই কাব্যে জীবনের বঙ্কিম অধরকে মৃত্যু নিবিড় চুম্বনদানে পাণ্ডু করে দেয়। প্রাণের সঙ্গে যে ঝুলনে কবি রত হবেন, সে ঝুলন 'মরণ খেলা' মাত্র এবং মৃত্যু বধূর মত আনন্দিত কবির পাশে পুষ্পশোভিত ঝুলনায় আসন করে নেয়। খৃষ্টান মিষ্টিকের বাসর কক্ষের মত মৃত্যুর দ্বিধাবিজড়িত কক্ষের অভ্যন্তর বিবাহের রঙে রাঙা এবং মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি যেন সেই বাসরকক্ষে প্রবেশের প্রস্তুতির মতই সংশয়ে ও আনন্দে আন্দোলিত—'বেলাশেষে মোরে কে সাজাবে ওরে নবমিলনের সাজে'।

ছয়

এই দীর্ঘ অশীতিবৎসরকালের যে একনিষ্ঠ অদ্বয়বাদী প্রত্যয় এই বিপুল কাব্যধারাকে অনুপ্রাণিত ও পুষ্ট করেছে সেই প্রত্যয়ে পাঠকের বুদ্ধিগ্রাহ্য বিশ্বাস সম্ভব কিনা, যদি বুদ্ধিগ্রাহ্য বিশ্বাস সম্ভব না হয় তবে অন্তত আবেগময় বিশ্বাস সম্ভব কিনা? এই প্রত্যয় কি একটি অনড় গোঁড়া দার্শনিক মতবাদ, অথবা এই প্রত্যয়ের মধ্যে কি জীবনের বৈচিত্র্য ও বহুমুখীনতাকে স্বীকৃতি দেবার মত উদার প্রজ্ঞাদৃষ্টি বর্তমান? এই প্রত্যয়ের উপস্থিতি রবীন্দ্রকাব্যপাঠে বাধা কিনা? এই প্রত্যয় কি শুধু ভারতীয় প্রথাসিদ্ধ জীবনাদর্শের অন্ধ অনুকৃতি অথবা কবির স্বীয় অভিজ্ঞতার উৎসমুখ থেকে তার উৎপত্তি?—রবীন্দ্রনাথের কাব্যের সঙ্গে তাঁর প্রত্যয়ের সম্পর্ক আলোচনায় এইগুলিই সবচেয়ে মৌলিক প্রশ্ন। কাব্যের প্রত্যয় যেহেতু কবির ব্যক্তিগত ব্যবহারিক জীবনের প্রত্যয়ের সমার্থক নয়, কাব্যের অনিবার্য অঙ্গ, সেইকারণে কাব্যপ্রত্যয়ে যদি পাঠকের আবেগময় বিশ্বাস না জন্মায় তবে কবির কাব্যচেষ্টা অসার্থক হতে বাধ্য। অবশ্য একথার অর্থ পাঠকের নিজস্ব প্রস্তুতি ও শিক্ষার মূল্যকে

অস্বীকার করা নয়। কাব্যপ্রত্যয় কাব্যের অনিবার্য অঙ্গ বলেই এই সমস্ত মৌলিক প্রশ্নের সুনিশ্চিত মীমাংসার প্রয়োজন এতো জরুরি।

বহু দেশ ভ্রমণ করা সত্ত্বেও, বহু দেশের বিচিত্রবর্ণ প্রকৃতির সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় সত্ত্বেও, যে রবীন্দ্রনাথকে আমরা বিশ্বকবি আখ্যায় ভূষিত করেছি তিনি পারস্য বা আর্জেন্টিনা বা জাপান যেখানেই থাকুন, সতত তিনি বন্দনা করেছেন বাংলাদেশের গ্রীষ্মবর্ষাশরতের ঋতুচক্রে আন্দোলিত বহু পরিচিত প্রকৃতিকে। তেমনি ভিক্টোরীয় পৃথিবীর থেকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পৃথিবী পর্যন্ত দীর্ঘ কালপ্রবাহে বাস করা সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত তিনি ভারতীয় কবি থেকে গিয়েছেন, এক কেন্দ্রের সুনির্দিষ্ট পরিধিকে স্বেচ্ছায় তিনি কখনো অতিক্রম করেন নি। তাই আধুনিককালে আধুনিক কাব্যপাঠক যখন ইউরোপীয় কাব্যের মানদণ্ডে রবীন্দ্রনাথের কাব্যপ্রত্যয়কে বিচার করতে যান তখন এইখানে তাঁরা প্রথম ভ্রান্তির বশীভূত হন। যে দ্বৈতবাদী দর্শনের সহোদর হিসাবে ইউরোপীয় সাহিত্যের জন্ম সেই সাহিত্য আধুনিক ভারতীয় পাঠক পাঠ করে' পাপ ও পুণ্যের, জীবন ও মৃত্যুর, চৈতন্য ও জড়প্রকৃতির দ্বন্দ্বে যে বিশ্বাস অর্জন করেন সেই নবার্জিত বিশ্বাস যখন রবীন্দ্রকাব্যে সায় পায় না তখন তিনি বাধাগ্রস্ত হন। ইউরোপীয় চিন্তা ও আদর্শের দ্বারা সমগ্র পৃথিবী এখন সম্পূর্ণ প্রভাবিত বলেই এই বাধার আবির্ভাব। অথচ রবীন্দ্রনাথ এই নূতন জীবনাদর্শের সর্বগ্রাসী প্রভাব থেকে মুক্তভাবে তাঁর কবিতামালা রচনা করে গেছেন। এর ফলে তিনি যে বাস্তবতার দাবীকেও স্বতই এড়িয়ে চলেছেন, একথা তাঁর মনে কখনই উদয় হয়নি, কেননা বর্তমানকালের ধারণার থেকে তাঁর বাস্তবতার ধারণাই ছিল স্বতন্ত্র, তাঁর বাস্তবতাবোধ ভাববাদের দ্বারা আচ্ছন্ন। রবীন্দ্রনাথ শেষ ভারতীয় কবি (কেননা শিল্পকেন্দ্রিক সমাজবিন্যাস ও যোগাযোগব্যবস্থা পৃথিবীর চেহারা ক্রমেই অবিচিত্র করে দিচ্ছে), আর আধুনিক কাব্যপাঠক ইউরোপীয় দর্শন ও কাব্যপ্রত্যয়ের দ্বারা প্রভাবিত। এই দুই মানদণ্ডের মধ্যে সেতুবন্ধন সহজ নয় বলেই রবীন্দ্রকাব্য-প্রত্যয়ের বিরুদ্ধে অনেক সময় অভিযোগ ওঠে। কীথ্ যখন কালিদাস সম্বন্ধে বলেন— "Assured as he was, that all was governed by a just fate which man makes for himself by his own deeds, he was incapable of viewing the world as a tragic scene, of feeling

any sympathy for the hard lot of the majority of men, or appreciating the reign of injustice in the world".[১১] তখন তিনি দুই জীবনাদর্শের স্বাতন্ত্র্যের কথা না উপলব্ধি করবার জন্যই কালিদাসের কাব্যপ্রত্যয়ের জন্য কালিদাসকে অভিযুক্ত করেন। ঠিক তেমনি ভাবে শ্রীযুক্ত শিবনারায়ণ রায় যখন বলেন "গ্যয়টে ও রবীন্দ্রনাথের বিরোধের মূল কথাটা কি? এক কথায় বলা যায়, এ বিরোধ অস্তিত্বতন্ত্রীর সঙ্গে ভাববাদীর, সত্যসন্ধিৎসুর সঙ্গে শান্তিকামীর।"[১২]—তখনো প্রকৃতপক্ষে এই বিরোধের মূল দুই পরিমণ্ডলের স্বতন্ত্র জীবনাদর্শের মধ্যেই পাওয়া যাবে। 'মানুষের প্রাতিস্বিক অস্তিত্বের' চাইতে বেশি মূল্য পেয়েছে যে ব্রহ্মাত্ম, 'তাঁর কাব্যে জীবনকে আচ্ছন্ন করে দাঁড়িয়েছে' যে জীবনদেবতা—সেই ব্রহ্মাত্ম বা জীবনদেবতা রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব পরিকল্পিত নয়, তারা আবহমান ভারতবর্ষের যৌথ পরিকল্পনা। এই কারণেই যখন পাশ্চাত্যসাহিত্য ডাইনি, পিশাচী, কালান্তকা, নিষ্করুণা মূর্তিমতী অবিদ্যার অবোধ্য আকর্ষণ বোধ করেছে, তখন ভারতবর্ষে ধ্বংসরূপিনী নৃমুণ্ডমালিনী কালী ভগবতী বা অন্নপূর্ণায় পরিণত হয়েছেন, রমনীর মঙ্গলমূর্তি সংস্কৃত সাহিত্যে ক্রমান্বয়ে বন্দিত হয়েছে, কারণ "ভারতীয় মন দুর্বারভাবে হাঁ-ধর্মী, সবরকম না-কে শেষপর্যন্ত একটা সদর্থে রূপান্তরিত না করে তার তৃপ্তি নেই, এবং এখানে দ্বন্দ্বনির্ভর পাশ্চাত্য জাতিবর্গের সঙ্গে তার মস্ত প্রভেদ ঘটে গেছে।"[১৩] এই প্রভেদের এক প্রান্ত এখন আমাদের মধ্যে সক্রিয় বলেই অন্যপ্রান্তবাসী রবীন্দ্র-কাব্যপ্রত্যয় অর্জন করা কঠিন হয়ে ওঠে।

দ্বিতীয়ত, রেনেসাঁর অন্যতম লক্ষণ যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ তারই প্রত্যক্ষ ফল পরিবেশ থেকে ব্যক্তির বিচ্ছিন্নতা। কারণ, এই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদই সামাজিক নীতিবোধ, আদর্শবোধ থেকে ব্যক্তির নীতি ও আদর্শকে স্বতন্ত্র করে বিচার করবার অধিকার দিয়েছে। চারিদিকে বিপুলভাবে বর্তমান সামাজিক পরিবেশের মত ও বিশ্বাসের সঙ্গে ব্যক্তি যখন নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারে না তখনই এক শূন্যতা ও বিচ্ছিন্নতার বোধ তাকে আক্রমণ

১১ কীথ্, The Sanskrit Drama, Part II, Chap VI

১২ শিবনারায়ণ রায়, রবীন্দ্রনাথ ও গ্যয়টে, সাহিত্যচিন্তা।

১৩ বুদ্ধদেব বসু, সংস্কৃত কবিতা ও মেঘদূত, অনূদিত মেঘদূত।

করে। এই বিচ্ছিন্নতা ও শূন্যতা-বোধ থেকে অধিকাংশ আধুনিক কবিতার জন্ম। সেই অসহায়ত্ববোধের আমরাও আজ উত্তরাধিকারী বলে সেই অনুভূতি-জাত কাব্যসাহিত্য আমাদের কাছে এত বেশি প্রিয়। কিন্তু রবীন্দ্র-কাব্যে সামাজিক বৃহত্তর মূল্যবোধ থেকে ব্যক্তিগত মূল্যবোধের পার্থক্যজনিত এমন কোন বিচ্ছিন্নতাবোধ, ব্যক্তির অসহায়ত্ববোধ নেই। সমাজের শুভবাদী বিশ্বাসে তিনি নিজেও অংশীদার। সেইকারণে দ্বিখণ্ডিত দর্পণে যে বিশ্ব প্রতিফলিত হয় সেই বিশ্বের অধিবাসী আধুনিক পাঠকের কাছে এই কাব্যের অভ্যন্তরে অনুপ্রবেশ এতো বিঘ্নসংকুল হয়ে ওঠে।

কিন্তু এই বাধা দুটিই ছদ্মবাধামাত্র। রবীন্দ্রনাথের ভারতীয় প্রত্যয় আধুনিক কাব্যপাঠকের বিশ্বাসের থেকে যতোই স্বতন্ত্র, বিরোধী হোক না কেন, সেই কাব্যপ্রত্যয় যদি অন্তত আবেগগ্রাহ্যভাবে বিশ্বাসযোগ্য হয়ে ওঠে তবে সেই কাব্যের রসাস্বাদে আমাদের বঞ্চিত হওয়া উচিত নয়। কেননা, কাব্যপ্রত্যয়ের চরিত্রসম্বন্ধে আলোচনায় দেখেছি কাব্যপ্রত্যয়কে যদি আবেগ-গ্রাহ্য বিশ্বাসে রূপান্তরিত করতে কবি সক্ষম হন, তবে বুদ্ধির দিক থেকে সম্পূর্ণ বিরোধী প্রত্যয়ের কাব্যরস গ্রহণেও পাঠকের কোন বাধা হয় না। দ্বিতীয়ত, যে কবির প্রত্যয় পরিমণ্ডলের বিশ্বাস থেকে স্বতন্ত্র, যাঁর মধ্যে বিচ্ছিন্নতার অনুভূতি বর্তমান একমাত্র সেই কবিই আধুনিক পাঠকের প্রিয় হবেন, একথাও সত্য নয়। দান্তে ক্যাথলিক ধর্মশাসিত ইউরোপের তৎকালীন বিশ্বাসের অন্তর্ভুক্ত সন্ত অ্যাকুইনাসের মতবাদকে কাব্যপ্রত্যয়ে পরিণত করেছিলেন, সেই সমাজের সামগ্রিক বিশ্বাসের সঙ্গে ব্যক্তিগত মতাদর্শের কোন বিরোধের যন্ত্রণা দান্তে অনুভব করেন নি—অথচ তাঁর কাব্য আধুনিক কাব্যপাঠকের কাছে সমবেদন প্রাপ্ত হয়, আস্বাদ্য হয়ে ওঠে। সুতরাং রবীন্দ্রপ্রত্যয়ে ভারতীয়ত্বের অস্তিত্বের ফলে, বা রবীন্দ্রপ্রত্যয়ে ঐতিহ্য ও সমাজাদর্শ থেকে বিচ্ছিন্নতাবোধের অভাবের ফলে, সেই কাব্য আধুনিক পাঠকের কাছে আস্বাদ্য হবেই না, এমন কোন স্বতঃসিদ্ধ সিদ্ধান্ত সম্ভব নয়।

রবীন্দ্রকাব্য উপভোগ প্রসঙ্গে আর একটি বাধার প্রশ্ন উঠতে পারে। এই কাব্য এলিয়ট-কথিত সমুন্নত স্বপ্নের ('high dream') জগৎ থেকে জন্মগ্রহণ করেছে, আর সাম্প্রতিক পৃথিবী শুধু নীচ স্বপ্ন ('low dream') দেখতেই সক্ষম এবং অভ্যস্ত। সেইকারণে "We have a prejudice

against beatitude as material for poetry"[১৪] নীচস্বপ্নময় বাস্তববাদী দৃষ্টি দিয়ে দেখলে রবীন্দ্রনাথের কাব্য নিতান্ত সুদূরের সামগ্রী, অপরিচিত পৃথিবী বলে মনে হবে, কেননা এক আধ্যাত্মিকতার বিভায়, আদর্শবাদের আলোকে সেই পৃথিবী পরিপ্লাবিত। কিন্তু সংকীর্ণ বাস্তববুদ্ধির গণ্ডীতে দণ্ডায়মান হয়ে আধ্যাত্মিকতার আদর্শবাদের বিরোধিতা যদি আমরা করি এবং সেই অজুহাতে যদি আমরা রবীন্দ্রকাব্যকে অস্বীকার করার উৎসাহ বোধ করি তবে অন্যান্য অনেক মহাকাব্যের পাঠাস্বাদ থেকেও আমাদের স্থায়ীভাবে বঞ্চিত হতে হবে। দান্তে ও বাস্তবপৃথিবীর প্রতিকল্প যে নরক তাকে অতিক্রম করে পরিণামে নন্দনলোকে আমাদের উত্তীর্ণ করেছেন, গ্যেটেও ফাউস্টের দ্বিতীয় খণ্ডে সেচব্যবস্থায় সেতুবাঁধনির্মাণে, সামাজিক কল্যাণকর্মে ফাউস্টের মুক্তি খুঁজে পেয়েছেন এবং আধুনিক কালের কবিও উপলব্ধি করেছেন—"that the whole of modern literature is corrupted by what I call Secularism, that it is simply unaware of, simply cannot understand the meaning of, the primary of the supernatural over the natural life, of something which I assume to be our primary concern"[১৫] সুতরাং কোন কবি যদি পৃথিবী অধঃপতিত বলে নরকের, পতনের বর্ণনাকেই কাব্যের প্রধানকর্ম মনে না করে সমুন্নত স্বপ্ন দেখেন, বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত বাস্তবের মধ্যে কোন মহনীয় তাৎপর্যকে আবিষ্কার করার দুরূহ দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং সেই দায়িত্বকে সার্থক কাব্যে রূপায়িত করেন তবে কাব্যপাঠকের তাতে আপত্তি করার কোন কারণ নেই, একমাত্র নিজস্ব পরিমণ্ডলে গ্রথিত তার সংকীর্ণ রসবুদ্ধি ছাড়া।

এই আপত্তিগুলি একে একে খণ্ডন করার পর রবীন্দ্রকাব্যপ্রত্যয়ের কেন্দ্রীয় সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করলে আমরা দেখতে পাই, একটি দার্শনিক মতবাদের ভিত্তিতে এই কাব্যপ্রত্যয় অনুপ্রাণিত হলেও তার মধ্যে মতবাদের গোঁড়া সংকীর্ণতা নেই। সেই মতবাদকে কেন্দ্র করে এই কবি যাকে রূপায়িত করেছেন সে একটি প্রজ্ঞাদৃষ্টি, এলিয়ট-উক্ত 'wisdom'। এই প্রত্যয়ের প্রগাঢ় প্রজ্ঞাদৃষ্টির মধ্যে যেহেতু দেশ ও কালাতীত একটি চিরন্তন আকর্ষণ

---

১৪ এলিয়ট, Dante

১৫ এলিয়ট, Religion and Literature

আছে, যেহেতু তার মধ্যে মানুষের সর্বকালাতীত সামূহিক অস্তিত্বের সম্বন্ধে কবির নিজস্ব অন্তর্দৃষ্টি রূপায়িত হয়েছে, যেহেতু এই প্রত্যয় শুধুমাত্র দীক্ষিতের জন্যই সুরক্ষিত নয়—সেইকারণে রবীন্দ্রনাথের কাব্যপ্রত্যয় সাময়িকত্বের, একদেশদর্শিতার নিন্দা থেকে বহুলপরিমাণে মুক্ত। যখন শুনি 'বায়ুসমুদ্রে ঘুরে ঘুরে চলে অশ্রুতবাণীর চক্রলহরী, কিছুই হারায় না' অথবা 'জীবন পবিত্র জানি' তখন এই প্রত্যয়ে শুধুমাত্র অন্বয়বাদী অংশীদার হয় না, এই প্রত্যয়ের কম্পন প্রত্যেক মানুষের অস্তিত্বের গোপনতম তন্ত্রীতে নাড়া দেয়। পংক্তিগুলি পাঠ করলে মনে হয় যেন এক ঊর্ধ্বলোকবাসী পুরুষ জীবনের সমস্ত সাময়িকতা ও বিক্ষোভের মধ্যে দিব্যদৃষ্টিতে একে একে অস্তিত্বের এই কেন্দ্রীয় সত্যগুলি আবিষ্কার করেছেন এবং ছন্দোবদ্ধ পংক্তিপর্যায়ে মন্ত্রের মত সেই প্রজ্ঞাকে অমরত্ব দান করেছেন।

কিন্তু রবীন্দ্রকাব্যপ্রত্যয়ে একদেশদর্শী মতবাদের সংকীর্ণতা ও গোঁড়ামি না থাকলেও, তার মধ্যে জীবনসম্বন্ধে প্রজ্ঞাদৃষ্টির সাক্ষাৎ পেলেও, এই অভিযোগ সত্য যে জীবনের, মানবসত্তার ব্যাপকতম বৃত্তটি তিনি রূপায়িত করতে পারেন নি, মনুষ্যত্বের বৃহত্তম পরিধির সমস্ত দিগন্ত সমভাবে এই কাব্যমুকুরে প্রতিফলিত হয়নি। যাকে কীটস্ 'Negative Capability' বা গ্যেটে 'manifold awareness' বলেছেন, যাকে এলিয়ট বলেছেন "charity that comes from understanding human beings, in all their variety of temperament, character and circumstance"[১৬]—তা রবীন্দ্রনাথ অর্জন করতে পারেন নি। যে শক্তির বলে জীবনের অসমাধিত এবং দুঃসমাধেয় চিরন্তন জটিলতাকে, দুরতিক্রম্য বিরোধকে অপক্ষপাতভাবে রূপায়িত করা যায়—সেই শক্তির পরিচয় রবীন্দ্রনাথের কবিতায় আমরা পাই না। কিন্তু এই প্রসঙ্গে দুটি সতর্কবাণী স্মরণ রাখা দরকার। প্রথমত, অন্বয়বাদী বিশ্বাসের প্রকৃতির মধ্যেই এই সংকীর্ণতার কারণ নিহিত—এই বিশ্বাসে বিশ্বাসী বহুমুখী সচেতনতার কোন মূল্যই দেয় না। এবং দ্বিতীয়ত কবি স্বয়ং যা বিশ্বাস করেন তাকে কাব্যে আন্তরিকতার সঙ্গে রূপায়ণেই তিনি সার্থক হতে পারেন, রবীন্দ্রনাথ যে প্রত্যয়ে বিশ্বাসী ছিলেন না, ব্যাপকতার সাধনায় যদি সেই প্রত্যয়কে ঋণ হিসাবে গ্রহণ করে কাব্যে

১৬ এলিয়ট, Goethe as the Sage

রূপায়িত করার চেষ্টা করতেন, তবে অব্যর্থ ব্যর্থতার গ্লানিকর বোঝা তাঁকে বহন করতে হতো। এখানেও পরোধর্ম ভয়াবহ।

কিন্তু তৎসত্ত্বেও আধুনিককালের পাঠক অতৃপ্তি বোধ না করে পারেন না। কবি যে লক্ষ্য অর্জন করতে গিয়েছিলেন সেই লক্ষ্যের মানদণ্ডেই তাঁর কাব্যে সার্থকতা বিচার করা দরকার, যে লক্ষ্য তাঁর চিন্তার মধ্যে ছিলোনা, যেদিকে কবি তাঁর মনোযোগ স্থিরনিবদ্ধ করেন নি, সেই অনুপস্থিত মানদণ্ডে কবির কাব্যবিচার হয়তো অনুচিত, কিন্তু জীবনের জটিল সমস্যার সংঘাতে বিপর্যস্ত, অস্তিত্বের বক্রতায় কণ্টকাকীর্ণতায় ক্ষতবিক্ষত, কাব্যপাঠক যখন সামগ্রিকতার পরিপূর্ণতার অপক্ষপাতিত্বের দাবী করেন তখন সেই দাবীকেও উপেক্ষা করা যায় না। সমন্বয়ের প্রয়োজন, সামঞ্জস্যের আবশ্যিকতা উপেক্ষনীয় নয়, কিন্তু কোন এক তত্ত্বের সীমাবদ্ধ সাফল্যের বিনিময়ে সেই সার্বভৌম সমন্বয় মেলে না। দান্তের 'দিব্যমিলন' কাব্যের পরিণামেও আমরা পেয়েছি —'Within the depths I saw ingathered, bound by love in one volume, the scattered leaves of the universe, substance and accidents and their relations, as though together fused, so that what I speak of is one single flame'—Paradiso-র পরিণামে এই একক সহজ অগ্নিশিখাকে অর্জন করতে যেয়ে, সামঞ্জস্যপূর্ণ লক্ষ্য জয় করতে যেয়ে দান্তে বৈপরীত্যের বিরুদ্ধতার কোন সম্পর্ককেই উপেক্ষা করেন নি। তাই তাঁর রচনায় নরক থেকে স্বর্গ পর্যন্ত সেই বহুমুখী চেতনার পরিচয় পাই যা রবীন্দ্রনাথে অনুপস্থিত। একটিমাত্র প্রত্যয়কে কেন্দ্র করে এই কাব্যবৃত্ত আবর্তিত বলে, সমন্বয়ের সত্যকে যাত্রার শেষে অর্জন করার পরিবর্তে যাত্রার প্রথমেই তাকে স্বতঃসিদ্ধ সত্য বলে ধরে নেওয়ায় "such assertion involves suppression of infinite extent, which may be fatal to the wholeness, the integrity of the experience."[১৭] অথচ অভিজ্ঞতার এই সম্পূর্ণতা ও সততাই আধুনিক কাব্য-পাঠক কবির কাছে দাবী করেন। অঙ্কের মধ্যবর্তী স্তরগুলি বাদ দিয়ে উত্তরমালা দেখে ফল বসিয়ে দিলে অঙ্কের দক্ষতার প্রমাণ মেলে না। রবীন্দ্রকাব্যেও বৈষম্যের প্রত্যাশিত স্তরগুলি অনুপস্থিত বলে একেবারেই যখন সুষমা ও সমন্বয়ের সম্মুখীন আমরা হই তখন অপ্রস্তুত বোধ না করে পারি না। ভ্যান গগ্‌

১৭ রিচার্ডস্‌, Principles of Literary Criticism, Chap XXXV

মৃত্যুর পূর্বাহ্নে প্রিয় ভ্রাতাকে লিখেছিলেন তাঁর চিত্রাবলীতে 'calm in the catastrophe' চিবন্তন কালেব জন্য বিধৃত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ, আধুনিক পাঠকেব মনে হয়, জীবনের এই অনিবার্য 'catastrophe'-কে উপেক্ষা কবে একেবারেই 'calm' অর্জন কবতে চেয়েছেন এবং সেই কাবণেই এই শান্তি এতো নিবাবলম্ব মনে হয়। কবি সমুন্নত স্বপ্ন দেখুন তাতে পাঠকেব আপত্তি নেই, কিন্তু পাঠক মনে কবেন নীচস্বপ্নকে উপেক্ষা কবে সমুন্নত স্বপ্ন দর্শন সম্ভব নয়। কিন্তু ববীন্দ্রনাথেব জীবনাদর্শেব মতো তাঁব সাহিত্যাদর্শ ছিল সম্পূর্ণ বিপবীত। 'আমাদেব স্থিতি-প্রধান সভ্যতায় পদে পদে ত্যাগ, ক্ষমা ও আত্মনিগ্রহেব প্রয়োজন হয়'—বিশেষভাবে সেই আত্মনিগ্রহকেই ববীন্দ্রনাথ ঐতিহ্যেব উত্তবাধিকাবী হিসাবে গ্রহণ কবেছিলেন বলে অভিজ্ঞতাব বাস্তব সম্পূর্ণতা সততাব সঙ্গে রূপাযিত কবা তাঁব পক্ষে সম্ভব ছিল না। প্রকৃত প্রস্তাবে, তাঁব আদর্শবাদী ভাববাদী দৃষ্টিতে অভিজ্ঞতাব সম্পূর্ণতা ও সততাব প্রকৃতিই স্বতন্ত্র।

কিন্তু আধুনিক কাব্যপাঠকেব চোখে ববীন্দ্রকাব্যপ্রত্যযে মানব-অভিজ্ঞাব দিগন্তেব সীমাবদ্ধতা স্বীকাব কবলেও এই কাব্যের গৌবব অনুমাত্র খর্ব হয না। কেননা বুদ্ধিগ্রাহ্য বিশ্বাসেব দিক থেকে এই কাব্যেব প্রত্যয বিশ্বাসনীয না হতে পারে, কিন্তু সেই কাব্যেব পরিমণ্ডলে প্রবেশ কবলে, ছন্দশব্দ তাদেব জাদুক্রিযা সুরু কবলে সেই আবেগময বিশ্বাস জন্মাতে আবম্ভ কবে যা পাঠকের বুদ্ধিগত আপত্তিকে অবশ করে, যুক্তিব গ্রন্থিকে শিথিল করে দেয।

এই জ্যোতিঃ সমুদ্র মাঝে
যে শতদল পদ্ম রাজে
তাবই মধু পান কবেছি ধন্য আমি তাই। (গীতাঞ্জলি ১৪২)

যখন পংক্তিপর্যায়ের মধ্যে এই ধন্য কৃতজ্ঞতাবোধ ধ্বনিত হতে থাকে তখন তা শুধু কবির কথা থাকে না, জীবনের সমস্ত বিক্ষোভ সত্ত্বেও পাঠকের নিজের কথা হয়ে ওঠে। রিচার্ডস্-কথিত সেই 'emotional belief' জন্মায় বলেই কবির সুগভীব প্রত্যয যখন কাব্যে উচ্চাবিত হয 'দেখেছি নিত্যের জ্যোতি দুর্যোগেব মায়ার আড়ালে' তখন পাঠকেরও মনে হয় মৃত্যুরোগশোকজরার যে যন্ত্রণা তা মায়াময দুর্যোগমাত্র, নিত্যের জ্যোতির আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে অশরীরী কুয়াশার মত মিলিয়ে যাবে। বর্তমান জীবনযাত্রা হতে এতো সুদূর

হওয়া সত্ত্বেও, এই শুভবাদী অদ্বয়বাদী প্রত্যয়জাত কাব্য আমাদের মনে যে আবেগময় বিশ্বাস জন্মাতে পারে, তার 'assumption'-এর বাধ্যবাধকতা যে জাদুপ্রভাবে আমাদের বন্দী করতে পারে, অবিশ্বাসের এই দুরতিক্রম্য ব্যবধান জয় করতে পারে তার থেকেই রবীন্দ্রকাব্যের মহতী গৌরব আমরা উপলব্ধি করতে পারি। এই অসাধ্যসাধনেই তার অমরত্বের মৌলিক অভিজ্ঞান নিহিত। সীমাবদ্ধতাতেই তার শক্তি।

বর্তমান পৃথিবীর পক্ষে অপরিচিত এই প্রত্যয় পাঠকের মনে আবেগময় বিশ্বাস যে জন্মাতে পারে তার কারণ এই প্রত্যয় শুধু প্রথা ও ঐতিহ্যের অন্ধ অনুস্মৃতিমাত্র নয়, যদিও সেই ঐতিহ্য কবিমনের পশ্চাৎপর্যবচনায় গভীরভাবে কাজ করেছে। কোন মহাপুরুষের বাণী, ধর্মনৈতিক বা রাজনৈতিক বিশ্বাস সমস্ত মানুষের মোক্ষের পথ দেখাতে পারে না। আদর্শ ও বিশ্বাস তখনই মূল্যবান যখন নিজের অভ্যন্তরের অনিবার্য প্রয়োজনের উৎসমুখ থেকে আমরা তাদের অর্জন করি। প্রত্যেক সমস্যাই ব্যক্তিগত এবং সেই সমস্যা থেকে মুক্তির পথও ব্যক্তিগত। আমাদের প্রত্যেকের ব্যক্তিগত মোক্ষ ও সমন্বয়ের পথ আমাদের নিজেদেরই জীবন দিয়ে আবিষ্কার করতে হয়, ঐতিহ্য ও প্রথা তাকে সাহায্য করতে পারে মাত্র। রবীন্দ্রনাথ সমন্বয়ের পুষ্পই তাঁর কাব্যের মধ্য দিয়ে আমাদের উপহার দিয়েছেন, মহাদুঃখের মহানন্দের চিরদ্বন্দ্বের সংঘাত লেগে যে চিৎপদ্ম ফুটে ওঠে, সেই চিৎপদ্মই মূল্যবান এবং শাশ্বত, দ্বন্দ্বের সংঘাত আপতির ও মূল্যহীন—এই কথা তিনি বিশ্বাস করতেন বলেই যে গোপন রক্তক্ষরণের পীড়ার মধ্য দিয়ে তিনি সমন্বয়ের পুষ্প ফুটিয়ে তুলেছিলেন তার কোন পরিচয় রেখে যান নি। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার সেই গোপন গর্ভ থেকে এই মোক্ষের যে পথ তিনি লাভ করেছিলেন তার সঙ্গে ভারতীয় ঐতিহ্যের চিরাগত বিশ্বাস মিলে গিয়েছিল। নিজের জীবন-উপলব্ধ প্রত্যয়ের সমর্থন তিনি পেয়েছিলেন ভারতীয় ঐতিহ্যের ভিতর। সেইকারণে ভারতবর্ষের অদ্বয়বাদী ধারার উত্তরাধিকারী হওয়া সত্ত্বেও তাঁর কাব্যপ্রত্যয়কে কোন সময়েই ঐতিহ্যের অন্ধ অনুকরণ বলে মনে হয় না, বরং মনে হয় তাঁরই ব্যক্তিগত বিশ্বাসের দ্যুতিতে জড় ঐতিহ্যও যেন প্রাণময় হয়ে উঠেছে। এবং ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার সুতীব্র দ্যুতি তার মধ্যে আছে বলেই নির্জনে পাঠক যখন এই প্রত্যয়ে প্রদীপ্ত কাব্য পাঠ করেন তখন তার ব্যক্তিগত অনুভূতি

সেই প্রত্যয়কে তার আপন অভিজ্ঞতার অঙ্গ বলে বিশ্বাস করতে পারে। "শশী যে রাত্রে গেল তার পরের রাত্রে রেলে আসতে আসতে দেখলুম জ্যোৎস্নায় আকাশ ভেসে যাচ্ছে, কোথাও কিছু কম পড়েচে তার লক্ষণ নেই। মন বললে, কম পড়েনি—সমস্তর মধ্যে সবই রয়ে গেছে, আমিও তারই মধ্যে।" (চিঠিপত্র ৪)। ব্যক্তিগত জীবনের বিদীর্ণ অভিজ্ঞতার কষ্টিপাথরে এই শুভবাদী স্থিতিমূলক প্রত্যয়ের পরীক্ষা হয়ে গেছে—অনিবার্য আভ্যন্তরীণ তাড়নায় এই প্রত্যয় স্বেচ্ছানির্বাচিত, ঐতিহ্যের অন্ধ অনুকরণ নয়। এবং আভ্যন্তরীণ তাড়নায় অনিবার্যভাবে নির্বাচিত বলেই বুদ্ধির দিক থেকে যারা এই প্রত্যয়ে অবিশ্বাসী তাদের মধ্যেও প্রবল শক্তিতে এই কাব্য বিশ্বাস উৎপাদন করাতে পারে।

অশীতিবর্ষের আলোকিত জীবন-কেন্দ্রের চারিদিক থেকে হ্রস্বমান পরিধির মত, হিংস্র নেকড়ের মত অন্ধকার যখন এগিয়ে আসছে সেই অবলুপ্তপ্রায় চৈতন্যের মুহূর্তে, রোগযন্ত্রণা ও মুমূর্ষার মুহূর্তে যে কবিতাদুটি তিনি মুখে মুখে রচনা করে গেছেন সে দুটি আলোচনা করলেই বোঝা যায় এই কাব্যপ্রত্যয় ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কোন গূঢ় গঙ্গোত্রীর থেকে জন্ম লাভ করেছে এবং কেন এই প্রত্যয় অবিশ্বাসীর অবিশ্বাসকে মূক এবং স্তব্ধ করে দেয়। এর মধ্যে প্রথমটি, 'শেষলেখা'র চতুর্দশ সংখ্যক কবিতায় দেখি, মৃত্যুর অস্ত্র শুধু কষ্টের 'ভান', তার ত্রাস 'ভঙ্গি' বা pose মাত্র—তার মধ্যে সত্য নেই, সে শুধু 'ছলনা'র ভূমিকা রচনা করে চলেছে। 'মুখোশ' যেমন মিথ্যা ভয় দেখায়, মৃত্যুও তেমনি। এই মৃত্যু 'খেলা', 'কুহক', 'পরিহাস'। তার বিচিত্র জটিল 'জলচ্ছবি' পলকে পলকে মুছে লুপ্ত হয়ে যায়। বিকীর্ণ আঁধারে মৃত্যুর 'নিপুণ' শিল্পে যতোই নৈপুণ্য থাক, শাশ্বতের মর্যাদা তার মধ্যে নেই। এই মিথ্যাকে যখন সত্য বলে বিশ্বাস করি তখনই পদে পদে 'অনর্থ পরাজয়' মেনে নিতে হয়।

> তোমার সৃষ্টির পথ রেখেছ আকীর্ণ করি
> বিচিত্র ছলনাজালে
> হে ছলনাময়ী। (শেষলেখা ১৫)

বিশ্বের বৈচিত্র্য, বিরোধ, সাময়িক দ্রুতপরিবর্তিত ঘটনাপুঞ্জ, বস্তুজগৎ, সমস্তই মায়া, সমস্তই ছলনা। জীবন 'সরল' অর্থাৎ অবোধ বলেই 'নিপুণ' হাতে

মৃত্যুব 'মিথ্যা' বিশ্বাস প্রতি পদক্ষেপে ফাঁদ পেতে রাখে, কিন্তু—

অনায়াসে যে পেরেছে ছলনা সহিতে
সে পায তোমাব হাতে
শান্তিব অক্ষয অধিকাব। (ঐ)

আযাস-অনায়াসেব প্রশ্ন জীবনীকাবেব বিচার্য। রচিত-কাব্যেব মধ্যে দেখি বিশ্বেব বিবোধ-সংঘাতেব ছলনা অতিক্রম করে' রবীন্দ্রনাথ 'শান্তিব অক্ষয় অধিকার' অর্জন কবেছেন এবং এই অধিকার ব্যক্তিগত জীবনেব অভিজ্ঞতাব উৎসমুখ থেকে জাত, আব তাকে সম্পূর্ণ আনুকূল্য দিয়েছে দীর্ঘকালাগত ঐতিহ্য। ব্যক্তিগত জীবনেব চবম সংকট মুহূর্তেও যে প্রত্যয অবিচলিত থাকে, সেই প্রত্যয যে কবিতায রূপান্তরিত, সে কবিতা সমস্ত অবিশ্বাসকে স্তম্ভিত কবে দিযে একদিকে বিশ্বাসেব সর্বাস্তবিক সততার, অন্যদিকে প্রতিভাব সমুন্নত অসামান্যতাব প্রমাণ দেয। এই কাব্যে আদ্যন্তকাল 'আনন্দধাবা বহিছে ভুবনে', সেই ভুবনে প্রবেশ কবে, আধুনিককালেব অন্ধকাবে বদ্ধমূল মানুষও বিস্মৃত আনন্দেব অমৃত স্পর্শ লাভ কবে ধন্য হতে পাবে।

রবীন্দ্রনাথ ও সংস্কৃত-সাহিত্য

অতুলচন্দ্র গুপ্ত

কালিদাসের কালে জন্ম নিলে তাঁর কাব্য-রচনার প্রকৃতি ও পরিমাণ কি রকম হ'তো রবীন্দ্রনাথ তা কৌতুকের সঙ্গে কল্পনা করেছেন। তাঁর লেখা একটি মাত্র শ্লোকের স্তুতিগানেই যে রাজা উজ্জয়িনীর প্রান্তে একখানা উপবন-ঘেরা বাড়ী কবিকে দান করতেন তা সহজেই বিশ্বাস হয়। কিন্তু কালিদাসের কালের রবীন্দ্রনাথ যে বিশ্বাধরের স্তুতিগীতেই তাঁর কবি প্রতিভাকে নিঃশেষ করতেন আর তাঁর কাব্য-সৃষ্টি দু' একখানি মাত্র ছোট-খাটো পুঁথি ভ'রে দিতো এ একেবারে অবিশ্বাস্য। ত্বরাহীন জীবন মন্দাক্রান্তা তালে কাটিয়ে দেবার কোনও লোভ, কি রাজার চিত্র-শালার কোনও মালবিকার মোহ তাঁর কবি-মর্ম্মের এ সংকোচ ঘটাতে পারতো না। তাঁর কাব্যগুলি খুব সম্ভব আকারে ছোটই হ'তো, যেমন 'মেঘদূত' ছোট, কিন্তু সংখ্যায় দু'একখানি নয়। নরনারীর চিত্তের সহজ ও সূক্ষ্ম বহু ভাব ও আকাঙ্ক্ষা, মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির নিগূঢ় যোগের পরমাশ্চর্য্য লীলা অনেকগুলি খণ্ডকাব্যে বাণীর পরিপূর্ণ মূর্ত্তি নিয়ে ফুটে উঠতো, যার অম্লান দীপ্তি কাব্য-রসিকের মন আজও উদ্ভাসিত করতো। অনুষ্টুপ থেকে স্রগ্ধরা, এবং রবীন্দ্রনাথ কালিদাসের কালে জন্মেন নি ব'লে সংস্কৃত ভাষার যে-সব ছন্দ অনাবিষ্কৃত হয়ে গেছে তাদের বিচিত্র ঝঙ্কার ও দোল, এ সব কাব্য থেকে দেড় হাজার বছর পার হ'য়ে আমাদের কান ও মনে এসে লাগ্‌তো।

সংস্কৃত কাব্য-সাহিত্য, বিশেষ ক'রে কালিদাসের কাব্য, রবীন্দ্রনাথের কল্পনাকে নানা দিকে নাড়া দিয়েছে। এর কারণ, এ সাহিত্যের সঙ্গে রবীন্দ্র-নাথের প্রতিভার নিবিড় যোগ আছে। রবীন্দ্রনাথ সুর ও ছন্দের রাজা। তাঁর সুর-রসিক মন ও আশ্চর্য্য ছন্দকুশলী কান সংস্কৃত কাব্যের ধ্বনি ও ছন্দের মধ্যে নিজের প্রতিভার একটা অংশের গভীর ঐক্য উপলব্ধি করেছে। বালক বয়সে যখন সংস্কৃত কাব্যের অর্থ বুঝে তার রস গ্রহণের সময় হয়নি, তখনও যে তাঁর মনকে ওর ছন্দের তান ও লয়ে মুগ্ধ করতো 'জীবনস্মৃতিতে' রবীন্দ্রনাথ

তার সাক্ষী দিয়েছেন। কালিদাসের কাব্যে ভাষায় ভাব-প্রকাশের ক্ষমতা ও রসোদ্বোধনের শক্তি একটা চরম পরিণতি লাভ করেছে। এই পরম উৎকর্ষের মূল উপাদান দু'টি—কালিদাসের শব্দ-সম্পদের নিটোল পরিপূর্ণতা ও তার অপূর্ব ধ্বনি-সামঞ্জস্য। এর মিশ্রণে যে কথা ও ভাব কালিদাস প্রকাশ করতে চেয়েছেন তার দীপ্ত পরিচ্ছিন্ন মূর্ত্তি তখনি তাঁর কাব্যে ফুটে উঠেছে, যে রস তিনি জাগাতে চান 'শুষ্কেন্ধন ইবানলঃ' পাঠকের চিত্তকে তা ব্যাপ্ত করে। কালিদাসের ভাষা একসঙ্গে ছবি ও গান। 'রঘুবংশের' যে-প্রারম্ভটা প্রথম যৌবনে নিতান্ত সরল, বর্ণচ্ছটাহীন মনে হয়, ভাবপ্রকাশে তার কি অদ্ভুত ক্ষমতা।—

মন্দঃ কবিযশঃপ্রার্থী গমিষ্যাম্যুপহাস্যতাম্।
প্রাংশুলভ্যে ফলে লোভাদুদ্বাহুরিব বামনঃ ॥

মনে হয় কি সহজ এ রচনা। শিল্পীর চরম কৌশল এই সহজের মায়া সৃষ্টি করেছে। এ হচ্ছে সেই শ্রেণীর সহজ, মানব-দেহের সামঞ্জস্য যেমন সহজ। ও এম্‌নি সু-সম্পূর্ণ যে, তাকে নিতান্ত স্বাভাবিক ব'লে আমরা মেনে নিই। গড়নের যে আশ্চর্য্য কৌশলে এই সামঞ্জস্য এসেছে, তার কথা মনেই হয় না।

প্রাংশুলভ্যে ফলে লোভাদুদ্বাহুরিব বামনঃ।

একটিমাত্র লাইনে অক্ষমের হাস্যকর নিষ্ফল চেষ্টার ছবি কালিদাস এঁকে তুলেছেন, আর তেম্‌নি সে লাইনের ধ্বনির বৈচিত্র্য ও 'ব্যালান্স'। ভাষা-প্রয়োগের এই চরম নৈপুণ্য কেবল পৃথিবীর মহাকবিদের লেখাতেই পাওয়া যায়। যেমন সেক্সপিয়রে—

"And then it started like a guilty thing
upon a fearful summons"

"a poor player,
That struts and frets his hour upon the stage,
And then is heard no more,"

ভাষা যেন রেখা ও ধ্বনি দিয়ে ভাবের মূর্ত্তি গ'ড়ে চলেছে। এই পরিপূর্ণ বাণীর অভাবে অনেক শ্রেষ্ঠ কবি-প্রতিভা মহাকবিত্ব লাভে বঞ্চিত হয়, যেমন ইংরেজ কবি রবার্ট্ ব্রাউনিং। রবীন্দ্রনাথের ভাষা এই মহাকবির ভাষা, ধ্বনি, রেখা, রংএর অমৃত রসায়ন।

"বাণীর বিদ্যুৎ-দীপ্ত ছন্দোবাণবিদ্ধ বাল্মীকিরে।"
"শস্যশীর্ষে শিহরিয়া কাঁপি' উঠে ধরার অঞ্চল।"
"পথের আনন্দবেগে অবাধে পাথেয় কর ক্ষয়।"
"অব্যক্ত ধ্বনির পুঞ্জ অন্ধকারে উঠিছে গুমরি'।"

কিছুই আশ্চর্য্য নয় যে, পূর্ব্বভারতের অপভ্রংশের এই মহাকবি পোনর শতাব্দীর ব্যবধান ভেদ ক'রে উজ্জয়িনীর মহাকবির হাতে হাত মিলিয়েছেন।

কালিদাস বিশ্বপ্রকৃতির বিচিত্র রূপের মধ্যে মানুষের চিত্তকে ব্যাপ্ত ক'রেছেন। তাঁর কাব্যে প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের ভাব ও রসের নিবিড় মিলন ঘটেছে। এইখানে কালিদাসের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের নিকটতম আত্মীয়তা। মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির নিগূঢ় যোগের যে-রসমূর্ত্তি রবীন্দ্রনাথের কাব্যে ফুটে উঠেছে, পৃথিবীর সাহিত্যে তা অপ্রতিদ্বন্দ্বী। এ সম্পর্কে ইংরেজ কবি ওযার্ডস্-ওয়ার্থের নাম ইংরাজী কাব্য-রসিকদের মনে হয়। কিন্তু ওযার্ডস্ওয়ার্থে প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের যে-যোগ, তা প্রধানত' তত্ত্বের যোগ, রসের যোগ নয়—প্রকৃতির সঙ্গে ভাবের কারবারে কবির মন কত দিক থেকে কতখানি পুষ্ট হচ্ছে তার হিসাব। এর আস্বাদ বিভিন্ন। যুগল-মিলনের যে মধুর রস রবীন্দ্রনাথের কাব্যে র'য়ে যাচ্ছে এ রস সে অমৃত-রস নয়। প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের যে ভাবৈক্যরসত্ব মানুষের মনকে বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে পরিব্যাপ্ত ক'রে দেয়, বিশ্ব-প্রকৃতির সুর মানুষের মনের বীণায় বাজাতে থাকে, রবীন্দ্রনাথের কাব্যের বাহিরে কালিদাসের কাব্যেই তার সন্ধান পাওয়া যায়। ভারতবর্ষের অতীত ও বর্ত্তমানের এই দুই মহাকবি এইখানে পরস্পরের একমাত্র আত্মীয়।

কালিদাসের কাব্য ও সংস্কৃত কাব্য-সাহিত্যের শ্রেষ্ঠাংশের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার আর-একটি যোগ এমন প্রকট নয়, কিন্তু প্রচ্ছন্ন নাড়ীর যোগ। সে হচ্ছে, এই কাব্যের একটা আভিজাত্যের সংযম। মহাভারতে, রামায়ণে, কালিদাসে সমস্ত ভাব, রস ও বৈচিত্র্যকে একটা গভীর শান্তরসে ঘিরে আছে, যা সমস্ত রকম আতিশয্য ও অসংযমকে লজ্জা দেয়। তার অর্থ নয় যে, এ সব কাব্যের ভাব গতানুগতিক, কি রসবৈচিত্র্যহীন। কালিদাস কবি-প্রসিদ্ধির ধার-করা চোখ দিয়ে পৃথিবীকে দেখেন নি, সংস্কারহীন কবির চোখেই দেখেছেন। বহু রসের বিচিত্র নবীন লীলায় তাঁর কাব্য ঝলমল্ করছে। কিন্তু তাঁর কাব্য কখনও সংযমের ছন্দ কেটে সৌন্দর্য্যের যতিভঙ্গ করে না।

ইউরোপীয় অলঙ্কারের ভাষায় কালিদাসের কাব্যে 'ক্ল্যাসিসিজ্‌ম্' ও 'রোমাণ্টিসিজ্‌ম্'-এর অপূর্ব্ব মিলন ঘটেছে। রবীন্দ্রনাথের কবি-প্রতিভা এই মিলন পন্থী। পৃথিবীর 'লিরিক' কবিদের মধ্যে তাঁর স্থান সম্ভবত সবার উপরে। মানুষের মনের এত অসংখ্য ভাবের রসের পরিপূর্ণ রূপ আর কোথাও দেখা যায় না। প্রাণের প্রাচুর্য্যে তাঁর কাব্য কানায় কানায় ভরা। কিন্তু সমস্ত লীলা ও গতিকে অন্তরের একটি গভীর অটলতা, নটরাজের মূর্ত্তির মত চিরসুন্দরের ছন্দে গ'ড়ে তুলেছে। এখানে রবীন্দ্রনাথ কালিদাসের সহধর্মী। রবীন্দ্রনাথের যৌবনে যে কাব্য-সাহিত্যেরে সবচেয়ে প্রভাব ছিল, ঊনবিংশ শতাব্দীর সেই ইংরেজী কাব্য বরং এর পরিপন্থী। এ কাব্যে ভাব ও প্রাণের বন্যা বহু স্থানেই রসের সীমাকে ভাসিয়ে অদৃশ্য ক'রেছে। দুই তটরেখার মধ্যে কূলে কূলে পূর্ণ নদীর যে রূপ তা এ কাব্যে কচিৎ দেখা যায়। কারণ বন্যা যখন নেমে গেছে তখন জল শুকিয়ে চর দেখা দিয়েছে, যেমন 'টেনিসনের' কাব্যে। রবীন্দ্রনাথের অনতিপূর্ব্ববর্ত্তী বাঙ্গলা কাব্য-সাহিত্যে এই ইংরেজী কাব্যের ভাবাতিশয্যের প্রভাব অতিমাত্রায় ফুটে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথের কাব্য যে এ থেকে মুক্ত তার কারণ তাঁর প্রতিভার ধর্মবৈশিষ্ট্যের পরেই সংস্কৃত কাব্য-সাহিত্য, বিশেষ ক'রে কালিদাসের প্রভাব।

বলা বাহুল্য রবীন্দ্রনাথের উপর সংস্কৃত-কাব্যের প্রভাব কোথাও তাঁকে তার অনুকরণে রত করে নি। এ প্রভাব তাঁর প্রতিভার জারক রসে জীর্ণ হ'য়ে স্বতন্ত্র নব সৃষ্টির রস জুগিয়েছে। রবীন্দ্রনাথের কাব্যে সংস্কৃত-কাব্যের সুর, ধ্বনি, ভাব ছড়ান রয়েছে; কিন্তু তার আস্বাদ সংস্কৃত-কাব্যের স্বাদ নয়। নব প্রতিভার নবীন রসায়নে তা থেকে নূতন রসের সৃষ্টি হ'য়েছে।

২

রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি শ্রেষ্ঠ কবিতা সংস্কৃত কবি ও কাব্যের কবিতা, যেমন 'মেঘদূত', 'ভাষা ও ছন্দ', 'সেকাল', 'কালিদাসের প্রতি', 'কুমারসম্ভব গান'। এ কবিতাগুলি এক অভিনব কাব্য-সৃষ্টি। এগুলি কাব্য বা কবিকে শ্রদ্ধা, প্রীতি বা প্রশংসার অঞ্জলি নয়, যেমন কীট্‌স্‌-এর On Looking into Chapman's Homer, কি রবীন্দ্রনাথকে দ্বিজেন্দ্র, "যেদিন উদিলে তুমি, বিশ্বকবি, দূর সিন্ধু-পারে"। মন্ত্রের জপের কবির চিত্তকে রস-সমাহিত ক'রে

কাব্যের জন্ম দেয় ; এখানে কবি ও কাব্যের জগৎ রবীন্দ্রনাথের চিত্তকে ঠিক তেমনি রসাবিষ্ট ক'রে এই অভিনব শ্রেণীর কাব্যের জন্ম দিয়েছে। রবীন্দ্রনাথের 'মেঘদূত' কালিদাসের 'মেঘদূত' প'ড়ে কবি-চিত্তের আনন্দ-উচ্ছ্বাস নয়। মেঘদূত ও তার কবি রবীন্দ্রনাথের অনুকূল কবি-কল্পনাকে যে-দোল দিয়েছে এ তারি ফলে নতুন রস-সৃষ্টি। 'ভাষা ও ছন্দ' কবিতাও ঠিক তাই। বাল্মীকির রাম-চরিত রচনায় যে-কাব্যে রামায়ণের আরম্ভ, রবীন্দ্রনাথের কল্পনায় গ'লে তা এক নতুন রস-মূর্তি নিয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের এই শ্রেণীর কাব্য যে কোথাও সংস্কৃত-কাব্যের প্রতিচ্ছবি, তা মনে হয় না, মনে হয়, সম্পূর্ণ নতুন সৃষ্টি, তার কারণ, এসব কাব্যে কবির মন ও দৃষ্টি এখানেও রবীন্দ্রনাথের মন ও দৃষ্টির সীমারেখা নয়। তাঁদের কাব্যের পথেই রবীন্দ্রনাথের চোখ ও মন সেই বস্তু ও ভাবে গিয়ে পৌঁছেছে যা তাঁদের কাব্যের মূল উপাদান, এবং সেই উপাদানকে নিজের প্রতিভার ছন্দে ও রংএ নতুন ক'রে গ'ড়ে তুলেছে। 'মেঘদূত' কবিতার যে-অংশটা বাহ্যত কালিদাসের মেঘের যাত্রা-পথের সংক্ষেপ মাত্র সেখানেও এর পরিচয় পাওয়া যায়।—

" কোথা আছে
সানুমান আম্রকূট, কোথা বহিয়াছে
বিমল বিশীর্ণ রেবা বিন্ধ্য-পদমূলে
উপল-ব্যথিত-গতি, বেত্রবতী-কূলে
পরিণত-ফলশ্যাম জম্বুবনচ্ছায়ে
কোথায় দশার্ণ গ্রাম রয়েছে লুকায়ে
প্রস্ফুটিত কেতকীর বেড়া দিয়ে ঘেরা।"

এ মেঘদূত, কিন্তু ঠিক মেঘদূত নয়। কালিদাস আঙুল তুলে যে-দিকে দেখিয়েছেন, কবি সেই দিকেই চেয়েছেন, কিন্তু দেখেছেন নিজের চোখে। 'ভাষা ও ছন্দ' কবিতায়,—

" বীর্য্য কার ক্ষমারে করে না অতিক্রম,
কাহার চরিত্র ঘেরি' সুকঠিন ধর্ম্মের নিয়ম
ধরেছে সুন্দর কান্তি মাণিক্যের অঙ্গদের মতো,
মহৈশ্বর্য্যে আছে নম্র, মহা দৈন্যে কে হয়নি নত,

সম্পদে কে থাকে ভয়ে, বিপদে কে একান্ত নির্ভীক,
কে পেয়েছে সবচেয়ে, কে দিয়েছে তাহার অধিক,
কে লয়েছে নিজ শিরে রাজভালে মুকুটের সম
সবিনয়ে সগৌরবে ধরামাঝে দুঃখ মহত্তম,—"

রামায়ণের রামচরিত্রই বটে। কিন্তু আদিকাণ্ডের প্রথম সর্গে বাল্মীকি-নারদ প্রশ্নোত্তরের মধ্যে ঠিক এ জিনিষ পাওয়া যাবে না।

৩

মহাভারত, রামায়ণ ও পুরাণের প্রসঙ্গ ও উপাখ্যান রবীন্দ্রনাথের অনেকগুলি কাব্যের উপাদান। প্রাচীন ভারতবর্ষের এই বিশাল ও মহান সাহিত্য তাঁর কবি-চিত্তের অনেকখানি জুড়ে আছে। কিন্তু এখানেও তাঁর প্রতিভা যা সৃষ্টি করেছে তা নতুন সৃষ্টি। এইসব কাব্যে রবীন্দ্রনাথ রামায়ণ ও মহাভারতের অনেক সুপরিচিত পাত্র ও পাত্রীর উপর যে কল্পনার আলো ফেলেছেন তাতে মনে হয় যেন 'নতুন লোকে' তাদের সঙ্গে 'নতুন ক'রে শুভদৃষ্টি হ'লো'। 'গান্ধারীর আবেদন' ও 'কর্ণ-কুন্তী সংবাদে' রবীন্দ্রনাথ, ব্যাস যে-রসের সৃষ্টি করেছেন, তার ধারা ধ'রেই মহাভারতের এই চরিত্রগুলির একেবারে অন্তঃস্থলে পাঠককে নিয়ে গেছেন। গান্ধারী ও ধৃতরাষ্ট্রের মুখে রবীন্দ্রনাথ যে-সব কথা দিয়েছেন, কর্ণ ও কুন্তীকে দিয়ে যা বলিয়েছেন তার অনেক কথাই মহাভারতে নেই। কিন্তু সে-সবই যে মহাভারতের ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারী, কর্ণ ও কুন্তীর মুখের কথা তাতেও সন্দেহ নেই। এসব চরিত্রকে রবীন্দ্রনাথ নিজের কল্পনায় একেবারে আত্মসাৎ ক'রে নিয়েছেন। এবং তাঁর কাব্যে এদের নতুন কথা ও নতুন কাজ অত্যন্ত পরিচিত লোকের স্বাভাবিক কথা ও কাজ মনে হয়।

"হের দেবী পরপারে পাণ্ডব-শিবিরে
জ্বলিয়াছে দীপালোক—এপারে অদূরে
কৌরবের মন্দুরায় লক্ষ অশ্বখুরে
খর শব্দ উঠিছে বাজিয়া।"

মহাভারতে নেই। কিন্তু মহাভারতের যুদ্ধপর্ব্বগুলিতে আসন্ন যুদ্ধের যে ভীষণ-গম্ভীর রস পুনঃ পুনঃ ফুটে উঠেছে এ তারি রূপ।

'চিত্রাঙ্গদা' ও 'বিদায় অভিশাপ' মহাভারতের অতি সামান্য ভিত্তির উপর কবির সম্পূর্ণ কল্পনার সৃষ্টি। এই দুই কাব্যের যে-রূপ তার সঙ্গে মহাভারতের উপাখ্যান দুটির সম্পর্ক নেই। এখানে পৌরাণিক চরিত্র ও আখ্যান কবির কল্পনাকে জাগায় নি, কবির কল্পনাই এদের আশ্রয় করেছে। এ দুই জায়গায় তবুও গল্পের এক-একটা কাঠামো ছিল; কিন্তু রামায়ণের ঋষ্যশৃঙ্গের উপাখ্যান থেকে যে 'পতিতার' কল্পনা তা রবীন্দ্রনাথেই সম্ভব।

রামায়ণ ও মহাভারতের প্রসঙ্গ নিয়ে আধুনিক বাঙলায় কাব্য-রচনার কথায় স্বভাবতই মাইকেলের কথা মনে হয়। 'মেঘনাদ-বধ' ও 'তিলোত্তমা'র বাহ্যিক গড়ন, সংস্কৃত 'ক্ল্যাসিক' কবিরা পৌরাণিক উপাখ্যান নিয়ে যে-সব কাব্য রচনা করেছেন, ঠিক সেই গড়ন। এবং এই দুই কাব্যের অন্তরের মিলও ঐ 'ক্লাসিক' কবিদের কাব্যের সঙ্গে। পুরাণ থেকে আখ্যানবস্তু নেওয়া হয়েছে মাত্র, কিন্তু তার ঘটনা কি চরিত্র কবির চিত্তের রসের তারে খুব জোরে ঘা দেয় নি। কাব্য-সৃষ্টিতে কবি যে-কল্পনা এনেছেন তা পুরাণ-প্রসঙ্গকে অতিক্রম ক'রে পাঠককে রসের একটা সম্পূর্ণ নতুন লোকে নিয়ে যায় না। এ কাব্য পৌরাণিক আখ্যানের ঘরেই থাকে, কিন্তু 'পেইং গেষ্ট'। রবীন্দ্রনাথ থাকেন বাহিরে, কিন্তু তিনি ঘরের লোক। বাড়ী যখন আসেন তখন একবারে অন্তঃপুরে যেয়ে উপস্থিত হন। 'বীরাঙ্গনায়' বিদেশী কবির কল্পনার আদর্শে অনুপ্রাণিত হ'য়ে মাইকেল অতি স্বল্প পৌরাণিক সূত্র ধ'রে অভিনব রস-সৃষ্টি করেছেন। এ কাব্য 'চিত্রাঙ্গদা' ও 'বিদায়-অভিশাপের' সমশ্রেণীর কাব্য। যাদের যে তফাৎ সে হচ্ছে দুই বিভিন্ন প্রতিভার সৃষ্টির প্রভেদ।

৪

রবীন্দ্রনাথের কাব্য ভারতবর্ষের কাব্য-সৃষ্টির ধারায় সংস্কৃত কাব্যের পরম গৌরবের যুগের সঙ্গেই একমাত্র নিজেকে মিলাতে পারে। তাঁর কাব্য সেইজন্য তাঁকেই স্মরণ করায় যিনি রবীন্দ্রনাথের অপরূপ কল্পনার উজ্জয়িনীর রাজ-কবি ছিলেন না, কৈলাসের প্রাঙ্গণে মহেশ্বরের আপন কবি ছিলেন; যাঁর কাব্য-পাঠের শেষে নিজের কান থেকে বই খুলে গৌরী কবির চূড়ায় পরিয়ে দিতেন। রবীন্দ্রনাথ ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর কবি, কিন্তু তিনি কালিদাসের কালেই জন্মেছেন।
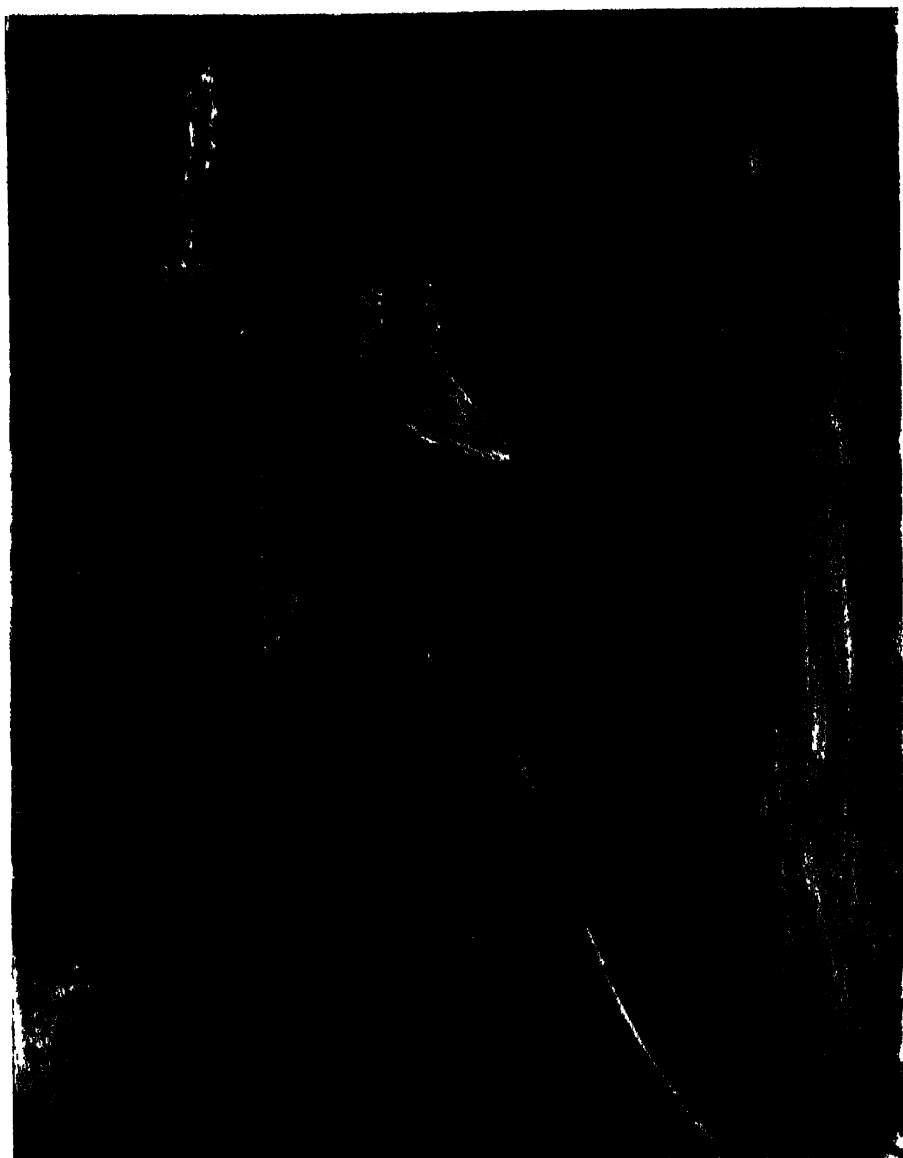
নিশ্চিন্ত নীল মোড়কে

রবীন্দ্রনাথের চিত্রশিল্প

●

বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়
জনিন ওবোয়াইয়ের
অনিলকৃষ্ণ ভট্টাচার্য
জীবেন্দ্রকুমার গুহ
শোভন সোম

●

রবীন্দ্রনাথের ছবি

রবীন্দ্রনাথ তাঁর দীর্ঘ জীবনে শিল্পসাহিত্য ও সঙ্গীত-চর্চার এক নিরলস ও একাগ্র সাধনার স্বাক্ষর রেখে গেছেন। ' সাহিত্য ও সঙ্গীত তাঁর আজীবন সাধনার বস্তু ছিল, কিন্তু শিল্পচর্চার ইতিহাস তাঁর জীবনে এক আকস্মিক অধ্যায়। তা যেমনি বিচিত্র, তেমনি অদ্ভুত। প্রায় পয়ষট্টি বৎসর বয়সে তিনি ছবি আঁকতে সুরু করেন এবং কয়েক বৎসর ধরে, অনেকটা যেন আত্মগত ভাবেই, অবিরাম ছবি এঁকে চললেন। তাঁর ছবি আঁকার ইতিহাস কারু অবিদিত নয়। সাত আট বৎসর ধরে এ যেন তাকে নেশার মত পেয়ে বসেছিল। সংখ্যার দিক দিয়ে ও বৈচিত্র্যের দিক থেকে এই স্বল্পপরিসরে তিনি ছবি আঁকার ক্ষেত্রে এক বিস্ময় সৃষ্টি করেছিলেন। তার সমগ্র ছবিগুলিকে কয়েকটি বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে সম্ভবত একটি সম্ভাব্য উত্তর পাওয়া যাবে এই প্রশ্নের যে, বিচিত্র ও অদ্ভুত হলেও, রবীন্দ্রনাথের ছবি তাঁর জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে বিচ্ছিন্ন নয়।

রবীন্দ্রনাথের ছবির সঙ্গে শিশুদের ছবির সাদৃশ্য লক্ষ্য করে কারু কারু মনে প্রশ্ন জেগেছে। সে-প্রশ্ন একেবারে অসঙ্গত নয়। বস্তুত যে বয়সে রবীন্দ্রনাথ ছবি আঁকতে শুরু করেছেন সে বয়স, সেক্স্পীয়রের ভাষায়, দ্বিতীয় শৈশব। পিছনে দীর্ঘ জীবনের দিকে চোখ ফিরিয়ে তাকালে যে-স্মৃতি স্বভাবতই সবচেয়ে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে তা শৈশবের। সেই স্মৃতি সেই আশ্চর্য অভিজ্ঞতা ও বিস্ময় শেষ বয়সে তার কাব্যে এক নতুন অর্থবহতায় আবিষ্ট হয়। আনন্দ কুমারস্বামী তার ছবি সম্বন্ধে বলেছিলেন সম্ভবত, 'not childish, but childlike'। এবং শিশুর ছবিতে যে অপর্যাপ্ত প্রাচুর্য তাঁর ছবিতে সে জিনিষ আবিষ্কার করা অসম্ভব নয়। যখন যেমনটি মনে এসেছে তাই এঁকেছেন—সে-অভিজ্ঞতাকেই ধরে রাখবার চেষ্টা করেছেন। রেখার কাজে প্রথমদিককার ছবিতে যে সহজ সাবল্য প্রকাশ পেয়েছে তাও শিশুদের ছবির সঙ্গে তুলনীয় হতে পারে। শিশু যেমন প্রাথমিক অভিজ্ঞতাকেই চরম অভিজ্ঞতা মনে করে থাকে তেমনি তাঁর ছবিতেও সেই অভিব্যক্তি প্রকাশ

পেয়েছে। তিনটি পায়ে দাঁড়ানো পাখীর ছবিতে তাঁব শিল্পকর্মের এক অনবদ্য প্রকাশভঙ্গি ও সত্যকার শিল্পবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। আরো একটা বিষয়ে তাঁর ছবি অনেক শিল্পরসিককে বিব্রত করেছে। বিশেষত পাশ্চাত্য কলাসমালোচকরা তাঁব উজ্জ্বল রং-এর ব্যবহার সম্বন্ধে বিস্ময় প্রকাশ করেছেন। প্রাচ্য চিত্রকলায় সাধারণত হাল্‌কা বং-এর ব্যবহারই ছবিতে সুষমা এনেছে এবং এবিষয়ে ভাবতবর্ষ জাপানী বা চীনদেশেব চিত্রকলাব এক সুসমঞ্জস ঐক্য দেখা যায়। রবীন্দ্রনাথেব ছবি এবিষযে ব্যতিক্রম বলে ধবা যেতে পাবে।

কোন কোন সময় তাঁব ছবির বিচাবে স্যুবিয়ালিষ্ট চিত্রেব প্রসঙ্গ আসা অসম্ভব নয়। আপাতদৃষ্টিতে কোথাও কোথাও মিল পাওয়া গেলেও আসলে স্যুবিযালিজমেব কোনো বিশিষ্ট লক্ষণ তাঁব ছবিতে আছে বলে আমাব মনে হয়নি। য়ুরোপে অন্তত যেভাবে এই চিত্রশিল্পেব বিশিষ্ট পবীক্ষানিরীক্ষা হযেছে তাতে শিল্পী তাব মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণেব দিকে সর্বপ্রথম নজর দিযে-ছিলেন এবং দ্বিতীয়ত, সচেতন মনেব বিভিন্ন প্রক্রিযাকে একটি বিশেষ লক্ষ্য অভিমুখে চালিত কবেছিলেন। ববীন্দ্রনাথেব চিত্রকলায় সেবকম কোন নির্দিষ্ট রূপাযণ আমরা লক্ষ্য কবিনা—যদিও তাঁব ছবিতে বিযালিজম্ এব সুস্পষ্ট চিহ্ন বর্তমান। তাঁব আঙ্গিকে ও রূপেব গঠনবীতিতে যে অদল-বদল ভাঙ্গচুব লক্ষ্য কবা যায তাব অন্তবালেও কোনো বিশেষ উদ্দেশ্য আছে বলে মনে হযনা—বরং সেগুলি তাব খেযাল-খুশীর নামান্তব মনে কবা যেতে পাবে। এপ্রসঙ্গে দুটি জিনিষ লক্ষণীয়। প্রথমত, তাঁব অঙ্কিত portrait গুলিতে শারীবিক অঙ্গপ্রত্যঙ্গেব যতই distortion থাক্ চোখ দুটি ববাববই স্বাভাবিক ছিল, দ্বিতীযত তাঁব figure painting এ কখনো হাতেব বা আঙ্গুলেব expression দেখতে পাওযা যাযনি। এই দুটি বিষযই আমাদেব অভিনিবেশ দাবী কবে। অবশ্য তাঁব ছবিতে নাটকীযতার অভাব নেই, আকস্মিকতা, তাঁব ছবিব একটি বিশেষ লক্ষণ, ইংবেজীতে যাকে আমবা sensation বলি সেই তীব্র অনুভূতির স্পর্শ তাঁব প্রায় সমস্ত ছবিতেই পাওয়া যায়।

যে সমস্ত মুখ তিনি এঁকেছেন তা সম্ভবতই জীবন থেকে, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে গ্রহণ করেছেন, শোনা যায কদাচিৎ ফটো থেকেও ছবি

এঁকেছেন, কিন্তু প্রতিবারই তাঁর সৃষ্টি নতুন ভাব আরোপ করেছে। প্রচলিত অঙ্কনরীতি অনুযায়ী আঁকবার চেষ্টা তিনি করেননি। তবু ল্যাণ্ডস্কেপ বা দৃশ্যাবলী আঁকবার সময় তাঁকে নিবিষ্ট ও প্রকৃত চিত্রকর বলেই মনে হয়েছে। যেসব ছবি তিনি এঁকেছেন তাতে প্রকৃতি ও মানুষ সম্বন্ধে তার ঘনিষ্ঠ প্রত্যয় সম্বন্ধে আমাদের কোনো সংশয় থাকে না—আমরা বুঝতে পারি, কবি রবীন্দ্রনাথ ও চিত্রকর রবীন্দ্রনাথে মূলত কোন প্রভেদ নেই, essential form এর সম্পর্কে তাঁর observation ও experience প্রচুর।

রবীন্দ্রনাথ নিজের ছবি প্রসঙ্গে বলেছেন—"In the process of this salvage work, I came to discover one fact that in the universe of form there is a perpetual activity of natural selection in line and only the fittest survives, which has in itself the fitness of cadence" তার কাছে শিল্পীর জগৎ হচ্ছে "The world of gesture" এবং "The universe has its own language of gesture I clearly see that the world is a great procession of forms."

সবশেষ কথা এই বলবার রয়েছে যে, তাঁর ছবিতে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্তই আশ্চর্য freshness দেখা যায়, অর্থাৎ চিত্রকলা শেষ পর্যন্ত তাঁর কাছে একটা আনন্দময় নেশার মতো ছিল, মনের নিরাকার থেকে অচিন্তিত-অভাবিত-পূর্ব আকার কখন কিভাবে জেগে উঠেছে, কিভাবে সেটা রেখায় রঙে ফুটে উঠেছে তার বিস্ময় তাঁর কাছে কখনো ঘুচে যায় নি।

বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়

চিত্রশিল্পী রবীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কবি ও সাহিত্যিক হিসাবে যত পরিচিত, চিত্রশিল্পী হিসাবে নিশ্চয়ই তত পরিচিত নন। তিনি যে ছবি ও রেখা চিত্র এঁকেছেন তাও কেউ অস্বীকার করতে পারেন না। কিন্তু তিনি যদি plastic arts এ (চিত্রশিল্প প্রভৃতিতে) মনোযোগ না দিতেন তাহলে তাঁর বিশাল ব্যক্তিত্ব

অসম্পূর্ণ থেকে যেত। যাই হোক তিনি চিত্রশিল্পে নিজেকে নিয়োজিত করেন অনেক বিলম্বে, প্রকৃতপক্ষে তিনি তাঁর ছবি আঁকার কাজ সুরু করেন যখন তাঁর বয়স ৬৭ বৎসর। এটা আশঙ্কা করা যেতে পারতো যে এত বিলম্বে যে ছবি আঁকার কাজ শুরু হোল সে ছবিগুলির ভেতরে যে প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যাবে তা চর্চার অভাবে কিঞ্চিত ম্লান এবং যে শিল্প রীতির পরিচয় পাওয়া যাবে তার ভেতরে সাহস অথবা নূতনত্বের কোন পরিচয় থাকবেনা। এইরূপ আশঙ্কা করার অর্থ রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার প্রকৃত বিস্তারকে ভুল বোঝা, যে প্রতিভার দ্বারা তিনি তাঁর জীবন ও তাঁর ধ্যান-ধারণার ভেতরে একটি সম্পূর্ণ ও সুষ্ঠু ঐক্যবিধান করতে পেরেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ ছিলেন প্রকৃত শিল্পী, সব রকম শিল্পকর্মে সাফল্য অর্জন করার মত আশ্চর্য্য প্রতিভা নিয়ে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন। কি ভাবুক কি দার্শনিক হিসেবে, কি কবি কল্পনার ক্ষেত্রে তাঁর ধারনা, তাঁর তত্ত্বদর্শন তাঁর জীবন উপলব্ধি প্রভৃতির সার্থক মিলন থেকে উদ্ভূত তাঁর সমগ্র সৃষ্টির আলোকে চিত্রশিল্পের প্রয়াস ও তাঁর প্রচেষ্টা আমরা অনুধাবন করতে পারি। চিত্রশিল্প সম্পর্কে গভীর অধ্যয়ন ও চিত্রশিল্প অঙ্কনে নিযুক্ত হওয়ার বহু পূর্বেই রং রেখা প্রভৃতির জগতে তাঁর কৌতূহল জাগ্রত হয়। শৈশবকাল থেকেই তিনি চিত্রশিল্পী ও চিত্র সমালোচকদের সংস্পর্শে আসেন। জোড়া-সাঁকোতে, তাঁর যে কলিকাতাস্থ পৈত্রিক আবাসে তাঁর শৈশব অতিবাহিত হয় বিদেশী চিত্রশিল্পীদের প্রায়ই সেখানে আগমন ঘটত। এঁরা রবীন্দ্রনাথের পিতার খ্যাতির দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে জোড়াসাঁকোতে আসতেন। এইভাবে বহু জাপানী শিল্পী সেখানে আসতেন এবং এমনকি তাঁরা সেখানে ছবি ও রেখা চিত্র অঙ্কন করতেন। এই সকল জাপানী শিল্পীদের মধ্যে ছিলেন কাকুজো ও ওকাকুরা, ইয়োহো ইয়ামা, তাইকোয়ান, সিমামুরা কোয়ানজান, জে, কাতসুতা, আরাইকাম্পো এবং আরও অনেকে। সতেরো বছর বয়সে তিনি যখন বিলেতে যান, তখন সেখানকার শিল্প সংগ্রহশালাগুলি তাঁকে মুগ্ধ করে এবং বিশেষ করে টার্ণারের শিল্পকর্ম তাঁকে অভিভূত করে। তারপর থেকে, যে দেশেই তিনি গেছেন সেই দেশেরই মিউজিয়ম এবং শিল্প সংগ্রহশালা গুলি সম্পর্কে তাঁর কৌতূহল সদাজাগ্রত থাকত এবং সেই দেশের কোন শিল্পীর সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ তিনি কখনও হারাতেন না। এইভাবে

১৯১২ সালে প্রসিদ্ধ ইংরাজ চিত্রশিল্পী উইলিয়ম রোদেনষ্টাইনের সঙ্গে তাঁর সখ্যতা জন্মে এবং জর্ণ, উইগল্যাণ্ড, রোজাঁ, আলবেয়ার বেস্‌নার, বুরদেল—এপষ্টাইন, বোন, ষ্টার্জ মুর, জন, অর্পেন প্রভৃতির শিল্পকর্ম সম্পর্কে তাঁর কৌতূহল জাগ্রত হয়।

বহুদিন থেকেই রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতির বিভিন্ন বস্তুর পেনসিল স্কেচ ও কালির দ্বারা অলঙ্করণের উপযোগী কিছু কিছু স্কেচ করেছেন, এই সকল স্কেচ আঁকার কাজে তিনি কলম ও তুলি উভয়ই ব্যবহার করতেন। এই সকল স্কেচকে তিনি এক ধরণের লেজার বইএ একত্রিত করেন, এই খাতাটি ছিল কালো চামড়ায় সুন্দর ভাবে বাঁধাই করা। তিনি ভারতের প্রাচীন রাজপুত ও মোগল শিল্পীদের আঁকা চিত্রগুলি অধ্যয়ন করেন, ১৯১৩ সালে তিনি প্রকৃতির অনুকরণে কয়েকটি পোর্ট্রেট আঁকেন, ১৯১৫ সালে তিনি গ্রাম ও পল্লী অঞ্চলের কয়েকটি দৃশ্য অঙ্কন করেন এবং প্রাচীন ভারতের শিল্প-সম্পর্কিত বিভিন্ন পুঁথি ও পুস্তিকার শ্রেণীবিভাগ শুরু করেন।

১৯১৬ সালে যখন তিনি জাপানে যান তখন তাঁর সঙ্গে তরুণ শিল্পী ও তাঁর ছাত্র মুকুল দেকে সঙ্গে নিয়ে যেতে মনস্থ করেন। জাপানে তিনি সেই সময়কার সবচেয়ে খ্যাতিসম্পন্ন চিত্রশিল্পী ইওকোইয়ামা তাইকোয়ানের আতিথ্য স্বীকার করেন। আদর্শ ও শিল্পরীতির ক্ষেত্রে জাপানী চিত্রশিল্প ইউরোপীয় চিত্রশিল্পের থেকে বহুলাংশে পৃথক। জাপানে অবস্থানকালে সে সকল জাপানী চিত্রশিল্পের বহু নিদর্শন তিনি অবলোকন করেন। তাঁর শিল্পীজনোচিত রুচি ও বিবেক এতই সূক্ষ্ম ছিল যে তিনি ইয়কোহামাতে চৈনিক ও জাপানী চিত্রশিল্পের রীতি ও বিভিন্ন যুগের নিদর্শনগুলি অধ্যয়ন করবার জন্য তিন মাস অতিবাহিত করেন, যদিও টি, হারার প্রসিদ্ধ সংগ্রহশালা পরিদর্শনের জন্য কয়েকদিন মাত্র ইয়কোহামাতে তাঁর থাকবার কথা ছিল।

১৯১৭ সালে জাপান থেকে প্রত্যাবর্ত্তনের পর তিনি শান্তিনিকেতনে একটি শিল্প বিদ্যালয় (কলাভবন) প্রতিষ্ঠা করতে মনস্থ করেন। ১৯১৮ সালে এই বিদ্যালয়ের কাজ আরম্ভ হয়। ১৯২০ সালে এই বিদ্যালয়ে তিনি একটি প্রতিযোগিতা প্রবর্ত্তন করেন। এই প্রতিযোগিতায় তিনি অংশ গ্রহণ করেন এবং এর বিচারকও ছিলেন তিনি। দশ বছরের মধ্যে এই বিদ্যালয় অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও নন্দলাল বসুর পরিচালনায় ভারতের অন্যতম প্রসিদ্ধ কলা বিদ্যালয়ে

পরিণত হয়। অবনীন্দ্রনাথ ও নন্দলাল বসুর কথা আমরা পরে বলছি। কলাভবনে ভারতীয় নবজাগরণে সকল ধারাকেই স্থান দেওয়া হয়েছিল এবং সম্পূর্ণরূপে বিভিন্ন শিল্পাঙ্কনের কায়দা সকল সেখানে শিক্ষা দেওয়া হত। প্রাচীরচিত্র অঙ্কনের পদ্ধতিও সেখানে শিক্ষা দেওয়া হত। এখানে একটি গ্রন্থশালা এমনকি একটি লোক সংস্কৃতির মিউজিয়ামও স্থাপিত হয়।

রবীন্দ্রনাথ নিজে ১৯২৮ সাল থেকে আরও অভিনিবেশ সহকারে চিত্রাঙ্কণে নিযুক্ত হন। তখন থেকে তাঁর রেখাচিত্র স্কেচ ও ছবির সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। এমনকি ১৯২৮ সালের জুলাই মাসে কলিকাতা সরকারী আর্ট স্কুলে তিনি শিক্ষানবিশি করেন এবং সেখানে গভীর মনোযোগ সহকারে শিল্পের বিভিন্ন শাখা অধ্যয়ন করেন। ধীরে ধীরে তিনি তাঁর লেখার কলম ফেলে রেখে শিল্পীর তুলি ব্যবহার করতে আরম্ভ করেন।

ফ্রান্সের মধ্য (Midi) অঞ্চলে কয়েকজন ফরাসী শিল্পীকে তাঁর ছবিগুলি প্রদর্শন করতে মনস্থ করেন। এই প্রদর্শনী তাঁর দেশবাসীদের কাছে একটি অপ্রত্যাশিত আবিষ্কারের মত ছিল, কেননা তাঁদের নিকট রবীন্দ্রনাথ জাতীয় কবি হিসাবেই সমধিক পরিচিত ছিলেন। ঐ বৎসরই ১১ই জুন তারিখে লণ্ডনে ইণ্ডিয়া সোসাইটির সভ্যদের নিকট তিনি তাঁর কয়েকটি রেখাচিত্র উপস্থিত করেন এবং সেগুলিকে ব্যাখ্যাও করেন। জুলাই মাসে, ১৯২৮ ও ১৯৩০ সালের মধ্যে অঙ্কিত তাঁর কয়েকটি জলরংএর ছবি বার্লিনের ফার্ডিনাণ্ড মোলার গ্যালারীতে প্রদর্শিত হয়। নভেম্বর মাসে আনন্দ কুমারস্বামী রবীন্দ্রনাথের আরও কতগুলি জলরংএ আঁকা ছবি নিউইয়র্কে 56th ষ্ট্রীটস্থ চিত্রশালায় প্রদর্শন করেন।

এতাবৎকাল স্বদেশে তিনি তাঁর ছবিগুলি প্রদর্শন করেন নি। ১৯৩২সালে ফেব্রুয়ারী মাসে সরকারী আর্ট স্কুলে তাঁর ২৬৫টি শিল্পকর্মের নিদর্শন একত্র করা হয়। এর ভেতরে ছিল রেখাচিত্র, রঙিন ছবি, কাঠখোদাই, মৃৎশিল্পের নিদর্শন এবং চামড়ার বিভিন্ন ধরণের রঙিন কাজ। তখন রবীন্দ্রনাথের বয়স ছিল ৭১ বৎসর। যদিও আমরা বলেছি যে রবীন্দ্রনাথ সারা বিশ্বের প্রাচীন ও সমসাময়িক চিত্রশিল্প বহুবার গভীরভাবে সমীক্ষণ করেছিলেন, এবং ইউরোপীয় ও দূর প্রাচ্যের শিল্পরীতিগুলি তিনি গভীর অভিনিবেশ সহকারে অধ্যয়ন করেছিলেন, তথাপি তাঁর শিল্পকর্মের মধ্যে উপরোক্ত শিল্পকর্মগুলির কোন চিহ্ন আমরা প্রত্যক্ষ করিনা।

তাঁর তুলি সাবলীল সহজ এবং নিঃসংশয়। রেখাগুলি বিশুদ্ধ দীর্ঘ বক্র ভঙ্গিমায় প্রসারিত; রেখাগুলি আশ্চর্য্য সৌষ্ঠবের সঙ্গে যাত্রা শুরু করে দীর্ঘায়িত ছন্দে সুপ্রসারিত। (যে কোন বিষয়ই হোক না কেন, হতে পারে তা পত্রিকার নিকৃষ্ট কাগজ, তার প্রতি তার শিল্পদৃষ্টি ছিল নিরপেক্ষভাবে সজাগ,) এবং তিনি তরল রংএ জলরং, ও জলে গোলা গদ ও মধু মিশ্রিত রংএর ব্যবহার পছন্দ করতেন। কিন্তু প্যাষ্টেল, রং রঙীন খড়ি ও কালির ও ধাতুলিপি প্রভৃতির ব্যবহারের সূচীশিল্পেও তিনি নিপুণ ছিলেন। মাধ্যম হিসাবে তিনি বিভিন্ন বস্তুর ব্যবহার করেছেন, এবং এই সকল বস্তুর গুণাগুণ তিনি প্রাক্ রোণেশাঁসী শিল্পীদের মত অধ্যয়ন করেছেন। প্রায়ই তিনি কয়েকটি পুষ্পসার পছন্দ করতেন। মসৃণ ও উজ্জ্বল করবার মাধ্যম হিসেবে তিনি বিভিন্ন ধরণের তৈল, বিশেষ করে নারিকেল ও সরিষার তৈল ব্যবহার করতেন।

প্রাচ্যের রীতি ও ধারা অনুযায়ী তিনি চিত্রাঙ্কন করতেন, অর্থাৎ প্রথমে তিনি চিন্তা করতেন, তারপরে চিন্তা সুনির্দ্দিষ্ট আকার গ্রহণ করার পর, দ্রুতহস্তে রেখার পর রেখা সাজাতেন এবং অবশেষে রেখাঙ্কনের উপর রংএর প্রলেপ দিতেন।

তাঁর শিল্পরীতি সম্পূর্ণভাবে তাঁর নিজস্ব, আশ্চর্য্যরকম নিরাড়ম্বর, স্বতঃস্ফূর্ত, বাস্তব কোন নিয়মের প্রতি সম্পূর্ণরূপে নির্বিকার, তাঁর এই নিজস্ব শিল্পরীতি সকল রকম যুক্তিপ্রয়াস ও প্রকৃতিনিষ্ঠা অপেক্ষা যা বোঝা যায় না, যা রহস্যে ঘেরা, যা অস্তিত্বের গহনের ব্যঞ্জনাময় দ্যোতক, উদ্‌ঘাটন যার মধ্যে এবং ব্যক্তিসত্ত্বা ও ব্যক্তিমানসের প্রাধান্য স্বীকৃত তার প্রতি অধিকতর আগ্রহশীল। তাঁর শিল্পকর্মের অভিনবত্ব এতই প্রখর (বিশেষ করে যে যুগে এই শিল্পকর্মের আবির্ভাব) যে তার সঙ্গে কোন কিছুরই তুলনা করা চলে না। তাঁর শিল্পকর্ম যেন শূন্যে বিধৃত, যার সঙ্গে অতীতের কোন যোগ নেই এবং যার কোন সম্ভাব্য ব্যাখ্যা নেই।

প্রকৃতপক্ষে এই শিল্পকর্ম বিশুদ্ধ সৌন্দর্য্যের প্রেমে মগ্ন সৎ, অনুসন্ধিৎসু এবং আদর্শবাদী এক সত্বার অন্যতম বহিঃপ্রকাশ। আজকের দিনে বিভিন্ন আধুনিক তত্ত্বের ও সম্প্রদায়ের দ্বারা যেহেতু আমরা বহুধা বিভক্ত, সেহেতু এই শিল্পকর্মকে গ্রহণ করা আমাদের পক্ষে অধিকতর সহজ। তাঁর শিল্পকর্মের

ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা ও নৈর্ব্যক্তিকতার সঙ্গে উইলিয়াম ব্লেকের শিল্পকর্মের কিছু কিছু সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়, কেননা এক আপাত আরল্যের মধ্যে, তাঁর কাব্যে রূপায়িত কবির প্রতীকী কল্পনা ও চিন্তা, এবং তাঁর প্রেমের গভীর তত্ত্ব সুক্ষ্মভাবে তাঁর শিল্পকর্মেও ধরা পড়ে। তাঁর অধিকাংশ চিত্রেরই কোন শিরোনামা নেই, তাঁর ছবিগুলি সম্পর্কে তিনি নিজে যা বলেছেন, ছবিগুলি বাস্তবিকই তাই, ছবিগুলির মধ্যে যা তিনি প্রকাশ করতে চাননি তা অনুসন্ধান করা নিতান্তই অনাবশ্যক, তাঁর ছবিগুলির সুনির্দিষ্ট একটি অর্থ করার প্রয়োজন নেই; কারণ এরকম কোন অর্থ করতে শিল্পী নিজেই অস্বীকার করেছেন। ছবিগুলি সোজাসুজি "কতকগুলি স্বপ্ন যাদের অমর করা হয়েছে," ছবিগুলি তাঁর কতগুলি চিত্রায়িত কবিতা। "যদি দৈবাৎ তারা স্বীকৃতি লাভ করে এবং যদি তাদের মর্ম মর্য্যাদা পায়, তাহলে তা হবে তাদের ছন্দের জন্য, তাদের কোনো সঠিক অর্থ আছে বলে নয়···তাদের কাজ প্রকাশ করা, ব্যাখ্যা করা নয়" উপরন্তু রহস্য করে তিনি আরও বলেছিলেন "তার পুষ্পসত্তার দর্শন কি? একথা কি কেউ বকুলফলকে জিজ্ঞেস করে? যখন তোমরা বকুল ফুলটি দেখ তখন তোমরা তার সৌন্দর্য্যের দ্বারা আনন্দিত হও। ফুলটির উপস্থিতি এবং তার গুণ থেকেই তোমাদের বিস্ময় ও আনন্দের উদ্ভব, ফুলটির কোন অর্থ থেকে নয়।"

তাঁর নিজের শিল্পকর্মের স্ব-কৃত বিচারের সঙ্গে সাধারণভাবে শিল্প সম্পর্কে তাঁর ধারণার সম্পূর্ণ মিল আছে। এই ধারণা আবার ভারতীয় ঐতিহ্য অনুসারে, "শিল্প হচ্ছে মায়া, হয়ে-ওঠার চেষ্টা ছাড়া শিল্পের অন্য কোন ব্যাখ্যা নেই। এই যে আবির্ভাব, এই যে হয়ে-ওঠার চিরন্তন লীলা তার রহস্যঘন প্রকাশের মাধ্যম হচ্ছে ছন্দ। আলোক হচ্ছে ছন্দ, শব্দ হচ্ছে ছন্দ, জীবন হচ্ছে হ্রাস বৃদ্ধির নিরবচ্ছিন্ন ছন্দ, যা আছে, এবং যা নেই তাদের মধ্যে লুকোচুরি খেলা, বাস্তব ও অবাস্তবের ঝিকিমিকি" কিন্তু শিল্পকর্মকে রবীন্দ্রনাথ যতই উচ্চে স্থান দিননা কেন, একজন খাঁটি ভারতীয়ের মত তিনি সঙ্গীতকেই সর্বোচ্চ স্থান দিয়েছেন, কেননা তিনি আবারও বলেছেন, "চিত্রকরের ক্যানভাসে তুলি এবং রঙের প্রয়োজন আছে। তুলির প্রথম স্পর্শ চিত্রকরের সমগ্র কল্পনার ধারে কাছে পৌঁছয় না। ছবিটি যখন সম্পূর্ণ হয় এবং শিল্পী যখন বিদায় নেয় তখন ছবিটি বিধবার মত নিঃসঙ্গ ও একাকী,

কারণ স্থষ্টিশীল হাতের সপ্রেম ও নিরবচ্ছিন্ন স্পর্শের তখন অবসান ঘটেছে" সঙ্গীতকার তাঁর সঙ্গীতের সঙ্গে অচ্ছেদ্য ভাবে জড়িত, এবং তুলনা করে বলা চলে "বিশ্ব সঙ্গীতের থেকে একমুহূর্তের সঙ্গীতকার বিযুক্ত নয়, তাঁরই আনন্দ নিরবচ্ছিন্ন ভাবে আকার গ্রহণ করছে এ হচ্ছে সেই বৃহৎ হৃদয় যার স্পন্দনের দ্বারা গগন শিহরিত হচ্ছে"। সুতরাং "সঙ্গীতই হচ্ছে বিশুদ্ধতম শিল্প, সৌন্দর্য্যের সর্বাপেক্ষা প্রত্যক্ষ প্রকাশ এই কারণেই যাঁরা "প্রকৃত কবি, যাঁরা দ্রষ্টা তাঁরা বিশ্বকে সঙ্গীতের ভাষার মাধ্যমে বোঝাতে চেয়েছেন।"

প্রতীচ্যের অধিবাসী আমাদের নিকট গুরুত্ব অনুযায়ী বিভিন্ন শিল্পে শ্রেণী-বিভাগ নিঃসন্দেহে নিরর্থক বলে মনে হয়। কিন্তু এই শ্রেণীবিভাগে ভারতবর্ষ আবহমান কাল ধরে ব্যাপৃত রয়েছে, এর বিভিন্ন কারণের মধ্যে প্রধান হচ্ছে ধর্মগত ও এমনকি আদিম আচারগত, যার সঙ্গে আলোকের সম্পর্ক আছে, সেই ধ্বনির স্থান বিভিন্ন শিল্পের সর্বপ্রথমে, যদিও কখনো কখনো কোন কোন গ্রন্থে চিত্রশিল্পকে শ্রেষ্ঠ শিল্পের মর্য্যাদা দেওয়া হয়েছে। তাহলেও রবীন্দ্রনাথের পক্ষে এই শ্রেণীবিভাগ কিছু পরিমাণে প্রাচীন ঐতিহ্যের প্রভাবের ফল ও কিছুটা স্বতঃস্ফূর্ত। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সর্বোপরি একজন সৌন্দর্য্যরসিক এবং সর্বদাই তিনি তত্ত্বগুলিকে একটি বিশ্বজনীন রূপ দেবার চেষ্টা করেছেন, "সৌন্দর্য্য সর্বত্রই বিদ্যমান এবং সকল বস্তুই আমাদের আনন্দ দিতে সক্ষম, যখন আমরা সৌন্দর্য্যকে আরো ভালো করে চিনতে শিখব তখন যাকে আপাতদৃষ্টিতে আমাদের ছন্দপতন বলে মনে হয় সেগুলি আমাদের কাছে ছন্দের বিলম্বিত লয় বলে ধরা দেবে··· ·অবশেষে সমগ্রের সঙ্গে এদের ঐক্য আমরা উপলব্ধি করব।" কারণ "সৌন্দর্য্যই সত্য, সত্যই সৌন্দর্য্য"।

তাছাড়া রবীন্দ্রনাথ চিত্রকর হিসেবে তাঁর স্থান সরল ও পরিচ্ছন্নভাবে ব্যক্ত করেছেন। "আঁকার ইচ্ছা হঠাৎ আমার মনে জাগ্রত হয়। আমি কেবলমাত্র এইটুকু বলতে পারি যে আমার প্রকৃতির গঠন হচ্ছে কবির, চিত্রকরের নয়। একটি ছন্দের দ্বারা শব্দ নিযে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত; একটি বাস্তব সত্তার ন্যায় তাদের অর্থ তাদের মধ্যে নিহিত আছে এই অর্থকে স্থষ্টিশীল আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। শব্দ নিয়ে কি বলতে চাইছে তার গুরুত্ব যৎসামান্য। তাদের মধ্যে এমন কিছু আছে যা আমাদের চৈতন্যকে

ডাক দেয, তাদেব একটি বাস্তব সত্তা আছে, তাদের একটি মূল্য আছে, তাদেব আছে একটি অন্তিম বাস্তবতা এবং তাবা চিবন্তনেব ছাপ নিজেদের মধ্যে বহন কবে। শব্দ নিয়ে পাবস্পবিক ছন্দোময় সম্পর্কের মধ্যে তাবা এমন একটি সমগ্র পূর্ণতা সৃষ্টি কবে যে, তাদেবকে আমাদেব আপন সত্তার একটি অংশ ছাড়া আব কিছুই আমবা ভাবতে পাবিনা। পদ্যের পংক্তিগুলি অমবত্ব লাভ কবে তখনই যখন একটি মহৎ কাব্যের ন্যায তাদেব থেকে একটি সম্পূর্ণ সুসঙ্গত ঐক্য প্রকাশিত হয। ভাবেব বাস্তবতা কাব্যেব উৎকর্ষেব মধ্যে নিহিত থাকে। অন্তিম বস্তুসত্তা এই সকল ভাবেব মধ্যে বিদ্যমান থাকে ; তাদেব মধ্যে থাকে এমনই একটি মূল্যবোধ চিন্তাব অন্তবালে যাকে লক্ষ্য কবা যায এবং এমনই একটি মৌলিক গুণ যা নিজ মধ্যস্থিত গুণের ন্যায অথবা প্রকাশিত ভাবেব ন্যায কোন অর্থজ্ঞাপক। সঙ্গীতেবও এই অলৌকিক গুণ আছে , পবস্পবেব সঙ্গে বিযুক্ত হলে ধ্বনিব আব কোনই অর্থ থাকেনা। ধ্বনিগুলি যখন একটি পূর্ণাঙ্গ ঐক্য অনুযাযী সুসজ্জিত হয তখনই তাদের মূল্য থাকে। এই ঐক্য একটি চিবন্তন ঐক্য একটি গুণ যার কোনদিন কোন পবিবর্তন হবেনা। ক্রমশই আমার কাছে একথা স্পষ্ট হচ্ছে যে, সাবা জগতকেই জীবন ও সৃষ্টিব ঐক্য বলে বিবেচনা কবা যেতে পাবে। ছবি আঁকাব মধ্যে আমি গভীব বস্তুসত্তার প্রকাশের মাধ্যম খুঁজে পেয়েছি এই আবিষ্কাব আমাকে গভীব আনন্দ দিয়েছে"।

ববীন্দ্রনাথেব চিত্রকলা সুতবাং একটি বুদ্ধিগ্রাহ্য কাজ যা সহজাত প্রবৃত্তিব রূপান্তবেব খুব কাছাকাছি। ববীন্দ্রনাথের শিল্পকর্ম তাঁব আধ্যাত্মিক বিবর্তনের একটি অন্তিম অধ্যায়েব ন্যায এবং প্রকাশেব একটি পবিপূবক বিকাশ হিসেবে আবির্ভূত হয়। তাঁব শিল্পকলা তাঁর বিশ্ব সমীক্ষাব অন্তর্গত ; জাতীয় এবং মানবিক কাজের সঙ্গে, তাঁর লক্ষ্য এবং তাঁব নৈতিক তত্ত্বের সঙ্গে এই শিল্পকলার সঙ্গতি বর্তমান , "আমাব উদ্দেশ্য এই যে, আমাদের বিদ্যালয় (শান্তিনিকেতন) একটি আনন্দেব ধাবায় যেন গ্রামগুলির শুষ্ক জীবনকে সরস করে তোলে। এব জন্যে শিক্ষক, কবি, সঙ্গীতকার, শিল্পী সকলকেই সাহায্য কবতে হবে। যাবা বিনিময়ে কিছু না দিযে জনগণের জীবন থেকে রস আহবণ করে তাদের মত স্বার্থপব হওযা এদের চলবে না।"

যেহেতু ববীন্দ্রনাথ তাঁর নিজেব জন্যে চিত্রবিদ্যার অনুশীলন করেছিলেন,

এবং যেহেতু তাঁর শিল্পরীতি হল তাঁর সম্পূর্ণ নিজস্ব সেহেতু শিল্পী হিসাবে তাঁর কাজ এতেই তিনি সীমাবদ্ধ করেন নি। তাঁকে আমরা কলাভবন প্রতিষ্ঠা করতে দেখেছি এবং সযত্নে শিল্পবিদ্যায় পাঠ গ্রহণ করতে দেখেছি। এর কারণ এই যে বিভিন্ন শিল্পবিদ্যা তাঁর দার্শনিক এবং সামাজিক পরিকল্পনার মধ্যে স্থান পেয়েছিল এবং যেহেতু তাদেরকে তিনি সংস্কৃতি ও জাতীয় উন্নতির একটি শক্তিশালী উপায় হিসাবে গণ্য করেছিলেন।

কেবলমাত্র ৭০ বছর আগে ভারতবর্ষে চিত্রবিদ্যার অনুশীলন ছিলই না বলা চলে। মধ্যযুগের এবং প্রাচীন শিল্পের সৃষ্টিমুখর যুগের সঙ্গে আধুনিক যুগের একটি দুস্তর ব্যবধান ছিল। মোগলদের রাজনৈতিক পতনের পরে শিল্পবিদ্যার সাতিশয় ক্রমাবনতি ঘটে চলেছিল, যতদিন পর্যন্ত না ইয়োরোপীয় প্রভাব ছড়িয়ে পড়েছিলো যখন জেসুইটরা পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে আকবরকে একখণ্ড বাইবেল উপহার দিতে আকবরের রাজসভায় আগমন করেন, তখন থেকেই ইয়োরোপীয় প্রভাব ভারতে প্রবেশ করতে আরম্ভ করে। জেসুইটরা তাঁদের সঙ্গে যীশুখ্রীষ্ট ও মেরীর যে সমস্ত ছবি আনয়ন করেন, অতিথিদের সম্মানার্থে, সেগুলির নকল করবার জন্য সম্রাট আকবর তাঁর নিজের শিল্পীদের আদেশ দেন। জেসুইটরা ইয়োরোপীয় স্থাপত্যরীতি অনুযায়ী তাঁদের গীর্জাগুলি নির্মাণ করেন। গোয়ার গির্জার অলঙ্করণের ভার তাঁরা ভারতে সমাগত সর্বপ্রথম ইংরাজদের অন্যতম চিত্রশিল্পী জন ষ্টোরির হাতে দেন। প্রতীচ্যের সঙ্গে এই সকল যোগাযোগের ফলে মোগল শিল্পের ঐতিহ্যে কোনও পরিবর্তন ঘটে নি। কিন্তু শাহাজানের রাজত্বের পরে মোগল রীতির মধ্যে পশ্চিমী প্রভাবের পদার্পন আমরা দেখতে পাই। এই প্রভাব বিশেষ করে লক্ষ্ণৌর শিল্পী গোষ্ঠীর মধ্যে এবং দিল্লীর শিল্পীগোষ্ঠীর হাতীর দাঁতের উপর কারুকার্য্যের মধ্যে লক্ষ্য করতে পারি। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে রাজপুত শিল্পীগোষ্ঠীর মধ্যে পশ্চিমী প্রভাবের পালা এল। এই প্রভাব বিশেষ করে ছড়িয়ে পড়লো শিখ-শাসিত সমতল ভূমিতে। তারপর কাংড়া শিল্পীগোষ্ঠীর উপর যে ইয়োরোপীয় প্রভাব পড়ে, তা ঊনবিংশ শতব্দীর প্রারম্ভ পর্য্যন্ত বর্তমান থাকে। হিমালয়ের ক্ষুদ্রতর পর্বতশ্রেণীর মধ্যে অবস্থিত বলে কাংড়া ছিল অধিকতর দুর্গম।

বিশেষভাবে চিত্রকর রবিবর্ম্মার দ্বারা প্রবর্তিত এক ধরণের সাংস্কৃতিক

অভিযান গোটা উনবিংশ শতাব্দী ধরে ভারতীয় চিত্রবিদ্যাকে ইয়োরোপীয় চিত্রকলার বুদ্ধিহীন দাসমনোভাবসম্পন্ন অনুকরণে নিয়োজিত করে। নূতন কিছু প্রবর্তন করার নামে, ভারতীয় চিত্রবিদ্যায় নতুন প্রাণ সঞ্চরণের অজুহাতে চিত্রকরেরা চিত্রশিল্পকে বিকৃত করতে সক্ষম হন। এবং ঘৃণ্য কতগুলি আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে স্থানীয় শিল্পী সম্প্রদায়গুলির সৃষ্টিকে উপহাসাস্পদ করে তোলেন। অনুপ্রেরণার উৎস থেকে বিযুক্ত হয়ে এবং নূতন আচরণের জন্য প্রয়োজনীয় যথেষ্ট শক্তি না থাকায়, স্থানীয় শিল্পী সম্প্রদায়গুলি অক্লান্তভাবে ক্রমাগত অবনতিশীল চিরাচরিত রীতির পুনরাবৃত্তি করতে থাকে।

যে পশ্চিমী চিত্রকলার আঙ্গিক ও নিয়মের সঙ্গে ভারতের আশা ও ঐতিহ্যের কোনও সঙ্গতি ছিলনা, সেই পাশ্চাত্য শিল্পকলার অনুকরণের মধ্যে ভারতীয় চিত্রকলার বিলুপ্তি ঘটার সম্ভবনা ছিল। উনবিংশ শতাব্দীর শেষে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এক ভ্রাতুষ্পুত্র ভারতীয় চিত্রবিদ্যাকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য এবং ভারতীয় চিত্রবিদ্যার আত্মসম্বিত ফিরিয়ে এনে তাকে মুক্ত ও স্বাধীন করার চেষ্টা সুরু করেন। এই আন্দোলনের সঙ্গে জাতীয় পুনর্জাগরণের সম্পূর্ণ সংগতি ছিল। এই জাতীয় পুনর্জাগরণে ঠাকুর পরিবার অংশ গ্রহণ করেন। ১৯০৫ সালে Indian Society of Oriental Art এর প্রতিষ্ঠার দ্বারা এই আন্দোলন প্রভূত শক্তিশালী হয়। এই সংস্থার অধিকাংশ সভ্য ছিলেন ইয়োরোপীয়, তবুও এই সংস্থা ভারতের পুনরুজ্জীবনের কাজে নিযুক্ত হয়। অবনীন্দ্রনাথ তাঁর শিক্ষকদের নিকট যে সকল শিল্পরীতি শিক্ষা করেছিলেন, সেগুলির প্রভাব থেকে তিনি নিজেকে ধীরে ধীরে মুক্ত করেন। তিনি পশ্চিমী শিল্প কৌশল ও আঙ্গিক বর্জন করেন, ভারতের সনাতন বিষয়গুলিতে প্রত্যাবর্তনের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিতে থাকেন। প্রাচীন ভারতীয় চিত্রবিদ্যা অধ্যয়নকে প্রশংসা করতে আরম্ভ করেন। তাঁর উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য তিনি কলিকাতার সরকারী আর্ট স্কুলের পরিচালক ই বি হ্যাভেলের নিকট যথেষ্ট উৎসাহ পান। জাতীয়তাবাদী ভারতবর্ষের সমর্থনে হ্যাভেল সাহেবের কাজকর্ম ছিল পরম মূল্যবান সাহায্য। লর্ড কিচেনার, স্যার জন উডরফ, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় এঁদের সঙ্গে যোগ দেন। অবনীন্দ্রনাথ প্রথমে গভর্মেণ্ট আর্ট স্কুলের সহকারী পরিচালক ও পরে ভারতীয় সৌন্দর্য্য বিজ্ঞানের অধ্যাপক নিযুক্ত হয়ে বিভিন্ন রচনা ও প্রদর্শনীর মাধ্যমে তাঁর প্রচারকে

আরও প্রসারিত করেন। ১৯০৮ সালে Indian Society of Oriental Art এর প্রথম বাৎসরিক প্রদর্শনীতে প্রায় একশত জল রংএ আঁকা ছবি ও তৈল চিত্রের সমাবেশ হয ; ১৯১০ সালে এলাহাবাদে প্রাচীন চিত্রকলার এক আলোচনা আবম্ভ হয় , ১৯১৪ সালে প্যারিসে তাঁব ছাত্রদের সঙ্গে তাঁর চিত্রগুলিব এক প্রদর্শনীব উদ্‌বোধন কবেন। এই চিত্রকরদেব "ক্যালকাটা স্কুল" এই আখ্যা দেওযা হয়, এই আখ্যা আজ পর্য্যন্ত বর্তমান।

প্রতি বছব ভারতীয চিত্রবিদ্যাব উন্নতি স্পষ্টতব হতে থাকে এবং ভাবতবর্ষে বিভিন্ন প্রদেশে বিদ্যালয় স্থাপিত হতে থাকে। প্রাচীন ঐতিহ্যে সম্পূর্ণ প্রত্যাবর্তনেব পব, পুরোধাব প্রতি একনিষ্ঠ আনুগত্য প্রদর্শনেব পব, জাপানী শিল্পবীতিব সুস্পষ্ট অনুকবণেব পব, শিল্পীবা নিজেদেবকে অধিকতব স্বাধীন ভাবে প্রকাশ করতে আরম্ভ কবেন এবং আরও খোলাখুলি নিজেদেব ব্যক্তি-সত্তাব মধ্যে অবগাহন কবতে থাকেন। স্থানীয় জীবনেব চিত্ররূপ অপেক্ষা তাঁরা ব্যক্তিমানসে অবগাহন ও ব্যাক্তিমানসেব স্বচ্ছন্দ প্রকাশেব প্রতি অধিকতব অনুবক্ত হন। তাঁবা আভ্যন্তবীণ সমীক্ষাব উপব জোব দিতে থাকেন এবং বেখাকেই প্রকাশেব প্রধান উপায বলে ব্যবহাব কবেন। হিন্দু ও মুসলমান বহু নবাগত মহিলা ও পুরুষ শিল্পী তখন থেকে গভীর নিষ্ঠা সহকাবে তাদেব শিল্পকে উন্নত কবাব কাজে ব্যাপৃত থাকেন। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন তাঁদেব প্রবক্তা এবং তাঁব লেখা পডতে পড়তে ববীন্দ্রনাথ শিল্পেব প্রতি গুরুত্ব আরোপ কবেছিলেন তা আমবা ভালভাবে বুঝতে পাবি : "আমরা ভাবতীয়বা বস্তু নিচযে বাহ্য আকবকে অঙ্কন কবিনা, আমবা যে সকল ভাবের প্রভাবাধীন তাদেব অনুকবণে আমবা ছবি আঁকি এবং আমরা আমাদেবকে আঁকি। শিল্প ছাড়া আমবা বাঁচতে পাবিনা, শিল্পীব সঙ্গে স্রষ্টাব সখ্য রয়েছে। যিনি সৃষ্টিকে আকাব দেন, শিল্পী তাঁবই পবিপূবক।"

অবনীন্দ্রনাথ এবং ববীন্দ্রনাথেব চিন্তার মধ্যে হুবহু মিল আছে। যদি তাঁরা প্রাচীন ঐতিহ্যে প্রত্যাবর্তনকে প্রশংসা কবে থাকেন তবে তার কারণ এই যে এই ঐতিহ্যগুলি ভারতীয় মেজাজের সঙ্গে পুবোপুবি তাল রেখে অনুপ্রেরণাব উৎস হিসেবে কাজ করতে পাবে। যদি তাঁবা প্রাচীন গ্রন্থের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন কবে থাকেন তবে এই শ্রদ্ধাব থেকে জাত যান্ত্রিক অনু-করণের বিপক্ষেও তাঁরা লেখনী চালনা করেছেন। কিন্তু অবনীন্দ্রনাথ যেমন

কেবলি শৈল্পিক পুনরুজ্জীবনের জন্য সংগ্রাম করেছেন, ববীন্দ্রনাথেব কাজ ছিল উচ্চতব ও ব্যাপকতব স্তরে। তাঁব দার্শনিক কাব্যিক ও শৈল্পিক ধ্যান-ধাবণাগুলি একটি অর্থবহ অবিভাজ্য সমগ্র রূপ ধারণ করে। একটি প্রতিভা কিভাবে তাঁব জাতিব সমস্ত গুণাবলীকে নিজেব মধ্যে মূর্ত কবতে পাবে ববীন্দ্রনাথ তাব একটি মহৎ নিদর্শন। যাতে তাব দেশবাসীবা তাঁর রুচিব তাঁর দার্শনিক আশাবাদ এবং তাঁব সূক্ষ্ম ও প্রাণবন্ত মবমী আচবণের স্তরে উন্নীত হতে পাবে তাব জন্যে ববীন্দ্রনাথ মহৎ সংগ্রাম কবেছেন। তাঁব অসাধাবণ গুণাবলীব সাহায্যে তিনি তাঁব স্বকীযতাকে সংবক্ষণ কবতে পেবেছিলেন। এই স্বকীযতা তাঁব চিত্রকলাতে সবচেয়ে বেশি প্রত্যক্ষ। তাঁব ছবিগুলিব মাধ্যমে তিনি তাঁব স্বদেশী শিল্পীদেবও পথ প্রদর্শন কবেছেন। এই পথ হল তাঁদেব স্বদেশেব প্রাচীন ঐতিহ্যেব সঙ্গে নিজেদেবকে যুক্ত কবা, নিজেদেব স্বতন্ত্র ব্যাক্তিসত্তাকে সংবক্ষণ কবা। কিন্তু তাঁদেব মধ্যে কে ববীন্দ্রনাথেব সমতুল্য সূক্ষ্ম অনুভূতিব সাহায্যে পৃথিবীব বিভিন্ন দেশের কাব্য অনুধাবন কবেছেন, এবং কেই বা স্বচ্ছ দৃষ্টি সমন্বিত সততাব সঙ্গে এই বিশ্বাসে উপনীত হয়েছেন যে "মানুষেব বিশ্বজনীন ব্যক্তিসত্তাব সম্পর্কে সচেতনতা, যা শিল্পীব মধ্যে প্রত্যক্ষ এবং পবোক্ষভাবে বর্তমান, তাই শিল্পেব মহৎ প্রকাশ-গুলিতে বিদ্যমান এবং তাই এভাবে কমবেশী চিরন্তনতাব পর্যাযে পৌঁছয়।"

জনিন ওবোয়াইয়ের

মূল ফবাসী থেকে সুনীল মুখোপাধ্যায কর্তৃক অনূদিত

রবীন্দ্র চিত্রদর্শন

বাজাপুব থেকে কুমিল্লা শহব ন'মাইলেব বেলপথ। তখন আমার বালক বয়স, দাদামশাইর সঙ্গে এই পথে প্রাযই রেলে চড়ে শহব দেখতে যেতাম। যেতে যেতে জানলা দিযে বাইরের দিকে তাকিয়ে থেকে বেলেব শব্দ শুনতাম, —খট্‌খট্‌-খট্ ঠকাশ্, আব মনে একটা ঘোর লাগত। মনে পড়ে বেলের শব্দের সঙ্গে তাল মিশিয়ে কতগুলি যা-খুশী-তাই অর্থহীন বুলি আওড়াতাম

আজ মনে হচ্ছে রেলের শব্দ সেই বোল্ বাজাচ্ছে: এই বেলা খেলতে খেলতে কখন শহরে এসে গাড়ী থামত জানতেও পারতাম না।

আজ চল্লিশ বছর বাদে রেলের বোল্ আর আমার খুশির হারানো সুর ধরা পড়ছে রবীন্দ্র-চিত্রাবলির ছন্দতালে।

যে চিত্রমালায় শিল্পীর ধ্যান ধারণার হদিশ্ মেলেনা, যেখানে শিল্পী নির্জন নিরুদ্দেশে, সেই অজ্ঞাত লোকের জলবাতাসে রবীন্দ্রচিত্রমালা রসসিঞ্চিত। মনে হয় বিশ্বের বিস্তীর্ণ প্রান্তর অতিক্রম করে হু হু করে এক রেলগাড়ী ছুটে চলেছে, তার গবাক্ষপথে শিল্পী চেয়ে আছেন দিগন্তে, প্রকৃতি (nature) তাঁকে বোল দিচ্ছে আর তিনি তার বুলি যোগাচ্ছেন অবলীলাক্রমে, তার অর্থ অনর্থ শিল্পীর মনকে বিন্দুমাত্রও ভারাক্রান্ত করেনি।

সাহিত্যের যে কোন ক্ষেত্রেই বিচার করা যাক না কেন, রবীন্দ্রনাথ পৃথিবীর অবিস্মরণীয় বিস্ময় হয়ে আছেন। তাঁর সৃষ্টির ছায়াপথে আগেকার শতাব্দী-সমূহের সাহিত্যপ্রয়াস বিগত-উত্তাপ ও বিবর্ণ হয়ে উঠেছে। তাঁর কাব্যলোকের বিস্তৃতি আমাদের যুগকে অতিক্রম করে একাধিক উত্তরপুরুষের উদ্দেশ্যে কল্যাণ-মন্ত্র উৎসারিত করে দিয়েছে। যে জীবন-দেবতা চিন্তা ও বাণীর অগোচরে থেকে মানুষের জীবনে অসংখ্য মুহূর্তে অসংখ্যভঙ্গীতে নিজেকে প্রকাশ করে চলেছেন, রবীন্দ্র-কাব্যসৃষ্টিতে অভাবিত এবং অবারিত রূপতরঙ্গে তাই উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। হৃদয়বীণার সব কটা তার সবরকম মূর্ছনায় তরঙ্গায়িত হয়ে রয়েছে তাঁর লেখনীর স্পর্শে। রসসৃষ্টির বাঙ্‌ময়ী রূপে রবীন্দ্রনাথ ভাস্বর হয়ে রইলেন চিরকালের জন্য।

কিন্তু ভাষারও অতীত যে লোক, ছন্দ ও সুর যে সমুদ্রবেলাপ্রান্তে গিয়ে প্রতিহত হয়ে ফিরে আসে, আনন্দ-সমুদ্রের দিক্‌চক্রবাল যেখানে মনকে কেবল দুরাশায় টানে, রসসৃষ্টির সেই অজানাতীরের ডাক শুনলেন কবি। পাণ্ডুলিপি-সংশোধনের বিচিত্র রেখাজালের অন্তরাল থেকে নিঃশব্দে পরিগ্রহ করলো অরূপা অনামা রূপব্যঞ্জনা, রবীন্দ্রচিত্রে নিঃসীম মহাশূন্যের নিরাসক্তি নিয়ে কবি নির্বাক হয়ে রইলেন, কেউ জানলো না কবির নতুন রসভাণ্ডারের সন্ধান।

কবির এই শিল্পপ্রয়াসের পরিচিতির দায়িত্ব সম্পর্কে কবির মৌনতা অতিক্রমণ অল্পদিনে হয় নি। শিল্পী নিজে কোনদিন কিছু বলেন নি। আজ সেই দায়িত্ব নিয়েছেন দেশবিদেশের বিশিষ্ট কলাবিদগ্ধ পণ্ডিতসমাজ। অগণিত

সৃষ্টিতে তারাক্রান্ত সেই শিল্পপ্রয়াস বিস্তৃত নয় ; একটি ছোট সীমায়িত ক্ষেত্র সোনায় ফসলে ঝলমল কবছে। কী বিচিত্র ফসল! আজ ডাক পড়েছে, সেই ফসলকে ঘরে তুলে আনতে হবে। লক্ষ্মীর ঝাঁপিতে আহরণ করে রাখতে হবে আগামীকালের জন্ম এই সঞ্চয়। উৎসবেব প্রাচুর্য্যে বহুজনেব নিকট বিতরণ কবতে হবে এই বিত্ত। শিল্পসমালোচকবা এগিয়ে এসেছেন এই দায়িত্ব বহন করবার জন্যে।

আমি সমালোচক নই , শিল্পবিচারেব প্রচলিত ধাবায আমি রবীন্দ্র-চিত্র মানসের রসসন্ধান বা গবেষণা কবতে অক্ষম। শিল্পেব প্রচলিত কোনও ধাবা অনুসবণ কবে রবীন্দ্রনাথেব আঁকা চিত্রগুলি রূপায়িত হয় নি। বিশেষ কোনও আঙ্গিককে নির্ভর করে এবা বিশিষ্ট হযে ওঠে নি। কবিমানসেব কোনও কাব্যধর্মী প্রকাশ-ব্যঞ্জনায এবা ভাবাক্রান্ত নয। এই চিত্রাবলীতে প্রচলিত শিল্পনৈপুণ্যেব পবিপ্রেক্ষিতে যে সংশয় সম্ভাবনা দোলে, সেইখানেই এই রঙীন বচনাবলীব বহস্যলোকের রসভাণ্ড। সেই বহস্য-উৎসেব সন্ধান যেন কোনও অজ্ঞাতলোকে ভীরু নিরুদ্দেশ যাত্রা। সেই জন্যেই মনে হয রবীন্দ্রচিত্রের মর্মকথা শিল্প-বৈযাকবণিকেব নিকট চিবকাল হতাশাই বহন কবে আনবে। কিন্তু তবু এই শিল্পেব বিচিত্রতাব সম্মুখীন হযে সামগ্রিক দৃষ্টিপাত কবলেই উপলব্ধি হবে কবিব অবিবত প্রবহমান জীবনে এই শিল্পসম্ভাবনা এতকাল কোথায় অবলুপ্ত ছিল। এই উপলব্ধি থেকে মিলবে শিল্পবিচাবেব সন্ধান। কিন্তু সেই উপলব্ধি আমাদের বর্তমান শিক্ষা বা শুধু সংস্কৃতি-গবিমায সম্ভবপর নয়। আধুনিক শিক্ষাব দৃষ্টিভঙ্গীতে যে কোনও মহৎসৃষ্টিব বহস্য বা মহত্ত্ব ধবা পড়ে কোনও বিশেষ সংস্থাপনা-সঙ্গতি বা কোনও সঙ্গত কাবণকে উপলক্ষ্য কবে—যা সেই মহৎসৃষ্টিব বিষয়বস্তু এবং উপকবণকে আশ্রয় কবে বয়েছে। বিভিন্নকালেব শিল্পকলা বা অন্যান্য বসসৃষ্টির মূলগততত্ত্ব, বিশেষ কবে আধুনিক কালেব যে কোন শিল্পবীতির অন্তর্নিহিত সত্য এবং তার বসসঞ্চার হয়েছে এর ওপরে। কিন্তু ববীন্দ্রনাথের শিল্পলিপি সেই আদর্শে আধুনিকও নয় বা আদিমকালেও নয়। ববীন্দ্রনাথেব আঁকা ছবি কাব্য বা সাহিত্যোদ্ভূতও নয়। তাই, সাহিত্য কাব্য বা চারুকলাব প্রচলিত আদর্শে এর বিচাব চলবে না। সামাজিক ও দৈনন্দিন জীবনেব অভ্যস্ত পরিবেশের কোনও সাদৃশ্য বা বৈসাদৃশ্যে তা'র আবেদন ধরা পড়ে না।

আমরা জানি চিত্রের প্রথম প্রতিপাদ্য বিষয় তা'র বিষয়বস্তু বা তা'র আঙ্গিক। তারপর ভাব ও অনুভূতি অনুযায়ী আঙ্গিকগত সংস্থাপনা বা কম্পোজিশন্। এই সংস্থাপনাকর্ম বুদ্ধিসাপেক্ষ উদ্‌ভাবনী শক্তির উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। শিল্পীর এই বোধ কবিশক্তির অনুগামী নয়। রবীন্দ্রনাথ স্বভাবতঃ কবি; কিন্তু তাঁর আঁকা ছবিতে কোথাও দেখা দেয়নি তাঁর কবিতার কোনও বিশদীকরণ। অবশ্য তিনি একদা বলেছিলেন, "My pictures are verses in lines"। কিন্তু কবির এই উক্তি তাঁর সারা জীবনব্যাপী কবিত্বের প্রতি মমত্ববোধেরই অপরিহার্য্য প্রকাশ বলে মনে হয়। এ শুধু তাঁর চিত্র-বিশ্লেষণের স্বীকারোক্তি নয়। পৃথিবীর যে-কোন যুগের আসনে তিনি শ্রেষ্ঠ গীতিকার; নাটক, প্রবন্ধ, ছোটগল্প, উপন্যাস, সমালোচনা, হাস্যরস,—সাহিত্যের প্রতিটি ক্ষেত্রেই তাঁর গতি সচ্ছল এবং তাঁর অবদান শ্রেষ্ঠ। এই বহুমুখী সাহিত্য-সাধনা তাঁর সৃষ্টিকে সার্থকতার মোহনায় নিয়ে গিয়েছে। তাঁর কাব্যপ্রতিভার প্রবাহ জীবনের প্রান্তরকে প্লাবিত করে বয়ে চলেছিল। কিন্তু অগোচরে, বাণী-অর্চনার আর একটি প্রবাহ ধীরে ধীরে উৎস থেকে বেরিয়ে এসেছে। নিস্তরঙ্গ নিরুদ্বেল তা'র প্রবাহ। স্থির এবং অবারিত সাধনায় চলেছিল তা'র অগ্রস্মৃতি। সে হচ্ছে তা'র চিত্র-শিল্প সাধনা। গগনেন্দ্রনাথের সাধনা কবিকে বিমোহিত করেছে, অবনীন্দ্র-নন্দলালের বিচিত্র রূপদৃষ্টি তাঁকে প্রসন্ন করেছে, কিন্তু নিজের কাব্যসাধনার মতো অভিভূত করে নি। সেই জন্যই, কোনও পূর্ব-স্মরীর অধিগত পন্থানির্দেশ তিনি গ্রহণ করেন নি। কোনও শিল্পসাধকের রেখাজাল বা প্রকাশ-ভঙ্গিমায় তিনি আবদ্ধ হন নি। তবে, এটা স্বীকার করতেই হবে যে কখনও কখনও তার শিল্পরেখায় বিদেশী আধুনিক আঙ্গিকের কিছুটা আভাস পরিস্ফুট হয়েছে। রবীন্দ্র-চিত্রকলা বুঝতে হলে রবীন্দ্রপ্রতিভার আলোতেই বুঝতে হবে, চিরাচরিত কোনও নির্দেশ মাধ্যমে নয়।

আগেই বলেছি, রবীন্দ্র-চিত্রশিল্পের বীজ আত্মগোপন করেছিল এবং দেখা দিয়েছিল তাঁর Calligraphy বা পাণ্ডুলিপির সংশোধনের রেখাবৈচিত্র্যের মধ্যে। এই রেখাজালের ভিতর থেকে কখনও বা প্রস্ফুট হয়ে উঠেছে কোনও জীবজন্তু পাখী বা মানুষের রূপাভাস, যে রূপ বা আকার না দেখা যায় মাটিতে না আকাশে। অকারণ হৃদয়াবেগের অনিবার্য্য প্রকাশ এবং, মানস-আনন্দ-লোকের অশরীরি কল্পনা। আদিম শিল্পীরা ছিলেন Representational

এবং Realistic, কিন্তু অঙ্কণ-নৈপুণ্যে দুর্বল। এই শ্রেণীর শিল্পীদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সমতা নেই। তিনি রেখা সৃষ্টি করেছেন প্রাণের উদ্বৃত্ত আনন্দে, যে আনন্দ কোন কিছুকেই আশ্রয় না করেও উৎসারিত হয় অকারণে। সে আনন্দ লোক এক অচিন্ত্য জগৎ, যেখানে জীবধাত্রী ভিন্নরীতিতে নিজের সংসার পেতেছেন, সে জগতের পাখী-পশুর আকৃতি প্রকৃতি সবই অন্যরকমের, যার সঙ্গে আমাদের কোন পরিচয় কোনকালে নেই। এই চিত্ররচনার রেখাগুলি শিথিল, নম্র। আদিমকালীন শিল্পকে যাঁরা আধুনিকতায় উন্নীত করেছেন, সেই শিল্পীরা form এবং pattern-এর সুরুচিসম্পন্ন Composition বা সংস্থাপনায় কুশলক্রিয়াকর্মী। কিন্তু, বলতে বাধা নেই যে আদিমকালীন শিল্পের আদলে যা আজকাল আঁকা হচ্ছে তা আধুনিকতার কঠোর mannerism এর রুদ্ধশ্বাসে মৃতপ্রায়। রবীন্দ্রনাথ আধুনিকতার কিম্খাবে মুড়ে আদিমশিল্পকে পরিবেশন করেন নি। তাঁর চিত্রাবলীতে দেখতে পাই এক প্রাণ-সঞ্চারিনী ইঙ্গিত, যার তুলনা নেই।

একটি কবিতায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন,

"বিস্মৃত যুগে গুহাবাসীদের মন
যে ছবি লিখিত ভিত্তির কোণে
অবসরকালে বিনা প্রযোজনে
সেই ছবি আমি আপনার মনে
করেছি অন্বেষণ।"

এখানে 'বিনা প্রয়োজনে' কথাটি ভোলা যায় না। এই বিনা প্রয়োজনের ডাক বহুযুগের ওপার থেকে শিল্পীর কানে পৌঁছেছে। তা না শুনে উপায় নেই, উপায় নেই না দেখে। কিন্তু এ হচ্ছে সর্ব-সংস্কারমুক্ত প্রত্যক্ষদর্শন, বোধ এবং বিচারের অন্তরাল থেকে যে দর্শন আত্মপ্রকাশ করে থাকে।

রবীন্দ্রনাথের চিত্ররচনায় একটা জ্যামিতিক ব্যঞ্জনার আভাষ পাই, জ্যামিতিক রহস্যের অস্ফুট প্রকাশে যা মধুময়। কখনও কখনও দেখা যায় Picassoর চিত্ররচনাতে একটা গাণিতিক বিন্যাস, যাকে কেউ কেউ বলেছেন Poetry of mathematics। পিকাসোর গণিত-বিকাশের আদর্শে কিন্তু রবীন্দ্রনাথ জ্যামিতিক চিত্রশিল্পী নন।

চিত্রলিপির প্রথম ছবি—

"কঠিনের বুকে টানা
করুণের ছবি
বর্ণপটভূমিকায়
দেখেছিল কবি।"

এ চিত্রে জ্যামিতিক রেখাবেষ্টনী, কাঠিন্যের প্রকাশ সুপরিস্ফুট। কিন্তু কী আশ্চর্য্য করুণ মুখ। পাষাণের অন্তর দ্রবীভূত হয়ে এ শান্ত সুন্দর এক লক্ষ্মীশ্রী। পিকাসোর নিয়মানুগত জ্যামিতির দৃষ্টি এখানে পাষাণে প্রতিহত হয়ে এক কঠিন প্রতিধ্বনির সৃষ্টি করত। যেখানে পিকাসোর দৃষ্টিতে কঠিন এবং করুণ পরস্পরবিরোধিতায় স্ব স্ব আসনে অবস্থিত, সেখানে রবীন্দ্রনাথ পাষাণকে কুসুমের কোমলতায় রূপান্তরিত করেছেন। পিকাসো ও রবীন্দ্রনাথের চিত্র সমগোত্র নয়।

আধুনিক রূপদক্ষের দৃষ্টি পরিচিতকে অস্বীকার করে চলে যায় বস্তুর অতীত এক অবাস্তবে, অবচেতন রসলোকে,—যেখানে অজ্ঞাত কুলশীলেরা চলাফেরা করে অন্য আদলে, কথা কয় ইসারায়। সে দৃষ্টিতে সৃষ্টি হোল অদ্ভুত রবীন্দ্রচিত্রাবলী। যে অদ্ভুত জন্তুর ছবিটিকে এঁকে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

"আপনাকে জানেনা সে, সেই তার হয়েছে বন্ধন,
অসম্পূর্ণ চিত্তসাথে বিজড়িত প্রাণের স্পন্দন।
এই দুঃখে দিনে রাতে
অগোচরে আছে সাথে
মূঢ় মূক জন্তুর ক্রন্দন।"

চিত্রলিপির সেই অজ্ঞাত অ-দৃষ্ট জন্তুর বেদনাক্লিষ্ট কান্নার অসহায় ধ্বনি অরণ্যে অরণ্যে প্রতিহত হয়ে মনকে বেদনাবিহ্বল করে তোলে। মনে হয় অপরূপ রঙ-সজ্জা অশ্রুজলে সিক্ত হয়ে আছে।

রবীন্দ্রনাথ বহির্জগতের অপরিহার্য্য অন্তররহস্য উদ্‌ঘাটন করতে চেয়েছিলেন, যেমন চেয়েছিলেন জার্মান শিল্পী Kandinsky, Klee, Marc এবং Nolde। কিন্তু এঁদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গী বিভিন্ন। Kandinsky শুদ্ধ এবং সম্পূর্ণ abstraction-এ বিশ্বাস করেছেন, Klee'র ছিল স্বপ্নরাজ্য আর Marc শুনেছেন পৃথিবীর এক অশ্রুতপূর্ব সুরধ্বনি, যে সুরে সমগ্র জীবজগৎ ও অরণ্যানী মোহাচ্ছন্ন। Marc-এর কানে কানে প্রকৃতি যে গোপন রহস্যের

কথা বলেছিল, Marc সেই রহস্যকে তুলিতে এঁকেছেন প্রতলিপির মত। তাঁর বিখ্যাত চিত্র Blue Horse-এ দেখি সাধারণ অশ্বেরই দেশান্তরিত জাতির ছবি। বর্ণান্তরিত হয়েও নিজ জাতির সধর্ম বিসর্জন দেয় নি। রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিও একই অনুভূতিতে উদ্বুদ্ধ হয়েছে, কিন্তু সার্থকতর হয়ে। রবীন্দ্রনাথের তিন মানুষমূর্তি ধরা যাক,—

> "ঘটনায় বেদনায় মানুষে মানুষে চিরকাল
> সাদা কালো সুতো দিয়ে চারিদিকে বোনা হয় জাল।
> সে জালে পড়িছে গাঁথা অসংখ্য রহস্য ইতিহাস
> জানিনা জগৎজোড়া কেন এ প্রকাশ অপ্রকাশ।"

রবীন্দ্রনাথের এই ত্রিমূর্তি মানুষ ভাব (manness) রূপে রূপায়িত। কুশলী Marc এর তুলিতে যে রূপপ্রকাশ, রবীন্দ্রনাথের কালিকলমের আঁচড়েও সেই প্রকাশ সার্থক হয়ে উঠেছে। মনে হয়, এই প্রকাশ শুদ্ধ ও সঙ্গত হয় accessories এর সংযত ব্যবহারে। রবীন্দ্রনাথ Composition এর দিক থেকেও এই সত্য উপলব্ধি করেছিলেন। বস্তুবাদের দিক থেকে এ চিত্র শুদ্ধমাত্র অনুকরণ নয়, এ চিত্রের message হচ্ছে বাস্তবের স্বতঃপ্রকাশের ছন্দোবদ্ধ স্বয়ংসম্পূর্ণতা,—যে message শিল্পীর মনের অবচেতনে সুপ্ত থাকে। অকস্মাৎ শিল্পীকে মোহাবিষ্ট করে দিয়ে এই বাণী তাঁর অন্তরের গভীর থেকে বেরিয়ে আসে, কিন্তু তার কোন আভাসই মেলেনা প্রকাশের আগে।

১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে জার্মানীতে এক নূতন শিল্পীগোষ্ঠির চিত্রপ্রদর্শনী হয়, বর্তমান যুগের 'আধুনিক' চিত্রাবলীর উদ্বোধন বলা যায় একে। চেতন-অবচেতনের, abstract এবং Constructional form-এর সংমিশ্রণ এবং পারম্পর্য্য এই প্রদর্শনী থেকেই বিশিষ্ট হয়ে ওঠে। এই শিল্পীগোষ্ঠীর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ কতকাংশে সমধর্মী, এক এক সময় মনে হয়, যেন রবীন্দ্রনাথের অঙ্কন-প্রতিভা জার্মানশিল্পীদের বলিষ্ঠ অঙ্কনরীতিকেও ছাড়িয়ে গিয়েছে। এই সব ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের ছবির আঙ্গিক গৌণ, কিন্তু নির্ভীক ও নির্দোষ।

Marc এই নবশিল্পী গোষ্ঠীর আদর্শ সম্পর্কে বলেছিলেন,—"We are today seeking behind the veil of Nature's outward appearance hidden things which seem to us more important than the discoveries of the impresssionists We are seeking and painting this spiritual side of ours in Nature, not out of whim

or for the joy of being different, but because we see this side just as formerly people suddenly 'saw' violet shadows and the atmosphere over all things It seriously believed that we new painters do not obtain out form from Nature, that we do not wrest it from Nature just as all artists in all ages have done Nature glows in our pictures as in every form of art Nature is everywhere, in us and outside us, there is only one thing that is not altogether nature, but rather the overcoming and interpreting of Nature Art Art always has been and is in its very essence the boldest departure from Nature and naturalness It is the bridge into the spirit world the necromancy of the human race"

ইয়োরোপীয় আধুনিক শিল্পীর এই প্রকৃতির interpretation রবীন্দ্রনাথের চিত্রাবলীতে এক আশ্চর্য্য স্বকীয়তার সাক্ষ্যস্বরূপ। রবীন্দ্র-চিত্রাবলীতে তাই আমরা দেখতে পাই আঙ্গিকহীন শিশুমনের অকুণ্ঠ উল্লাস।

কোনও কোনও পণ্ডিত অবশ্য বলেছেন, যে-সুসংহত শব্দ সমাবেশে কবিরা তাদের কবিতা লেখেন, শিল্পীর সাধনাও তেমনিই রেখা ও রঙের সুবিন্যস্ত সংস্থানেই হওয়া উচিৎ। বিখ্যাত চীন দেশীয় লেখক লিন-ইউ-তাং তাঁর My Country and my people গ্রন্থে লিখেছেন, "Poetry and Painting come from the same human spirit and the inner technique of both should be the same. The painter shows the same impression, the same emphasis on an indefinable atmosphere and the same pantheistic union with nature, which characterize Chinese poetry For the poetic mood and the picturesque moment are often the same and the artist mind which can seize the one and give it form in poetry, can also with a little cultivation express the other in painting"

চৈনিক লেখকের এই মত চৈনিক কবিতা, চৈনিক এবং জাপানী ছবি সম্বন্ধে সম্পূর্ণভাবেই প্রযোগযোগ্য। চৈনিক চিত্রের symbolic expression এবং stylisation চৈনিক কবিতায় লক্ষণীয়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে এই মতবাদ প্রযোজ্য নয়। তা যদি হোত তাহলে উর্বশীর নৃত্যছন্দ লীলায়িত হয়ে উঠত তাঁর আঁকা ছবিতে, ধরা পড়ত বর্ষশেষের অস্তরাগমুখর আকাশের রং। সমগ্রজীবনব্যাপী কাব্যসাধনার ঐশ্বর্য্যগুলির মতো রূপায়িত হয়ে উঠত

বিশ্বভারতীর সৌজন্যে

অজস্র চিত্রসম্পদ। রবীন্দ্রনাথের সম্পর্কে বলা যায়, যে কথা কবিতার, সে কথা শিল্পের নয়।

রবীন্দ্রচিত্রপ্রতিভা সম্পর্কে অবনীন্দ্রনাথের কথা এখানে উল্লেখ করছি :—

His art had something volcanic about it It came out like a volcanic eruption—all that had been accumulated in the past and its very impetus gave it form, its very force shaped its course Pause for a moment to complete the immensity of his genius Literature, poetry and music were not enough for its full play, but it must perforce find an outlet through line and form and colour, in his old age in order fully to realise itself He was like a volcano nursing in his bosom the accumulated fire of countless ages till he could contain it no longer and allowed it to burst forth flooding the surroundings with molten art forms, as it were, and it was not till then that his urge for expression fulfilled itself It is not for every one to comprehend the process It is not easy to gather fire from the bosom of the volcano without an all compelling urge and an all consuming desire" এই urge রবীন্দ্রচিত্রকলায় দেখা দিয়েছে লাভাপ্রবাহের মতো। এক সর্বগ্রাসী দুঃসাহসিকতায় সৃষ্টি হোল নব নব রূপ। অভ্যস্ত ও আচরিত রীতিনীতি এই দুঃসাহসের গতিরোধ করতে পারে নি। দুঃসাহস যার প্রেরণা, তাকে বাঁধাধরা নিয়মের গণ্ডীতে আটকে রাখবে কে?

এই সম্পর্কে প্রতিমাদেবী লিখেছেন, "তিনি যখন ছবি আঁকতে আরম্ভ করলেন, সে যেন বন্যার মত তাঁর তুলির টানে বেরিয়ে আসত রূপের রেখায়। চার পাঁচখানা ছবি তিনি অনেক সময় দৈনিক শেষ করতেন, তবু যেন তা'র তৃপ্তি হোত না। সৃষ্টির প্রেরণায় হাতের কাছে যা পেতেন—যেমন ভাঙা কলম বা পেন্‌সিল, যা-তা কাগজের টুকরো—তাই দিয়েই হাত চলত। ভালো রঙের ধারও ধারতেন না, নানাপ্রকার জিনিষ নিয়ে চলত তাঁর আঁকা; অবশ্য পেলিক্যান কালিই বেশির ভাগ ব্যবহার করতেন।"

বিখ্যাত চৈনিক চিত্রকর Mi fei'র আঁকা ছবির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের অঙ্কন-রীতির একটা মিল দেখা যায়। লিন্‌-ইউ-তাং লিখেছেন, "Mi fei (মি ফেই) one of the greatest of scholar painters, sometimes used even a roll of paper for his brush or the pulp of sugarcane, or the

stalk of a lotus flower when the inspiration came and there was a magic in the scholar's wrist, there was nothing which seemed impossible to these artists For they had mastered the art of conveying fundamental rhythms, and everything else was secondary Painting was and still is the scholar's recreation"

মি কেই'র চিত্ররচনা অবসরবিনোদন কিনা বলতে পারি না, তবে রবীন্দ্র-চিত্রকলা কখনো তা নয়। রবীন্দ্রচিত্রাবলী শিল্পীমনের সত্যিকার সৃষ্টি। এই সূত্রে রবীন্দ্রনাথের বাণীই উধৃত করছি :—

"বিপুল বিশ্বের নিস্তব্ধতার মাঝে শব্দের জগৎ ক্ষুদ্র একটি বুদ্বুদমাত্র। অঙ্গভঙ্গীর ভাষাই হচ্ছে বিশ্বজগতের ভাষা—সে যখন কথা বলে, আপনাকে প্রকাশ করে, তখন তা করে ছবি ও নাচের ভাষায়। জগতের প্রত্যেক বস্তুই রেখা ও রঙের নীরব ভাষায় এই কথাই বলেছে যে, সে শুধু ন্যায়শাস্ত্রের পারিভাষিক শব্দমাত্র নয়—তা'র অস্তিত্বের অপূর্ব রহস্য তার নিজের ভিতরই বর্তমান—বাইরের কোন কিছুর ওপরেই তা নির্ভরশীল নয়।" এই উধৃতির মধ্যেই রবীন্দ্রচিত্রকলার মৌলিক তত্ত্বটি জানা যাবে। তাঁর শিল্পকলার বিকাশ হয়েছে রেখা ও রঙের ছন্দময় সামঞ্জস্যে। এই রূপদৃষ্টি সম্পূর্ণভাবেই ব্যক্তিনিষ্ঠ।"

তিনি নিজেই বলেছেন, "যে জিনিষ দেখে আনন্দ পেয়েছি—সেই আনন্দ সেই রস যখন অন্যের ভেতর চালনা করে দেওয়া যায় তখন তারেই বলে আর্ট। তা সে যে কোনও উপায়েই হোক না কেন।" আনন্দ পাওয়ার বিশ্লেষণ করা চলে না। ছবি সাহিত্য গান নৃত্য এসবের ভেতর দিয়ে মনের আনন্দ যে কোনো উপলক্ষ্যেই স্ফূর্ত হয়ে উঠতে পারে। ব্যবহারিক জীবনে হিসাব-নিকাশের মানদণ্ডে এই আনন্দ পাওয়ার মূল্য নিরূপণ হতে পারে না। আনন্দের উপকরণ ছড়িয়ে রয়েছে বিশ্বের সর্বত্র, প্রকৃতি ঋতু-উৎসব, গায়কের গান, শিল্পীর ছবি, কবির কাব্য, সব কিছুতেই আনন্দের সঞ্চার হয়, কেন হয়? —এ ব্যাখ্যা কে করবে? "আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে।" সুতরাং অকারণ উদ্ভূত আনন্দ-প্রেরণার সৃষ্টিতে কোন পরিচিত বাস্তবের সাদৃশ্যের মানদণ্ডে রসসৃষ্টিকে বিচার করে যারা শিল্পীকে দণ্ডিত করেন, তাদের জন্য সাহিত্যই হ'ক আর ছবিই হ'ক—"মা লিখ, মা লিখ।"

রূপ বা রূপের সৃষ্টির বিচার চলতে পারে রেখা ও রং, ভাষা ও ছন্দের, সঙ্গতি বা orchestration-এর নিরিখেই মাত্র। এই orchestration বা ঐক্যতান যেখানে দেখা দেয় না, সেখানে শুধু বেসুর বাজে, চিত্র ক্ষুণ্ণ হয়।

চিত্রলিপির ৭নং চিত্রের কথা বলি—

ভুলে যাওয়া ইতিহাসের শব্দশূন্য নির্জন প্রান্তরের
প্রান্তে শিলা শৃঙ্খলেতে বন্দীবাণী অতীত যুগান্তরের

পুরানো ইতিহাসের প্রস্তরীভূত রূপের গাম্ভীর্যে এই চিত্রটি মহিমান্বিত। 'ইতিহাস' আর পাথর একই প্রতিক্রিয়া বা Reaction-এর ফল যাতে ছবিটি Architectural Composition এবং Sculpturesque হয়ে উঠেছে। কিন্তু শিল্পীর দৃষ্টি এখানে সম্পূর্ণ নিরাসক্ত নয়। Pure abstraction খানিকটা ব্যাহত হয়েছে, কিছুটা Egyptian influence ধরা পড়েছে।

আবার চিত্রলিপির ৪নং চিত্রে যে রেখার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অবাধ এলোমেলো গতিচ্ছন্দ, গীতচ্ছন্দে ঊর্দ্ধমুখী এক নারীকল্পনাকে বিপুল শূন্যতার দিকে নিয়ে চলেছে, তা অতুলনীয়। রেখাগুলি দেখে মনে হয়, শিল্পী etching নৈপুণ্যে পারদর্শী। কিন্তু composition এর দিক থেকে দেখলে মনে হবে যে, ছবিটির নীচের দিকের রেখাগুলির আবর্তন সামন্তরাল হয়ে পড়ে আছে উপবিষ্টা নারীমূর্তির জঙ্ঘা এবং পরিচ্ছদ-বিস্তৃতির সঙ্গে। এই Pattern-এর পুনঃকৃতি কিন্তু চিত্রের ভাবসাম্য সুষ্ঠুভাবে রক্ষা করে নি।

তেমনই আবার প্যালারামের অপূর্ব মুখ দেখে অবাক হতে হয়। মনে হয় যেন কোনও সতর্ক দ্বাররক্ষী সশঙ্ক প্রহরায় নিযুক্ত। তার সদণ্ড দুর্বল মুষ্টি সেখানে চোখেই পড়ে না।

আবার দেখেছি অপরূপ জড়মহিমায় প্রাণবান জীবনীশক্তির প্রকাশ দেখতে মুখোসের পরিকল্পনায় প্রাণস্পন্দন পরিলক্ষিত, তার প্রকাশভঙ্গীর আঙ্গিক অদৃশ্য এবং প্রচ্ছন্ন। শিল্প এখানে মুখোসের জড়তা আঁকেন নি বা মুখোস মানুষের অঙ্গশয্যা এ কথাও ভাবেন নি। মুখোসের পরিকল্পনা দেখে অনেকে রবীন্দ্রনাথকে বিখ্যাত শিল্পী Nolde এর সঙ্গে সমশ্রেণীভুক্ত করেছেন। Nolde-এর কল্পিত মুখোস মুখোসমাত্র; এবং তা চিত্রখণ্ডে একাধিকভাবে একত্রীভূত হয়ে বস্তু-সংস্থানের কারসাজিতে চমৎকার। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কাজ কারসাজি বা Craftsmanship নয়, তার আঁকা মুখোস হাস্যাস্পদ

বিকৃত মুখাকৃতি নয়, যেন মুখোস জীবনের ছায়া পড়েছে বিকৃতির অন্তরাল থেকে ইঙ্গিত দিচ্ছে জীবনের প্রচ্ছন্ন আকৃতি, এই দরদী দৃষ্টি Nolde-এর নেই।

রবীন্দ্রনাথ যে দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে মুখোস-পরিকল্পনা করেছিলেন, সেই দৃষ্টিতেই দেখেছেন অবচেতনের অন্ধকারে আকার নিরাকারের মধ্যবর্তী অপরূপ প্রাণ-স্পন্দন। এই জাতীয় একটি ছবিতে দেখি যেন কোন এক গভীর অন্ধকারের জগত অগ্নিআখরে তা'র আত্মকথা লিখে রেখেছে। আর একটি চিত্রে দেখা দিয়েছে দুই অদ্ভুত মূর্তি, একটি নারী ও একটি পুরুষ। নারী সেখানে পুরুষের প্রেমনিবেদনে চটুলতায় কটাক্ষময়ী, তার দেহভঙ্গী ব্রীড়ায় যেন শতখণ্ডিতা। ছবির গাঢ় কৃষ্ণ পটভূমির অন্তরালে যে কী রহস্য লুকানো আছে, তার সন্ধান নেই। দুটি দেহ যেন তমসাবৃত জগতের কেন্দ্রে কোন্ এক অনাস্বাদিত রসসন্ধানে ব্যাপৃত। আর তাদের ঘিরে রয়েছে এক নির্বাক বর্ণহীন পরিবেশ। এই নিরুক্তকে রবীন্দ্রনাথ তুলিতে প্রকাশ করেছেন।

সমগ্র বিশ্ব শত সহস্র রূপবৈচিত্র্যে নিজেকে প্রকাশ করেছে। কিন্তু কিছু থাকে লোকচক্ষুর অন্তরালে, রবীন্দ্রনাথ এই নিরুক্ত অদৃষ্টকে প্রত্যক্ষ করে-ছিলেন। শিল্পক্ষেত্রের সীমান্ত বিশ্বরূপ রেখায় দাঁড়িয়ে শুনেছেন, পশ্য মে পার্থ। রূপানি শতশোঽথ সহস্রশঃ নানা বিধানি দিব্যানি নানা বর্ণাকৃতীনি চ।

কবির জীবনখাতার সব পরিচ্ছেদগুলি যখন একে একে শেষ হয়ে এলো তখন একদিন দেখি তার পরিশিষ্ট রচিত হয়ে আছে ছবির খেলাঘরে। সূর্য অস্ত গেছে। ছবির খেলাঘরে কবির শেষ আলোক-রেখা যে দীর্ঘ ছায়া ফেলেছে, তারই অন্তরালে দেখা যায় অনন্যসাধারণ অভূতপূর্ব রূপরাশি।

অনিলকৃষ্ণ ভট্টাচার্য

রবীন্দ্র চিত্রকলার ভূমিকা

রবীন্দ্রনাথ অঙ্কিত চিত্রগুলির রূপ (form), শৈলী (technique) ও বস্তুবিন্যাস (composition) দেখলে একথা স্পষ্ট করেই মনে হয় যে সেগুলির অঙ্কনপদ্ধতি ও প্রকাশভঙ্গি পাশ্চাত্য দেশীয়—ভারতীয় ঐতিহ্যবাহী চিত্রকলার সঙ্গে এর কোন সম্বন্ধই নেই। এমনকি বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট "স্বদেশী" চিত্রকলার নবরূপায়ন যেখানে ঘটেছে সেই শান্তিনিকেতন গোষ্ঠির

প্রবর্তিত চিত্রধারার inspiration এসেছে যার থেকে—ভারতের প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় চিত্রকলা ও কয়েকটি বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে দূরপ্রাচ্যের (যেমন জাপান ও চীনের) চিত্রকলা থেকে তার সঙ্গে এর কোন শিল্পগত যোগাযোগ নেই। কবির অঙ্কিত চিত্রগুলি পুরোপুরি আধুনিক ইয়োরোপীয় বিশেষতঃ নব্য জার্মান চিত্রকলার সঙ্গে একই পর্যায়ভুক্ত।

ভারতের ইয়োরোপীয় ধাঁচের আধুনিক চিত্রকলার ইতিহাস আলোচনায় অনেকেই একথা বলে থাকেন যে এদেশে সে চিত্রকলার প্রবর্তক ছিলেন পাঞ্জাবের পরলোকগতা মহিলা চিত্রশিল্পী অমৃত শেরগিল। আমি বলি এ সম্মান গগনেন্দ্রনাথের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের প্রাপ্য। তাঁরাই এদেশে আধুনিক পাশ্চাত্যরীতির চিত্রকলার প্রবর্তক।

এবারে প্রশ্ন ওঠে আধুনিক ইয়োরোপীয় চিত্রকলা বলতে কি বুঝায়। এবং কবিকে কি কারণে ভারতে এর অন্যতম প্রধান পুরোধা বলা সঙ্গত।

সময়ের বিচারে ইয়োরোপীয় শিল্পকলা প্রধানতঃ পাঁচ ভাগে বিভক্ত।

ক। Archaic—(কয়েকটি কথার বাংলার প্রতিশব্দ পাওয়া কঠিন এজন্যে ইংরেজী কথাই রাখা হয়) ইতিহাসের গোড়া থেকে খৃঃ পূঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দী পর্যন্ত ইয়োরোপে যে শিল্পধারা চালু ছিল তাকে archaic ধারা বলা যায়।

খ। এরপর ক্লাসিক্যাল যুগ। প্রাচীন গ্রীস ও তার অনুসরণকারী প্রাচীন রোমের শিল্পধারা। মোটমাট খৃঃ পূঃ ৫ম শতক থেকে খৃষ্টাব্দ ৪র্থ শতক পর্যন্ত যা চালু ছিল তাকেই ইয়োরোপের ক্লাসিক্যাল শিল্পধারা বলি।

গ। এরপর কয়েক শতাব্দী ব্যাপী ইয়োরোপের রাজনৈতিক ইতিহাস সকলেই জানেন। খৃঃ পঞ্চম থেকে নবম শতাব্দী পর্যন্ত ইয়োরোপের প্রতিষ্ঠিত শিল্পকেন্দ্রগুলি নানা বর্বর জাতির অভিযানের ফলে বিধ্বস্ত হয়ে গিয়েছিল এবং শিল্পকলার কোন বিকাশই এই কয় শতাব্দী ধরে সম্ভব ছিল না। বর্বর অভিযান কমে এলে খৃঃ দশম শতাব্দী থেকে এক ধরণের ভাবলেশহীন রঙীন mosaic এর চিত্র (?) গীর্জা ও অন্যান্য ধর্মস্থানে দেখা দিতে লাগল। একে মধ্যযুগীয় বা byzantine—শিল্পকলা বলা হয়।

ঘ। এরপর খৃঃ ত্রয়োদশ—চতুর্দশ শতক থেকে রেণেশাঁস যুগের শুরু। এই রেণেশাঁস শৈলী নানারকম অদলবদলের (variations) মধ্যে দিয়ে গত শতকের তৃতীয় পাদ পর্যন্ত চলে এসেছে।

৬। এবং তারপর ইয়োরোপের শিল্পকলায় একটি যুগান্তকারী পরিবর্তন ঘটে। আধুনিক বা modern ভাবধারার উদ্ভব হয়। এটা এখনও চলছে। এবার আধুনিক শিল্পকলার উৎপত্তির অর্থনৈতিক ও সামাজিক দিকটা আলোচনা করা যাক। রেণেশাঁসের যুগের শেষ পর্যন্ত ইয়োরোপে ফিউডাল যুগ বা জমিদার শ্রেণীর একাধিপত্যের যুগ চলে এসেছে। সে সময়ে দেশের অধিকাংশ লোকের আর্থিক অবস্থা খারাপ হলেও সমসাময়িক জমিদার শ্রেণী প্রচুর বিত্তশালী ছিল। হাতে পয়সা থাকলে লোকে নানাভাবে নিজের শখ মেটায়। তাঁরা বানালেন বিরাট সব প্রাসাদ যেখানে ছিল বড় বড় সব হলঘর এবং তৈরী হল প্রকাণ্ড গীর্জা। হলঘরের টানা দেওয়াল ও গীর্জার ছাদ চিত্রমণ্ডিত না হলে বড় ন্যাড়া ন্যাড়া লাগত কাজেই সাজান হোত তাদের ছবি দিয়ে। বায়না পাওয়া শিল্পীরা বসত বাড়ীর হলঘর প্রভুদের এবং তাদের পূর্বপুরুষদের প্রতিকৃতি দিয়ে অথবা গীর্জার ছাদে বা দেওয়ালে বাইবেলের গল্পকে ছবিতে ফুটিয়ে তুলে সাজাতেন। এজন্যে এযুগের চিত্রকলা ছিল বর্ণাঢ্য, আকারে সাধারণত বড় এবং সবদিক থেকে বেশ জাঁকজমক পূর্ণ।

ক্রমে ক্রমে ইতিহাসের পট পরিবর্তন হোল। শিল্পবিপ্লবের ফলে পশ্চিম ইয়োরোপে একশ্রেণীর বিত্তশালী বণিক সমাজের উদ্ভব হল। কিন্তু পুরাণ জমিদারদের মত আভিজাত্য বা বনেদীয়ানা এবং ধর্মভীরুতা তাঁদের না থাকায় পুরোনো আমলের তুলনায় রুচিগত একটা বিরাট পরিবর্তন ঘটল। বাণিজ্যের জন্যে তাঁরা ঘুরতেন সারা পৃথিবী, দেখেছিলেন আফ্রিকা ভারত ও দূরপ্রাচ্যের শিল্পনিদর্শনগুলি। জমিদারেরা প্রজাদের ব্যাগার খাটিয়ে বড় বড় বাড়ী পরিষ্কার রাখতেন। কিন্তু এই উটকো ধনীদের পক্ষে তা সম্ভব ছিল না; কাজেই বাড়ীর আকার ছোট হল, সেইসঙ্গে ছবিরও।

সেজন্যে নতুন মনিবদের চাহিদা মেটাতে শিল্পীদের ভোল বদলাতে হল। চিত্রকলার বিষয়েও ভাবগত পরিবর্তন হল নতুন পরিবেশের সঙ্গে খাপ-খাওয়ানোর জন্যে। ক্রমশঃ আলো সংক্রান্ত পদার্থ বিজ্ঞানেরও অনেক উন্নতি হল। কাজেই চিত্রকলায় রঙের ব্যবহার এবং তার, perspective ও অন্যান্য technical আনুষঙ্গিকের আমূল পরিবর্তন ঘটে গেল। শিল্পবিপ্লব, যুদ্ধ, বিক্ষোভ ও নানা রাজনৈতিক পরিবর্তনের জন্যে শিল্পীদের মনও বিক্ষুব্ধ হয়েছিল। এর সঙ্গে যোগ দিল শিশুদের আঁকা চিত্রকলা ও আদিম শিল্পের

নমুনা—এর ফলে বহুযুগের প্রচলিত শিল্পধারার পরিবর্তন কাটিয়ে তাঁরা নতুন ধরণের চিত্রকলার জন্য মন দিলেন। উদ্ভব হল ইম্প্রেসনিষ্ট, এক্স্প্রেসনিষ্ট ও কিউবিষ্ট—শিশু ও আদিম মানবগোষ্টির অঙ্কিত চিত্রধারা থেকে উদ্ভূত abstract শিল্প ইত্যাদি নানা বিভিন্ন শৈলীর আধুনিক চিত্রকলা। প্রাচীনতর রীতির সঙ্গে এর পার্থক্য সর্বভাবে অনুভূত। এ ধরণের চিত্রকরেরা সমসাময়িক অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে না পেরে নিজেদের মানসিক দ্বন্দ্ব এক বিশিষ্ট শিল্পরীতির মাধ্যমে প্রকাশ করলেন। বিভিন্ন যুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত হওয়ার ফলে এই বিক্ষোভ চিত্রকলার মাধ্যমে প্রচণ্ডভাবে আত্মপ্রকাশ করেছিল জার্মানীতে এই শতকের গোড়ার দিকে। এক কথায় আধুনিক ইয়োরোপীয় চিত্রকলায় রেণেশাঁস যুগের সেই বর্ণ সুসামঞ্জস্যপূর্ণ, শান্ত, সমাহিত, সমৃদ্ধ, পরিপূর্ণ জীবনোদ্যোতক মহৎ শিল্পের বদলে আধুনিক কালোপযোগী খণ্ডিত বিক্ষুব্ধ জীবনের বহিঃপ্রকাশ দেখতে পাই। আধুনিক মনোবৈজ্ঞানিকেরা যাকে বিক্ষোভ ও নৈরাশ্যজনিত অবদমিত মনের ভাবনা বলেছেন—এগুলি সম্ভবত সেই মনোভাব থেকে জাত। অন্যভাবে বলা যেতে পারে যে আধুনিক চিত্রকলা এখনও maturityতে পৌঁছয়নি অনেকাংশে পরীক্ষানিরীক্ষার স্তরেই (experimental stage) আছে।

কবি-অঙ্কিত চিত্রগুলি আধুনিক ইয়োরোপীয় চিত্রকলার ভাবানুষঙ্গী এরকম কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। রবীন্দ্র সাহিত্যের পরিপ্রেক্ষিতে ছবিগুলি বিচার করলে তাঁর মনের ভাব প্রকাশের বৈচিত্র্যে আশ্চর্য হয়ে যাই। রবীন্দ্রসাহিত্যের শতকরা নিরানব্বুই ভাগেই যে quietness এবং নিরুদ্বিগ্ন, শান্তসমাহিত ভাব আছে, তাঁর চিত্রকলা সে তুলনায় অনেক বেশি বিক্ষুব্ধ এবং repressive ভাবের দ্যোতক। এর সম্ভাব্য কারণ হল যে তিনি প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর একদিকে বিধ্বস্ত ইয়োরোপ বিশেষ করে বিধ্বস্ত জার্মানী, অন্যদিকে ভারতে সশস্ত্র বিপ্লববাদের পাশাপাশি মহাত্মাজীর অসহযোগ আন্দোলনও দেখেছেন। যে ইয়োরোপ বহুদিন ধরে তাঁর কাছে অনেক উচ্চ ভাব ও গুণ গরিমার আদর্শস্থল ছিল সেই ইয়োরোপের material ও মানসিক ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি কবিচিত্তকে নিশ্চয়ই গভীরভাবে নাড়া দিয়েছিল। এদিকে ভারতের অবস্থাও কবিচিত্তের স্বচ্ছন্দতার অনুকূল ছিল না। একথা সকলেই জানেন যে বিপ্লববাদ বা অসহযোগ আন্দোলনে তিনি সায় দেননি। বহুবিধ

কারণ-সঞ্জাত তাঁর চিত্তবিক্ষোভ ছবিগুলির মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন।

একথা বলা আমার উদ্দেশ্য নয় যে তাঁর ছবিগুলি আমি উৎকৃষ্ট মনে করি না বলে এইকথা লিখেছি। একথা আবার পরিষ্কার করে বলি যে যেখানে সমস্ত আধুনিক শিল্পকলাই এখনও পর্যন্ত পরীক্ষানিরীক্ষার (experiment)-এর স্তরে রয়েছে সেখানে তার একটি বিশিষ্ট ভঙ্গীকে আলাদা করে তার সম্বন্ধে রূপবিচারের দিক থেকে কোন নির্দ্দিষ্ট মতামত এখনই দেওয়া সমীচিন হবেনা। আমাদের মতে রবীন্দ্রচিত্রকলা বিশিষ্ট রীতির ইয়োরোপীয় ধাঁচের আধুনিক শিল্পকলার মধ্যে এখনও পর্যন্ত একটি experiment হয়ে আছে।

এপ্রসঙ্গে আরও কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করা প্রয়োজন। কবি শান্তিনিকেতনে বসে প্রায় তিন হাজার বিভিন্ন ধরণের ছবি এঁকেছিলেন। কলা-ভবনের শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীরা নিশ্চয়ই সে সব ছবি দেখেছেন। আলোচনাও করেছেন কিন্তু কলাভবন এই শৈলীর চিত্রকলার আওতার বাইরে আছে কেন? আশা করি ওয়াকিবহাল ব্যক্তিরা ভবিষ্যতে এবিষয়ে নিরপেক্ষভাবে আলোচনা করবেন, কারণ ভারতে চিত্রকলার ইতিহাস জানার জন্যে এ প্রসঙ্গের বিষদ আলোচনা অত্যাবশ্যক। একথাও জানা দরকার যে ভারতে এখন যাঁরা আধুনিক ধাঁচের ছবি আঁকেন তাঁদের মধ্যে একজনও চিত্রাঙ্কন পদ্ধতিতে কবিকে অনুসরণ করেন নি কেন? সাহিত্যে কবির বেশ কিছু অনুসরণকারী আছেন, কিন্তু ছবির বেলায় একজনও নেই।

জীবেন্দ্রকুমার গুহ

রবীন্দ্রনাথের চিত্রকর্ম

এই শতকের তৃতীয় দশক, ফরাশি দেশ তথা বিশ্বের চিত্র ও নন্দনতত্ত্ব চর্চার ইতিহাস, বিবিধ কারণে স্মরণীয়। সুররিয়ালিজমের প্রবক্তা আঁদ্রে ব্রেতঁ যথাক্রমে ১৯২৪ ও ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে সুর্‌রিয়ালিজমের প্রথম ও দ্বিতীয়— এই দুটি ঐতিহাসিক প্রপত্র প্রকাশ করলেন। ফরাশি দেশে যখন সুর্‌রিয়া-লিজমের আন্দোলন প্রবল, এমন সময় ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে ফরাশি দেশের প্রাণকেন্দ্র এবং বিশ্বের শিল্পতীর্থ পারি শহরে আমাদের কবি রবীন্দ্রনাথ,—এমনকি তাঁর স্বদেশবাসীদের পর্যন্ত বিস্ময়াভিভূত করে' একক প্রদর্শনীতে একশো

পঁচিশখানি চিত্র সাজিয়ে চিত্রীরূপে আবির্ভূত হলেন। চিত্রীরূপ-ই তাঁর অমর্ত্য সম্ভব প্রতিভার শেষতম এবং সর্বাপেক্ষা বিস্ময়কর উন্মোচন। জীবনের প্রায় শেষ প্রান্তে পৌঁছে তিনি তাঁর চিত্রকর্ম সর্বসময়ে প্রথম প্রদর্শন করেন। ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে প্রথম তাঁর চিত্রকর্ম প্রদর্শিত হলেও চিত্রচর্চা ও অনুশীলন চলছিলো বহুকাল ধরে, তার সমর্থন আমরা তাঁরই বিভিন্ন রচনায় বিচ্ছিন্নভাবে পাই। আনুমানিক ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের একটি দিনের স্মৃতিমন্থন করে রবীন্দ্রনাথ 'জীবনস্মৃতি'তে লিখেছেন—'একটা ছবি আঁকার খাতা লইয়া ছবি আঁকিতেছি। সে কেবল ছবি আঁকার ইচ্ছাটাকে লইয়া আপন মনে খেলা করা।' এবং ১৯০০ খৃষ্টাব্দে আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর উদ্দেশে লিখিত পত্রে—'শুনে আশ্চর্য হবেন, একখানা sketch book নিয়ে বসে বসে ছবি আঁকছি।' (১লা আশ্বিন, ১৩০৭ বঙ্গাব্দ)

এবম্বিধ বিক্ষিপ্ত উক্তি থেকে সহজেই এই নিশ্চিত সিদ্ধান্তে পৌঁছোনো যায় যে, তাঁর চিত্রচর্চা আদৌ কোনো আকস্মিক কিংবা বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, যদিও ১৯২৭-২৮ খৃষ্টাব্দের পূর্ব পর্যন্ত—রবীন্দ্রনাথ নিজের চিত্রকর্ম সম্পর্কে এক অদ্ভুত দ্বিধা পোষণ করতেন বলেই, হয়ত, এই সুকুমার শিল্পের চর্চায় গভীর ভাবে মনোনিবেশ করেননি, এবং এই কারণেই তাঁর চিত্রসৃষ্টিকে কয়েকটি বিশেষ শ্রেণীবিভাগের অন্তর্ভুক্ত করা সহজ হলেও তাঁর চিত্রচর্চায় স্পষ্ট কালগত ধারাবাহিকতা, যা পাব্‌লো পিকাসো কিংবা অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চিত্রচর্চায় দেখা যায়, তা দেখা যায়না। তাঁর অধিকাংশ চিত্রই ১৯২৭ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৯৪১ খৃষ্টাব্দে রোগশয্যা গ্রহণের মধ্যবর্তী ক্ষীণ চোদ্দ বৎসর কালের মধ্যে রচিত। কোন শিল্পবিদ্যালয়ে কিংবা কোন শিল্পীর নিকট তিনি চিত্র-শিল্পের প্রাথমিক ব্যাকরণ শেখেননি, অ্যাকাডেমির ধারায় চর্চা করেননি। বর্ণব্যবহার, বিভিন্ন প্রকারের পটভূমির ব্যবহার প্রভৃতি মূলগত বিষয়ের শিক্ষার জন্য যদিও শিক্ষানবিশী গ্রাহ্য, কিন্তু যে শিল্পবোধ, শিল্পদৃষ্টি ও শিল্প চেতনার স্পর্শ মহৎ শিল্পকর্মের প্রধান গুণ তথা বৈশিষ্ট্য—তা, সম্পূর্ণই শিল্পীর হৃদয়ের ভিতরমহলের ব্যাপার, উপর থেকে আরোপ করে তা' হৃদয়ে সঞ্চারিত করা যায়না। তদুপরি মহৎ শিল্পীর কাছে উপকরণ, বর্ণপ্রলেপন এবং বিবিধ পটভূমি ব্যবহারের পরম্পরা-অর্জিত জ্ঞান—ইত্যাদি নিছক গৌণ। আসলে, সঙ্গীত ও কবিতা, নাটক ও নিবন্ধ এবং বিবিধ সৃষ্টির মধ্যে নিজেকে

প্রকাশ করেও রবীন্দ্রনাথ 'হেথা নয় হেথা নয় অন্য কোথা অন্য কোনখানে'-র নিরন্তর প্রেরণায় সুকুমারশিল্পের অন্যান্য দিক স্পর্শ করবার তাগিদ অনুভব করেছিলেন, এবং এই প্রেরণারই স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ তাঁর চিত্রাবলী, শান্তিনিকেতনে অভিনীত নাটক মঞ্চসজ্জায় নবতম ধারার প্রবর্তন এবং শিল্পরুচিময় অনুষ্ঠান উদ্‌যাপন। শৈলী ও আঙ্গিক মূলত আত্মপ্রকাশের আধার এবং চিত্রচর্চা অন্তর্নিহিত প্রেরণার প্রতিফলন।

পারি শহরকে কেন্দ্র করে যখন পৃথিবীর শিল্পী সমাজ পরম্পরাগত ঐতিহ্যানুসারী শিল্পবিধি পেরিয়ে নব নব দিক উন্মোচনে অক্লান্ত, সে সময় স্বদেশের শিল্পচর্চার কেন্দ্র এই কলকাতায় অবনীন্দ্রনাথ প্রবর্তিত বেঙ্গল স্কুল অফ পেন্টিং-এর আদর্শের বিকৃত ব্যাখ্যা করে আমাদের দেশের শিল্পীসমাজ পুরাণাশ্রিত কাহিনী চিত্রণের প্রতি মনোযোগী হয়েছিলেন। বেঙ্গল স্কুলের অবিস্মরণীয় ফলশ্রুতি অবনীন্দ্রনাথ-গগনেন্দ্রনাথ-নন্দলাল এই ত্রয়ীর চিত্রকর্মে পাওয়া গেলো, এঁদের চিত্ররীতিকে আদর্শ মেনে যাঁরাই এগোতে গেছেন তাঁরাই ব্যর্থ হয়েছেন। আমাদের দেশ পাশ্চাত্য থেকে প্রায় সব আদর্শ আন্তরিকরূপে না হলেও বাহ্যতঃ গ্রহণ করেছিলো একমাত্র চিত্রচর্চার সতত পরিবর্তনশীল মতবাদ ও ধারা যা গোটা পৃথিবীকে অভিভূত করেছিলো, তা গ্রহণ করা দূরে থাক, স্বীকার করতেও কুণ্ঠিত ছিলো। ফোটোগ্রাফি আবিষ্কারের পূর্বে হুবহু সাদৃশ্যমূলক যে চিত্রাঙ্কন পদ্ধতি (বা ড্রইং রুম আর্ট) পাশ্চাত্যে আদৃত হতো, ইয়োরোপে ভ্যান গগ্, গগ্যাঁ, সেজানের বিস্ময়কর আবির্ভাব ও চিত্রসৃষ্টির কালে—এই গত শতকেও আমরা তখন আমাদের দেশে রবি বর্মার চিত্ররীতিকেই ধ্রুব মেনেছি। স্বদেশী যুগে সোচ্চার না হলেও নীরবে, চিত্রচর্চায়, এই দেশে নব্যভারতীয় ভাববিলাস অঙ্কুরিত হলো। ইতালীয় চিত্ররীতিতে শিক্ষিত অবনীন্দ্রনাথের মধ্যে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের অপূর্ব সাঙ্গীকরণ দেখা গেলো, গগনেন্দ্রনাথ আলোর জ্যামিতিক ধর্মে উদ্বুদ্ধ বিভিন্ন পর্দাজের বর্ণসম্পাত ও অঙ্কনের রূপকথা-পুরাণ-লৌকিক কাহিনী-নির্ভর সামাজিক বিষয়ের বিভিন্ন পরীক্ষায় আরোপ করলেন; ঐতিহ্যে বিশ্বাসী নন্দলালের চিত্রকর্মে অজন্তা থেকে কালীঘাটে বর্ণপ্রয়োগ ও শারীর-গঠন, লিরিকধর্মী জাপানি চীনে চিত্রের লাবণ্য, পারসিক ও চীনের লেখাঙ্কনের আদর্শে উদ্বুদ্ধ প্রাণময় রেখার সংহতিতে মূর্ত চেনা ঘর বাড়ি গ্রাম মানুষ

পশু দৃশ্যাবলী—এমনকি কিছু কিছু টাচেব ছবিতে ফবাশি ইম্প্রেশনিস্টদের মত বর্ণপ্রয়োগ দেখা গেলো। যোগ্য উত্তবসূরীর আবির্ভাব না হওযায় বেঙ্গল স্কুলেব ধাবা ব্যাহত হলো;—তেমনি, মাইনব পর্যায়েব শিল্পীদেব অক্ষম হাতে পড়ে এই ধাবাব আদর্শ ক্রমেই বিকৃত হতে লাগলো। ভাবত অধিকাব মানসে ইংবেজেব বক্তক্ষযী সংগ্রাম, বাদশাদেব অস্থিব মনোবৃত্তি এবং তৎকালীন সাধাবণ মানুষেব অবর্ণনীয দুর্দশাব সংস্পর্শে আমাদেব মুহ্যমান সংস্কৃতিব ধারা—বিশেষত চিত্রচর্চা, যা বাদশাহী পৃষ্ঠশোষকতায এবং জনসাধাবণের সমর্থনে কালিঘাটে, কাকশিল্পেবই মত গোষ্ঠীবদ্ধ ভাবে হতো,—কিছুকালেব মধ্যে সেসব একেবাবে মবে গেলো। ইংবেজ সাদৃশ্যমূলক প্রতিকৃতি অঙ্কনেব ফোটোগ্রাফি সুলভ আদর্শ এদেশে আনলো। ইংবেজেব স্নেহচ্ছায়ায বর্ধিত নব্য বাবুযানিব পৃষ্ঠপোষকতায ফোটোগ্রাফিব পবিপূবক এই চিত্ররীতি বীতিমত শাখা প্রশাখা মেলতে লাগলো। স্বাভাবিক ভাবেই তাই বাজা ববিবর্মাব আবির্ভাব হলো।

ববিবর্মাব দেশে অবনীন্দ্রনাথ যখন প্রচলিত ধারণাব প্রতি দৃকপাত না কবে বিভিন্ন ঐতিহ্যেব আশ্রযে নবীন বীতি প্রবর্তনেব দিকে মনোনিবেশ কবলেন তখন আনন্দ কুমাবস্বামীব কলম, ই বি হ্যাভেলেব পৃষ্ঠপোষকতা. লেডি হ্যারিংহমেব আনুকূল্য, পার্সি ব্রাউনেব উৎসাহ প্রদান এবং সর্বোপবি রবীন্দ্রনাথেব সমর্থন আমাদেব দেশেব তৎকালীন শিক্ষিত সমাজেব প্রতিকূলতার সম্মুখীন হতে তাঁকে সাহায্য কবেছিলো। এবং আশ্চর্যের বিষয়, বেঙ্গল স্কুলেব পয়লা নম্বব সমর্থক, ববীন্দ্রনাথ—যাঁব আওতায় বেঙ্গল স্কুল জন্মগ্রহণ কবলো, ভিত পেলো, সেই তিনিই বেঙ্গল স্কুলেব আদর্শে এতটুকুও প্রভাবান্বিত না হয়ে, দীর্ঘকাল লোকচক্ষুব অন্তবালে চিত্রচর্চা করে একেবাবে স্বতন্ত্রভাবের, মেজাজের, ধবণের চিত্রবাজি নিয়ে উপস্থিত হলেন। আমাদেব দেশের তৎকালীন শিক্ষিত সমাজ চিত্রী ববীন্দ্রনাথেব বিস্ময়কব চিত্রকর্ম দেখে 'হতবুদ্ধি' হলেও, ববীন্দ্রপ্রতিভাব নবীনতম উন্মোচনে অভিভূত পল ভালেবি ও আঁদ্রে জিদ্—এই দুই বরেণ্য মণীষী তাঁকে এই বলে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন—'ডক্টর টাগোর, আমরা এখন সবেমাত্র যা ভাবতে শুরু করেছি, আমাদের দেশেব এই সব বিচিত্র আর্টের্ব আন্দোলনের তলায় তলায় যে-নূতনকে পাবার চেষ্টা লুকোনো রয়েছে, আপনি কী করে সেই জিনিষকে চোখের সামনে

এনে ধরলেন? আপনার এই অত্যাশ্চর্য কীর্তি যে কতো বড়ো তা' হয়ত এখন সাধারণ মানুষের বোধগম্য হবেনা—সংস্কৃতির উৎকর্ষের সঙ্গে মানুষের চিন্তাশক্তি যতই বিকশিত হবে, এই চিত্রগুলির কথা ততই তারা বুঝতে পারবে।' (প্রতিমা দেবী ॥ বিশ্বভারতী পত্রিকা, বর্ষ ১, সংখ্যা ২ ॥)

১৯৩০ খৃষ্টাব্দে ইয়োরোপের বিদগ্ধ সমাজের স্বীকৃতি জীবনে দ্বিতীয়বার লাভ করে আনন্দিত কবি-চিত্রী তাঁর পুত্রবধূকে লিখলেন, 'জীবন গ্রন্থের সব অধ্যায় যখন শেষ হয়ে এলো, তখন অভূতপূর্ব উপায়ে আমার জীবন দেবতা এর পরিশিষ্ট রচনার উপকরণ জুগিয়ে দিলেন।' প্রদর্শনীর স্মারক পুস্তিকায় কবি ইংরেজিতে লিখলেন, 'I as an artist cannot claim any merit for my courage; for it is the unconscious courage of the unsophisticated like that of one who walks in dream on perilous path, who is saved only because he is blind to the risk' উক্তির মধ্যে যে বিনয়, তা কৃত্রিম নয়। নিজের চিত্রকর্ম সম্পর্কে নির্ব্যূঢ় সংশয়হীনতা ছিলোনা। তিনি বলেছিলেন,—'আমি তো নন্দলালের মত ছবি আঁকা শিখি নি', এবং, 'আমার কাব্য কিংবা গান—এ আমি জানি। কিন্তু আমার ছবি—ভালো কী মন্দ বুঝতে পারিনে। সেই জন্যে আমি কিছু বলতে পারিনে।' ফরাশি কবি ও শিল্পী অভিজাত মহিলা কম্‌তে দ নোয়াই রবীন্দ্রনাথকে অভিনন্দন জানাতে গিয়ে অনুভব করেছিলেন, 'নিজের চিত্রকর্ম সম্বন্ধে টাগোর ভীত ও দ্বিধাগ্রস্থ।' আসলে, সমস্ত মহৎ, ধ্রুপদী এবং অবিস্মরণীয় মৌলিক সৃষ্টিই অপ্রবুদ্ধ সৃষ্টি, অবচেতন প্রেরণার কথা স্রষ্টা তো নিজেই জানেন না। অবচেতনের ঐশ্বর্য সম্পর্কে স্রষ্টার নিজেরই ধারণা থাকেনা বলে তিনি নিজের সৃষ্টিতে বিস্মিত হন। রবীন্দ্রনাথের একটি পত্রে এর স্বপক্ষে উক্তি পাওয়া যায়—'কবিতার বিষয়টা অস্পষ্ট ভাবেও গোড়াতেই মাথায় আসে, তারপরে শিবের জটা থেকে গোমুখী বেয়ে যেমন গঙ্গা নামে, তেমনি করে কাব্যের ঝরণা কলমের তট রচনা করে ছন্দ প্রবাহিত হতে থাকে। আমি যে সব ছবি আঁকার চেষ্টা করি তাতে ঠিক তার উল্টো প্রণালী—রেখার আমেজ প্রথমে দেখা দেয় ঝরণা কলমের মুখে, তারপর যতই আকার ধারণ করে, ততই সেটা পৌঁছতে থাকে মাথায়। (রাণী মহলানবিশকে লেখা পত্র, ২১শে কার্তিক, ১৩৩৫ বঙ্গাব্দ।)

পারি-র পর ইংলণ্ডের বর্মিংহম সিটি আর্ট গ্যালারীতে, জর্মনীর মিউনিকের

বিখ্যাত গ্যালারী মোলার-এ, বর্লিন, ড্রেসডেনে, রুষদেশে ও মার্কিন প্রদর্শনী সাজিয়ে বিদেশ থেকে যোগ্য স্বীকৃতি লাভ করে রবীন্দ্রনাথ দেশে ফিরে, ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে এই কলকাতায তাঁব চিত্রকর্ম প্রদর্শন কবলেন।

জর্মনীর মিউনিকে তিনি বলেছিলেন, 'আমার কবিতা আমার দেশবাসীব জন্য, আমাব ছবি আমি পশ্চিমকে উপহাব দিলাম।' রুষদেশের দর্শকবৃন্দেব উদ্দেশে বললেন,—'আপনাদেব প্রশংসা পেযে আমাব আনন্দেব সীমা নেই—কারণ আমি জানি এদেশেব দক্ষ শিল্পী ও শিল্পবসিকবাই আমাব ছবি অনুমোদন কবলেন।'

মার্কিনেব ন্যু-ইযর্কেব ছাপ্পান্ন সংখ্যক বাস্তাব প্রদর্শনী কক্ষে জর্জ বাসেল ও শ্রীমতী রুজভেল্ট এলেন তাঁকে অভিনন্দন জানাতে। ন্যু-ইযর্ক টাইমস্ তাঁকে অনন্য আধুনিক শিল্পী বলে ঘোষণা কবলেন। দুই মহাদেশ পবিক্রমাব পব রবীন্দ্রনাথ স্বদেশে চিত্রী হিসেবে আত্মপ্রকাশ কবলেন। পূর্বার্জিত তিক্ত অভিজ্ঞতাব দরুণ হযত তিনি নিশ্চিতই জানতেন, এদেশেব বিদগ্ধ সমাজে পুনর্বাব তাঁব বিরুদ্ধে অনর্থক অহেতুক আন্দোলন হবে।

রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক অঙ্কিত মোটামুটি আড়াই হাজাব সংখ্যক চিত্রেব শ্রেণী বিভাগ এইভাবে কবা যেতে পাবে,

ক, লেখাঙ্কন বা Calligraphy · বিমূর্ত অলঙ্কবণ সমৃদ্ধ লেখাঙ্কন, চিত্রযুক্ত লেখাঙ্কন এবং চিত্র ও অলঙ্করণ যুক্ত লেখাঙ্কন

খ, বেখাচিত্র বা Line drawing (তুলিতে ও কলমে) দৃশ্যাঙ্কন, অবয়ব (চবিত্রগত, বাস্তবিক, ভীষণ, ব্যঙ্গাশ্রিত, জ্যামিতিক, আত্মপ্রতিকৃতি)

গ, বর্ণময চিত্র বা Painting সাদৃশ্যমূলক এবং কল্পিত জন্তু, স্থিরচিত্র, প্রচ্ছদ চিত্র, ছন্দোময মূর্ত ও বিমূর্ত গঠন ভঙ্গী

রবীন্দ্রনাথ বচিত চিত্রসমূহেব আকাব (size) বৃহৎ না হলেও তাবা ড্রইং মিনিয়েচব-সুলভ নব। তাঁর চিত্রেব ফিগাব—তাঁদেব লয়, ঘনত্ব, বর্তুলাকৃতি, গঠন ও আয়তন অজন্তা, ফরাশি দেশ এবং স্পেনদেশেব মধ্যবর্তী প্রাগৈতিহাসিক গুহাচিত্রেব ফিগাবেব বিশালতাব কথা স্মরণ কবিযে দেয়। তাঁর চিত্রে একাধিক বিষয়েব ভিড় নেই, সমস্ত দৃষ্টি মূল বিষয়ে নিবদ্ধ বাখতে তা' সাহায্য করে। নির্দ্দিষ্ট বিষয ও ভাবেব একচ্ছত্র বিশালতাব জন্য তাঁব চিত্রে

অধিক সংখ্যক ফিগার বা বিবিধ গৌণ বিষয় নেই। একাধিক গৌণ বিষয় একটি প্রত্যক্ষ বিষয়কে স্পষ্ট করে তোলে—এই ধারণা তিনি মানেন নি। তাঁর চিত্রাবলীর ফিগার, চেহারা যেন কাছে উঠে আসে, জন্তু জানোয়ার বিরাটত্ব নিয়ে সম্মুখে আবির্ভূত হয়। বাহুল্য বর্জন তাঁর চিত্রের অন্যতম গুণ। চিত্রের নামকরণে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন না—চিত্র নিজের ভাষায় কথা বলে, অক্ষর-নির্ভর ভাষার তকমা তার জন্য প্রয়োজন হয়না। তাঁর কথায়, 'ছবির নাম দেওয়া একেবারে অসম্ভব।···যাঁরা ছবি দেখবেন তাঁরাই নামকরণ করুন। যারা নামের আশ্রয় হারা, তাদের আশ্রয় দিন।'—'সে', 'খাপছাড়া'র চিত্রাবলী ও প্রচ্ছদ চিত্রসমূহ বর্ণনামূলক (Illustration) বিধায় নামকরণ স্বাভাবিক ভাবেই হয়েছে। নামকরণ না হওয়ায় অনেকক্ষেত্রে দর্শক, সমালোচকেরা তাঁর ছবিকে 'নামের আশ্রয়' দিয়েছেন।

এর পূর্বে রবীন্দ্রনাথের লেখাঙ্কনের সঙ্গে তুলনীয় কোনো লেখাঙ্কন আমরা পাইনা। লেখাঙ্কনের ব্যাপক চর্চা চীনে, পারস্যে, মোগল দরবারে, গুজরাতে ধর্মবিষয়ক পুঁথিতে, ওড়িষ্যার বাংলার পাটায়-পুঁথিতে, দক্ষিণ ভারতে ব্যাপকভাবে হতো, কিন্তু সে-সব লেখাঙ্কন ছিলো প্রবুদ্ধ ও পূর্বনির্ধারিত। প্রাচীন হস্তলিখিত হিব্রুপুঁথিতে, মিশরের প্রস্তর গাত্রে, আকবরের নির্দেশে রচিত গ্রন্থ সমূহে, চীনের শিল্পীদের কর্মে বিদ্বজ্জন স্বীকৃত লেখাঙ্কনের চরম উৎকর্ষ বিধৃত রয়েছে। নন্দলাল বসুর মতে লেখাঙ্কনের গুণ, (quality)—'অক্ষর গুলি স্পষ্ট, সুসমঞ্জস ও মালার মত শ্রেণীবদ্ধ হবে। পংক্তিগুলি ঋজু ও সমান্তর হবে। অক্ষরগুলি পুষ্ট ও নির্ভীক হবে·· সাবলীল স্বচ্ছন্দ হবে। লেখকের নিজস্ব ধরণ থাকবে, অর্থাৎ লেখকের চরিত্রের ছাপ প'ড়ে লেখায় একটি চারিত্র ফুটে উঠবে।' লিপি এবং হস্তলিপি সম্পূর্ণ বিমূর্ত (Pure abstract) শিল্প—দেশ ভেদে ও গোষ্ঠীভেদে রূপ ভিন্ন—আসল উদ্দেশ্য মনের ভাব লিখিতচিহ্নে প্রকাশ করা। বলবাহুল্য, রবীন্দ্রনাথের হস্তলিপিতে লেখাঙ্কনের সব কটি আদর্শ ও গুণ বর্তমান। তৎকালীন কোণ ও বর্তুল বিশিষ্ট বাংলা হস্তাক্ষর রচনার জ্যামিতিক ধরণ ভেঙ্গে দিয়ে রবীন্দ্রনাথ একেবারে নূতন ধরণের, স্বচ্ছন্দ—দ্রুত লিখনের উপযুক্ত অথচ ছন্দোময় হস্তলিপির প্রবর্তন করলেন। দ্বাদশ শতাব্দীর চীনাসম্রাট হুই সুং-এর অলঙ্করণ

বর্জিত পরস্পর সমান্তর, ঋজু পংক্তিতে লেখা কবিতার পাণ্ডুলিপি এবং রবীন্দ্রনাথের স্ফুলিঙ্গ কাব্যগ্রন্থের কবিতাবলী একই ধরণের লেখাঙ্কনকলা। রবীন্দ্রনাথের লেখাঙ্কন কলম দিয়ে রচিত বলে ধাতবগুণ বিশিষ্ট। চীনা ও জাপানি তুলিকা রচিত লেখাঙ্কনের ন্যায় সরু-মোটা টান তাতে অনুপস্থিত। আলোচনার উদ্দেশ্যে রবীন্দ্রনাথের লেখাঙ্কন সমূহকে তিনভাগে ভাগ করা যেতে পারে। প্রথমতঃ, 'স্ফুলিঙ্গ' কাব্যগ্রাস্থের হস্তলিপি—অলঙ্করণ বর্জিত, ছন্দোময় লেখাঙ্কন। তিনি হস্তলিপির এক অপূর্ব শৈলীর প্রবর্তক। দ্বিতীয়তঃ, কবিতার পাণ্ডুলিপি সংশোধনের কাটাকুটির কুশ্রীতা কে সুন্দর রূপ ও তাল-মাত্রা-ওজনগত মিল দিতে গিয়ে সৃষ্ট বিমূর্ত অলঙ্করণ সমৃদ্ধ লেখাঙ্কন সমূহ। এই ধরণের লেখাঙ্কন তাঁর বিপুল অথচ সংযত রুচির পরিচয় দেয়। এই ধরণের অপ্রবুদ্ধ লেখাঙ্কন সৃষ্টির সময়ই তিনি শেষ বয়সে অবিচ্ছিন্ন চিত্রচর্চায় গভীরভাবে মনোযোগী হন। বিমূর্ত শিল্পের অন্যতম পথিকৃৎ কান্দিনস্কি কর্তৃক উচ্চারিত 'That is beautiful which is produced by the inner need, which springs from the soul.' উক্তিতে যে-প্রেরণাকে আধুনিক চিত্রকর্মের নন্দনগতমূল্য ও সৌকর্যের পক্ষে অপরিহার্য বলা হয়েছে, রবীন্দ্রনাথের লেখাঙ্কন ও পাণ্ডুলিপি সংশোধনের মধ্যে সেই প্রেরণার প্রতিভাস ও স্পর্শ মেলে। কাটাকুটির কুশ্রীতায় তাঁর চোখে নানাবিধ নির্বস্তুক বিচ্ছিন্ন রূপাভাস ধরা পড়ত,—সেই কুশ্রীতা, সেই বিচ্ছিন্ন রূপাভাস সংহত-সুন্দরের আবেদন তাঁর কাছে উপস্থিত করত। আরো স্বল্প সময়ের ভিতর সংশোধিত, কাটাকুটি-বিহীন দ্বিতীয় পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন করা সম্ভবপর হলেও, তিনি প্রথম পাণ্ডুলিপির কাটাকুটির অসংবদ্ধ রেখা সমূহকে সংবদ্ধ, সংহত ও সুন্দর রূপ দিতে গিয়ে—অনেক সময় কবিতা রচনার চেয়েও বেশি সময় ব্যয় করতেন; যতক্ষণ অভীষ্ট সুন্দর ধরা না দিত, ততক্ষণ পর্যন্ত থামতেন না। নয়ন-শোভন অলঙ্কৃত লেখাঙ্কনের উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি পাণ্ডুলিপি সংশোধন করতেন না, পরিমার্জিত পাণ্ডুলিপির কাটাকুটির রেখাসমূহ নির্দিষ্ট রূপ লাভ করে লেখাঙ্কন হয়ে উঠত।

তৃতীয়তঃ চিত্রযোজিত লেখাঙ্কন। এই ধরণের লেখাঙ্কনে চিত্র বা হস্ত-লিপি কোনোটাই গৌণ নয়, বরং একে অন্যের উপর নির্ভরশীল—পরস্পর সম্পৃক্ত। লেখাঙ্কনের পার্শ্বে কোনো প্রতীকদ্যোতক কিংবা সংশ্লিষ্ট কবিতার ভাববাহক রূপ—পশু, মানুষ বা সাদৃশ্যগত গঠনভঙ্গী—তিনি এই ধরণের

লেখাঙ্কনে রচনা করতেন। এ ছাড়াও, কেবলমাত্র সংশোধনের খাতিরেই নয়, চিত্রসুলভ স্থান (space) ভরাটের খাতিরেও কখনো কখনো কবিতার পাণ্ডুলিপিতে তিনি চিত্রযোজনা করতেন। 'হে মাধবী ভীরু মাধবী' দ্বিধা কেন'—গীতিকবিতার পাণ্ডুলিপির (চিত্রাধিকারী শ্রীবরদা উকিল) লেখাঙ্কনে সংশোধনের চিহ্ন নেই ; হস্তলিপিকে শাদা অপরিসর স্থানে ছন্দোময় বন্ধনে নিবদ্ধ রেখে বাকি স্থান গাঢ় বর্ণে ঢেকে একপাশে সেই গাঢ় বর্ণের পটভূমিকায় যে নারীমূর্তি অঙ্কিত, সেই নারীমূর্তির কুসুম-রুচি পবিত্র কোমলতা বিধৃত দেহের শুভ্রতা গাঢ়বর্ণ পটভূমির উপর, অন্ধকারের বুকে প্রথম আলোর মত, স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। নারীমূর্তির ঋজু দেহভঙ্গীতে পুষ্পদণ্ডের ছন্দ, মাথা থেকে পা পর্যন্ত শরীরের মাঝখান দিয়ে নেমে আসা বক্ররেখায় যেন রহস্যের আভাস। 'অয়ি চিত্রলেখা দেবী, ক্ষম মোরে'—লেখাঙ্কন অন্য ধরণের : উপরার্ধে রেখাচিত্র, নিম্নে সংশোধন হীন মালার মত শ্রেণীবদ্ধ সুসমঞ্জস সমান্তর পংক্তিতে লিখিতা। এই লেখাঙ্কনের উপরার্ধে রচিত বিনতা নারী-মূর্তির রেখা চিত্রটি নিম্নার্ধের কবিতাটির সঙ্গে রেখা বা বর্ণ দ্বারা সংযুক্ত না-হয়েও কবিতাটির মর্ম ও চিত্রটির ভাব—উভয়ে উভয়ের সঙ্গে এমন একটি অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক স্থাপন করেছে যার দরুণ একে অন্যের নিছক পরিপূরক না-হয়ে শরীরের স্বাভাবিক প্রত্যঙ্গের মত অচ্ছেদ্য ঘনিষ্ঠ হয়ে গেছে।

ইদানীং আমাদের দেশে লেখাঙ্কনের প্রতি কোনো শিল্পী মনোযোগী নন। অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলাল বসু এবং বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় ভিন্ন চিত্রচর্চার এই অঙ্গের দিকে কারো দৃষ্টি পড়েনি।

'সাধারণতঃ ছবির ভাষা ব্যাখ্যা করাই এক দুরূহ ব্যাপার, গুরুদেবের ছবির ব্যাখ্যা তো অসম্ভব বললেই হয়। সে ছবি কেবল চোখ মেলে শ্রদ্ধার সঙ্গে দেখা ছাড়া বোঝবার আর কোনো প্রকৃষ্ট উপায় দেখিনে। শিল্পসৃষ্টি বিশ্লেষণের জিনিস নয়, বোধের জিনিস।' (নন্দলাল বসু, 'রবীন্দ্র চিত্রকলা' পুস্তকের ভূমিকা।)

রবীন্দ্রনাথ অঙ্কিত নিসর্গ চিত্রে পরিবেশ সৃষ্টির প্রতি সহজ আগ্রহ দেখা যায়। কী রেখায় রচিত কী বর্ণ রচিত—সমস্ত নিসর্গ চিত্রেই বৃক্ষরাজি নিবিড় ও ঘন, ডালে ডাল রেখে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে অরণ্যের আদিমতার প্রতিভূ রূপে। সে সব বৃক্ষ অশ্বথ কি অর্জুন, শমী কি দেবদারু—তা' বিবেচ্য

নয়, সে প্রশ্নই গৌন. তারা যে চরিত্রে ও গঠনে রূক্ষ সেইটেই প্রধান হয়ে উঠেছে। তাঁর বর্ণময় নিসর্গ চিত্রে কোথাও বন বনান্তরালবিদারী ক্ষীণ অথচ স্পষ্ট এক আলোকাভাষ, চিত্রের প্রাণবন্ত কেন্দ্রবিন্দুরূপে, চতুষ্পার্শ্বের গাঢবর্ণের মধ্যে আলোকিত লঘুবর্ণের সংহতি (Balance)—রেমব্রান্ট-অঙ্কিত চিত্রের রোমান্টিক ধর্মের মত উপস্থিত।

চিত্রশিল্প শিক্ষায় ড্রইং সম্বন্ধে পূর্ণ জ্ঞান—যাকে অ্যাকাডেমিক শিক্ষা বলা যায়, তা আবশ্যক হলেও স্বাধীন শিল্পচর্চায় এবং মহৎ শিল্পীব নিকট চিত্রে মধ্যযুগের উন্নাসিক দৃষ্টিভঙ্গীসুলভ যথাযথ হুবহু সাদৃশ্য (photographic quality) বজায়েব বক্ষণশীলতার কোনো মূল্য নেই। এই বাংলাদেশের শিল্পী ও সমালোচকদল ববীন্দ্রনাথ বচিত চিত্রের ভাবগত মূল্য সম্বন্ধে নিরুচ্চাব থেকে তাঁব ড্রইং-এব দুর্বলতার কথা বারবার তুলেছেন। হয়ত, যেহেতু ববীন্দ্রনাথেব চিত্রচর্চা গুরু-হীন চর্চা এবং কোনো শিল্পবিদ্যালযের চৌকাঠেও তাঁব পা পড়েনি,—তাই তাঁকে শিল্পী বলে মেনে নিতে আমাদেব দেশেব শিল্পীদের কেউ কেউ নারাজ। ববীন্দ্রনাথ self-schooled—ভাষা শিক্ষার জন্যও তিনি বিশ্ববিদ্যালযে যাননি। আলোকচিত্রধর্মী চিত্র অঙ্কন কবে তাঁকে যে ড্রইং না-জানাব দুর্ণাম অপনোদন করতে হবে, এমন দীন মনোবৃত্তি তাঁব ছিলোনা। দূবদর্শী কবি দেশের এই সমালোচনা সম্পর্কে সজাগ ছিলেন বলেই কি মিউনিকে বলেছিলেন, 'আমাব ছবি আমি পশ্চিমকে উপহার দিলাম।' গীয়ম আপল্যুনেযব কিউবিষ্ট শিল্পীদের স্বপক্ষে বলতে গিযে সোজা-সুজি বলেছিলেন, 'Real resemblance no longer has any importance, since everything is sacrificed by the artist to truth, to the necessities of a higher nature whose existence he assumes but does not lay bare'

রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক অঙ্কিত মানুষেব শরীরে, মুখাবয়বে নাক-কান-চোখ-ঠোঁট-হাত-পা-আঙুল-গলা প্রভৃতি গৌন, অঙ্কিত চরিত্রের ভাবটিই সর্বত্র স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

'সে' গ্রন্থের 'পুপে'—শীর্ষক মুখাবয়বটিকে সহজেই মদিগলিয়ানির প্রখ্যাত মুখ-চিত্র সমূহের সঙ্গে তুলনা করা চলে। চিত্রটির মুখাবয়বে নিগ্রো ভাস্কর্য-সুলভ গঠন অথচ লয় (contour) ও মনস্থে কালিঘাটের পটের সঙ্গে আত্মীয়তা। গলার ঈষৎ বাঁকানো ভঙ্গীতে, মুখের কোমল ভৌলে তরুণীর দীপ্ত সুষমা,

চিত্রের একদিক থেকে উঠে উপরে ঈষৎ অবনত হয়ে দাড়ের রেখাটি অন্য দিকে নেমে গিয়ে সব মিলিয়ে আপনার উপস্থিতিতে যে ত্রিভুজ রচনা করেছে, তা মুখের ত্রিভাকার আদলের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করেছে। স্পষ্ট, কোমল ওষ্ঠে মৃদু হাসির স্পর্শ চিত্রের সীমার মধ্যে মুখটি সুন্দরভাবে সংস্থাপিত।

তেমনি, রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক রচিত রাজশেখর বসুর মুখাবয়ব আমাদের, রাজশেখর বসু দেখতে কেমন ছিলেন, তা বলেনা—অথচ রাজশেখর বসু মানুষ কেমন ছিলেন, রসময় অথচ গম্ভীর বুদ্ধিদীপ্ত সেই মানুষটির চারিত্র প্রতীতি-ই স্পষ্ট করে তোলে।

ভগবান বুদ্ধকে কোনো শিল্পীই স্বচক্ষে দেখে তাঁর মুখাবয়ব অঙ্কন কিংবা পাথরে মূর্তি খোদাই করেননি। বুদ্ধের চরিত্র ও গুণ সম্পর্কে মানুষের মনে যে সিদ্ধরস জন্ম নিয়েছিলো, তাকেই ভিত্তি করে, বুদ্ধের মহানির্বাণ লাভের হাজার বছর পর অজন্তাগুহার চিত্রী বুদ্ধের চিত্র এঁকেছেন, গান্ধারের শিল্পী বুদ্ধমূর্তি রচনা করেছেন—রূপময় মহাভারতের সর্বত্র বুদ্ধমূর্তি নির্মিত হয়েছে। অজন্তা গান্ধার সারনাথ চীন জাপান সর্বত্র বুদ্ধমূর্তি—কিন্তু কোনোটির সঙ্গে কোনোটির সাদৃশ্য নেই, এক একটিতে এক এক চেহারার বুদ্ধ। অথচ এমন অমিল সত্ত্বেও, একটি সত্য স্পষ্ট—ঐ সমস্ত বুদ্ধমূর্তির চেহারায় ও গঠনে, সর্বাঙ্গে এমন একটি চরিত্র বিধৃত রয়েছে, যা আমাদের একলহমায় চিনিয়ে দেয়—এ মূর্তি কার। ধ্রুপদী ও মহৎ শিল্পে সাদৃশ্য বা বাস্তবতা বড়ো নয়, চরিত্রের স্পষ্টীকরণই বড়ো।

রবীন্দ্রনাথও হুবহু মুখাকৃতি আঁকেননি, মুখের অধিকারীর চরিত্রকে 'পটে লিখা ছবি'তে ধরে রাখতে চেয়েছেন। ব্যক্তির সমস্ত সত্তা মুখে, রেখায়, অভিব্যক্তিতে বিধৃত। রবীন্দ্রনাথ ধরাবাঁধা আঙ্গিক অনুসরণ করেননি বলেই তৎ কর্তৃক রচিত মুখচিত্রসমূহ এত জোরালো এবং প্রকাশভঙ্গী এমন অবাধ। 'খাপছাড়া', 'সে'—এই দুটি গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত চিত্র সম্বন্ধে এক কথা বলা চলে। রেখায় ও বর্ণে রচিত, উভয় ধরণের প্রতিকৃতি চিত্রণের মধ্যে আমরা একই শিল্পী-মেজাজ প্রত্যক্ষ করি। 'খাপছাড়া'র প্রতিকৃতি সমূহ মোটামুটি ব্যঙ্গার্থক—'সে' গ্রন্থের কিছু সংখ্যক প্রতিকৃতি সম্বন্ধেও এই কথা বলা চলে। রবীন্দ্রনাথ এই সব মুখচিত্র সেহাৎ চিত্রণের (illustration) খাতিরে করেননি, এদের উপস্থিতির প্রয়োজন ছিলো। এই সব মুখচিত্র

চিত্রিত অবয়বে তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য শরীরের, মুখের গড়নে, চোখে এমন ফুটে বেরোচ্ছে। 'দামোদর শেঠ'এর প্রতিকৃতির দুই সামান্য রেখার বন্ধনে সম্পূর্ণ ব্যক্তিটির পরিচয় ধরে রেখেছে। তেমনি, 'শ্রীমাত্রী হাজিয়েআনি কোরুন্নুনা'—নামক প্রতিকৃতিটি চিত্রিত-সত্যের সীমা পেরিয়ে আমাদের সঠিক চরিত্রের সঙ্গে পরিচিত করায়। মঙ্গোল নাসা, ওষ্ঠ, চক্ষু—এবং সর্বোপরি এক আশ্চর্য জাতিগত চরিত্র মুখটির সামগ্রিকতায়। খুব, সেই কারণেই, দৃশ্যের চেয়ে অনুভবকে ধরে রাখার খাতিরেই, কখনো কখনো জ্যামিতিক রীতিও অনিবার্যভাবে তাঁর মুখাবয়বে এসেছে। এমনকি আত্ম-প্রতিকৃতির মত সেন্টিমেন্টাল মূল্য বিশিষ্ট চিত্রকেও তিনি রেহাই দেননি, সাদৃশ্যতার চেয়ে ব্যক্তিমানসের গুরুত্ব প্রধান—তাঁর মুখাবয়ব অঙ্কনের এই ধ্রুব আত্মপ্রতিকৃতি অঙ্কনের সময়ও স্থির।

রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক অঙ্কিত জীবজন্তুর চিত্র সম্বন্ধেও একই কথা বলা যায়। যথাযথ ও নিখুঁত সাদৃশ্য এই শ্রেণীর চিত্রে গৌণ। জীবজন্তুর চেহারা চিত্রে স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি, ভাবরূপটিই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এই সকল চিত্রে অঙ্কিত জীবজন্তুর শারীর স্থান গঠনেও তিনি একই আদর্শ মেনেছেন। ভাবের আকৃতিকে প্রাধান্য দেওয়ার দরুণ তাঁর এই সকল চিত্রের জীব জানোয়ার স্বচ্ছন্দে আমাদের কল্পনায় বিচরণ করতে পারে। প্রকৃতিকে নকল না করে তিনি প্রকৃতিকে মনের মত করে গড়েছেন। এমন কি, কখনো বিশেষ জান্তব চরিত্র স্পষ্ট করতে গিয়ে তিনি একেবারে অবাস্তব জীব পর্যন্ত অঙ্কন করতে দ্বিধা করেননি। উদাহরনার্থে তাঁর অপূর্ব সৃষ্টি 'ঘণ্টাকর্ণ'-র নাম উল্লেখ করা যেতে পারে।

ষ্টিল লাইফ বা স্থির চিত্র অঙ্কনের সময় রবীন্দ্রনাথ আলোকচিত্রের রীতি অনুসরণ করেননি। জড়বস্তুর প্রচলিত রূপকে ভেঙে তিনি পছন্দমত রূপ দিয়েছেন। 'জলপাত্র চলবে কি'—এবং আরো কিছু স্থির চিত্রে পছন্দমত রূপারোপের সুন্দর নিদর্শন দেখা যায়। আধুনিক ইয়োরোপীয় চিত্রকরগণের স্থির চিত্রেও এই দৃষ্টিভঙ্গী মেলে।

রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক রচিত ছন্দোময় মূর্ত ও বিমূর্ত দ্রুত ধাবমান রেখায় বিধৃত গঠনভঙ্গীসমূহ ভারতবর্ষের চিত্রচর্চায় নবীনতম সংযোজন হিসেবেই নয়, আপন বৈশিষ্ট্যের জন্যও স্মরণীয়। এই সকল ভঙ্গীতে রঙের বাহুল্য নেই;

নিছক শাদা সমতলে গতিশীল রেখা—সম্ (contour) অনুযায়ী কোথাও মোটা কোথাও সরু ; রেখার প্রস্থ সর্বদা গঠন ও ছন্দকেই অনুসরণ করেনি। তাঁর বিখ্যাত উক্তি 'My pictures are my versification in lines. If by chance they are entitled to claim recognition, it must be primarily for some rhythmic significance of form which is ultimate, and not for any interpretation of an idea or representation of a fact'—এই শ্রেণীর চিত্রের পক্ষে সহজ প্রযোজ্য। এই সকল গঠনভঙ্গীতে রেখা ভাবের পরিপূরক বা আধার হয়ে থাকেনি, ভাবের অনুষঙ্গ হয়ে গতিশীল ছন্দকে বেঁধে রেখেছে।

রবীন্দ্রনাথের চিত্রাবলী কোনো বিশেষ আঙ্গিকের অন্তর্ভুক্ত, এমন দাবি করা যায়না। এমন আঙ্গিক-মুক্ত চিত্রকর আমরা ইতিপূর্বে দেখিনি। চিত্ররচনার যে উপকরণ যখন হাতের কাছে পেয়েছেন তাকেই তিনি কাজে লাগাতে দ্বিধা করেননি। কোনো নির্দ্দিষ্ট অঙ্কন পদ্ধতিও তিনি মানতেননা, এবং এই জন্যই তাঁর চিত্রসমূহ একঘেয়েমির দোষ থেকে মুক্ত। কোনো আঙ্গিক এবং রীতিনীতির বন্ধন স্বীকার করেননি বলেই তাঁর চিত্রের রেখা এমন স্বাধীন, স্বচ্ছন্দ, বর্ণ দুঃসাহসিক অথচ অকপট। কোনো চিত্রে যেমন একাধিক বিষয়ের ভিড় নেই, তেমনি অতিরিক্ত বর্ণও তার চিত্রে অনুপস্থিত। বর্ণ সম্পর্কে তাঁর ধারণা সম্পূর্ণ নূতন ও নিজস্ব। কোনো সচেতন শিল্পীর মত তিনি উষ্ণ কোমল পর্যায়ের পরস্পরবিরোধী বর্ণ-ব্যবহার কিংবা চিত্রের সমতা (balance) রক্ষার খাতিরে এক বা একাধিক সমধর্মী বর্ণ প্রয়োগ করেননি। তাঁর কোনো চিত্রই পূর্বপরিকল্পিত নয়, আন্তরিক অপ্রবুদ্ধ প্রেরণা বিভিন্ন উপকরণের মাধ্যমে চিত্ররূপে প্রকাশিত হয়ে সৃষ্টির অবিকল্প বিস্ময়ে তাঁকেই অভিভূত করত।

কোনো সংবদ্ধ ভাবনার হুবহু প্রতিরূপ নয়, আঁকতে বসে যা জোত,—তাই তাঁর রেখা চঞ্চল, গঠনভঙ্গী আলোকচিত্র সুলভ নয় এবং মনোমত রূপ ধরা না দেওয়া পর্যন্ত হাত অক্লান্ত। ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে বর্মিংহম মেল্-এ রবীন্দ্রনাথের চিত্রকর্মের আলোচনা প্রসঙ্গে কেন্স্ স্মিথ লিখলেন, 'We have exquisite handling of line and form in which human figures derive their beauty and their value as a design not from direct resemblance to human figures, but rather from the

quality of the line by which those figures are expressed'. আসলে, 'অবচ্ছিন্নগুণের (abstract) ধারণা বিচার বিশ্লেষণের কাজে লাগে' (নন্দলাল বসু)—এই উক্তির চরম পরাকাষ্ঠা আমরা রবীন্দ্রনাথের চিত্রকর্মে দেখতে পাই ; আঙ্গিক বা প্রচলিত নীতির অনুসরণ সেখানে একান্ত গৌণ। তাঁর বর্ণের ধারণাও (conception) সম্পূর্ণ নিজস্ব। কালো পটভূমিকায় রক্তকুসুম, ঘন ব্রাউনের উপর কালো—এবম্বিধ দুঃসাহসিক বর্ণপ্রয়োগের অভিজ্ঞতা তাঁর চিত্র থেকে পাওয়া যায়। তাঁর চিত্রাবলীর বর্ণ-সংযোজন মিষ্টিক—রহস্যধর্মী। অরণ্যের নিবিড় ছায়া ইতস্তত প্রলেপে রূপায়িত—এবং ঘন বনান্তরাল ভেদ করে দূরলগ্ন আলোর ক্ষীণ রশ্মি ইত্যাদি রেমব্রাণ্টের চিত্রের কথা সহজেই মনে করিয়ে দেয়। রবীন্দ্রনাথের চিত্রে লাল কালো ব্রাউন সবুজ পরস্পর আপাত অবাঞ্ছিত বর্ণের সহাবস্থান, পশুর গাত্রে গাঢ় চাপ চাপ বর্ণের অসতর্ক প্রয়োগের সাহায্যে আদিমতা প্রকাশ, নূতন ধরণে শারীর সংস্থান—ইত্যাদি লক্ষ্য করে ইয়োরোপের বিভিন্ন সমালোচক ইয়োরোপের চিত্রশিল্পজগতের বিভিন্ন এষণার সঙ্গে রবীন্দ্র-চিত্রকর্মের আত্মীয়তা বোধ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক অঙ্কিত পশুর চিত্রের সঙ্গে নরওয়ে দেশের শিল্পী এডওআর্ড মুশেঁর,—মুখাকৃতির সঙ্গে জর্মানির নল্ডের,—এমনকি সুররিয়ালিষ্ট পল্ ক্লীর চিত্রাবলীর সাদৃশ্যতা, ভ্যান্ গগের ন্যায় বর্ণপ্রয়োগ, ওডিলোন রেডনের ন্যায় macabre fantasy পর্যন্ত আবিষ্কার করেছিলেন। তবু, রবীন্দ্রনাথের চিত্রাবলী কোনো বিশেষ ধারা বা মতবাদের অন্তর্ভুক্ত নয় —এ এক সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ধরণের চিত্রকর্ম, যার সম্বন্ধে অবনীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'It was unique His art was his very own এই নিজস্বতার দরুন রবীন্দ্রনাথের বর্ণপ্রকরণ সংস্কারমুক্ত। কালি, জলবর্ণ, পোষ্টার কলর, রঙীন পেন্সিল—সব উপাদান ইচ্ছেমত ব্যবহার করেছেন। এমনকি, দ্রুতক্রিয়াশীল মনের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষায় তুলি অপবাগ মনে হলে চিত্রে সোজাসুজি আঙুলের সাহায্যেও বর্ণপ্রয়োগ করেছেন। হৃদয়ের আবেগ ক্ষীণ-পেন্সিল সইতে পারতনা বলে পটাপট ভেঙে যেত। অধিকাংশ চিত্ররচনার সময় পুরো পেন্সিলের একটা হাল্কা খসড়া ছকে নিয়ে কোথাও ঈষৎ বা গাঢ়ভাবে পেন্সিলে ঘষে দিতেন—যার ফলে বর্ণপ্রয়োগের পরে অদ্ভুত টোন সৃষ্টি হোত। একই চিত্রে পেলিক্যান কালি, জলবর্ণ, রঙীন পেন্সিলের সহাবস্থানও বিরল

নয়। অপবর্ণ" এবং এই জাতীয় রাসায়নিক বর্ণ উচিত বর্ণসম্পাতের পক্ষে অপ্রতুল বলে প্রতীয়মান হলে তিনি চিত্রে নানাবিধ ফুলের পাপড়ি, পাতা ঘষে মানানসই টোন্ আনতেন। তৈলচিত্র সুলভ ঔজ্জ্বল্য আরোপ করার মানসে কখনো চিত্রের উপর নারকেল তেল মাখিয়ে রোদে কি ছায়ায় শুকিয়ে পরীক্ষাও করতেন। কোনো রক্ষণশীল বা পরম্পরাগত সংস্কার তাঁর স্বাধীন চিত্তবৃত্তিকে অবদমিত ক'রে রাখেনি।

রবীন্দ্রনাথের অমর্ত্যসম্ভব প্রতিভার শেষতম এবং সেই সঙ্গে বিস্ময়কর উন্মোচন তাঁর আড়াই হাজার সংখ্যক চিত্রকর্ম। তাঁর কথায়, 'ছবি হোল আমার শেষ বয়সের প্রিয়া, তাই নেশার মত আমাকে পেয়ে বসেছে।' এবং এই নেশার ফলশ্রুতিই স্বল্পকালের মধ্যে অঙ্কিত এত বিভিন্ন বিচিত্র ও বিপুল চিত্র। ১৩৪৭ বঙ্গাব্দের পয়লা বৈশাখ জীবনের শেষ প্রান্তে পৌঁছেও একই দিনে একাধিক চিত্র রচনা করেছেন। ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে চিত্রকর হিসেবে তাঁর আবির্ভাবের জন্য কেউই প্রস্তুত ছিলনা, তাই তাঁর এমন আবির্ভাব অনেককেই হতবুদ্ধি করেছিল ; কিন্তু, আজকের বুদ্ধিবান আলোচক অন্ততঃ দুটি কারণে রবীন্দ্রনাথের চিত্রকর রূপে আবির্ভাবের প্রয়োজনীয়তা ও যৌক্তিকতা স্বীকার করবেন এবং রবীন্দ্রনাথ অঙ্কিত চিত্রাবলীর, সেই পরিপ্রেক্ষিতে, মূল্যায়নে প্রবৃত্ত হবেন। এক, বেঙ্গল স্কুলের পরগাছারূপী বিকৃত ভাববিলাসকে তিনি অস্বীকার করেছিলেন। বেঙ্গল স্কুলের চরম উৎকর্ষ অবনীন্দ্রনাথ গগনেন্দ্রনাথ ও নন্দলাল বসুতেই সম্পূর্ণ। পুরাণ-কৈবল্যে মোক্ষকামী শিল্পীদের এবং শিল্পে তথাকথিত জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসীদের প্রতি তাঁর চিত্রাবলী প্রত্যক্ষ বিদ্রোহস্বরূপ। দুই, বেঙ্গল স্কুলের পাশাপাশি দেশের আরেক শিল্পীগোষ্ঠী যখন অ্যাকাডেমিক যথাযথবাদের গণ্ডীতে আবদ্ধ, তখন রবীন্দ্রনাথ অ্যাকাডেমিক যথাযথবাদকেই একেবারে অস্বীকার করলেন। চিত্রের ত্রি-মাত্রিক ধর্মের দাবিও তিনি আনলেন না। দুই শ্রেণীর চিত্রবিদদের চিত্রকর্মের মূল অভাব কী, তাঁর চিত্রাবলী চোখে আঙুল দিয়ে তা দেখিয়ে দিয়েছিল ; তাই তখন তাদের মনে হয়েছিল রূঢ়, আকস্মিক এবং হতবুদ্ধিকর। তিনি আমাদের পারিপার্শ্বিক জগতকেই নূতন করে চিনিয়েছিলেন, নূতন দৃষ্টিভঙ্গী সৃষ্টি করেছিলেন, শিখিয়েছিলেন প্রচলিত সংস্কারের প্রতি অন্ধ ও অর্থহীন শ্রদ্ধা সৃজনশীল শিল্পীর ধর্ম নয়।

শোভন সোম

মানবতান্ত্রিক ঐতিহ্য ও রবীন্দ্রনাথ

নির্মল মুখোপাধ্যায়

ধ্রুপদী মনুষ্যধর্মের প্রতি প্রত্যয়বান একজন মহৎ বাঙালী কবি রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে কয়েকটি গভীর ইঙ্গিতপূর্ণ উক্তি করেছেন। তিনি বলেছেন, "রামমোহন থেকে বঙ্কিমচন্দ্র পর্যন্ত অগ্রণীরা যে সার্বভৌম সংস্কৃতির স্বপ্ন দেখেছিলেন, সন্ধান পাননি, সেই কল্পনাবিলাসকে এই পাণ্ডববর্জিত দেশের দৃষ্টিগোচরে এনেছেন রবীন্দ্রনাথ; আমরা সকলে যেহেতু সেই প্রবাহেরই বুদ্‌বুদ, তাই আমাদের পক্ষে তার গতি-অগতির বিচার বা উপকার-অপকারের আলোচনা শুধু অশোভন নয়, দুষ্করও।" " রবীন্দ্রনাথ আধুনিক বাঙালীর যথাসর্বস্ব হলেও, তাঁর বিশ্ববীক্ষা অত্যল্পকালের মধ্যে বাংলার ঐতিহাসিক তথা ভৌগোলিক চতুঃসীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিল, এবং যে একদেশদর্শী শুভবাদ তাঁর প্রাকাব্যের উত্তরসাক্ষ্য, তাতে ধ্রুপদী মনুষ্যধর্মের সর্বাঙ্গীন সামঞ্জস্য নেই বটে, কিন্তু মহামানবের প্রতিনিধিত্বে তাঁর পদমর্যাদা ব্যাস, হোমর ও শেকস্‌পীয়র-এর সমান।" (সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, কুলায় ও কালপুরুষ)। শুধু রবীন্দ্রনাথের নয়, আমাদের বুদ্ধিগত মানসের স্বরূপ অনুধাবনের স্বার্থেও রামমোহন থেকে যে সার্বভৌম সংস্কৃতির সূচনা হয়েছিল এবং যে 'বিশ্ববীক্ষা' রবীন্দ্রনাথের ধ্যান-কল্পনা, ভাবনা, অনুভূতি-অনুভব ও সৃষ্টিকর্মের মধ্য দিয়ে রূপায়িত হয়ে উঠেছে এবং পরিশেষে যা সমসাময়িক মনুষ্য-সাধনা-সিদ্ধি ও ঐতিহ্যের সঙ্গে যুক্ত হতে চেয়েছে, সেই সমগ্র ধারা ও প্রবাহের উপলব্ধি বোধহয় একাধিক অর্থে ঐতিহাসিক-দায়িত্বযুক্ত ও মানবিক তাৎপর্যপূর্ণ। বিগত কয়েকবছর ধরে রবীন্দ্রনাথের ভাবনা ও সৃষ্টিকর্ম এবং ব্যক্তিত্বকে অনুধাবনের চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু, অনেকস্থলেই পরিপ্রেক্ষার ভ্রান্তি বড়ো বেশি স্পষ্ট। অবশ্য, আমিও জানি যে, রবীন্দ্রনাথ মূলত ও শেষপর্যন্ত তাই যা তিনি স্বয়ং নিজেই বার-বার ঘোষণা করে গেছেন—অর্থাৎ, তিনি কবি, তত্ত্বে তাঁর তেমন অধিকার ছিলনা এবং তত্ত্বজ্ঞানী হিসেবে তাঁর ব্যক্তিত্ব অনুধাবন করা অনুচিত। তবুও, শিল্পকর্ম ও সৃষ্টিকর্মের এবং কবি-ব্যক্তিত্বের বিকাশধারা ও পরিণতির কোনো

উপলব্ধির ক্ষেত্রে একটা ঐতিহ্য-চৈতন্য-অজ্ঞাত দৃষ্টি অনিবার্য হয়ে পড়ে বলে মনে হয়। শিল্প-বিচারের ক্ষেত্রে ঐতিহ্যের বিচার-প্রসঙ্গ উপস্থিত করে কবি-সমালোচক এলিয়ট যে 'historical sense' এর কথা বলেছেন, আমার মতে, সেইটে শিল্প-বিচারের ক্ষেত্রে অপরিহার্য। অধিকন্তু, শুধু শিল্পরূপের আস্বাদনের মধ্যে এবং ওই রূপের ভাষাগত বিশ্লেষণের মারফৎ কি ভাবে শিল্পকর্মের সমগ্রতার উপভোগ সার্থক হয়ে উঠে এবং মহান ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব, কবি সুধীন্দ্রনাথ যাকে কবি-প্রতিভা বলেছেন, যথার্থ ভাবে উদ্‌ঘাটিত করা যায়, সেইটে বুঝতে কষ্ট হয়। শিল্পকর্মের মূল্যায়নে রসের বিচারই শেষ পর্যন্ত কিভাবে চরম বিচার বলে গণ্য হয় তা যেমন মানতে বাধা পাই, তেমনই রিচার্ডসের নির্দেশ অনুকরণেও তৃপ্তি লাভ করা যায় না। বিপরীতদিকে আমার বক্তব্য এই নয় যে, মার্ক্সের (ম্যাক্স শেলারের নয়) প্রভাবযুক্ত কার্ল ম্যানহাইমের জ্ঞানের সমাজতন্ত্রের শিল্প-বিচার পদ্ধতি এবং মূল্যবোধ ও—আদর্শগত রূপায়নের সমাজ-নির্দিষ্টতা সমধিক উৎসাহব্যঞ্জক। এই প্রসঙ্গেই আধুনিক দর্শন ও বিজ্ঞানের একটি সমস্যাগত দিক উল্লেখ করা সমীচীন মনে করি। কেননা, শিল্পকর্মের মূল্যায়নের ক্ষেত্রে শুধু রূপের আস্বাদ ও বিশ্লেষণ একদিকে সাবেকি গূঢ়ার্থবাদের দিকে এবং অন্যদিকে, সমসাময়িক দৃষ্টবাদ বা positivism এর দিকে অনিবার্যভাবে নিয়ে গিয়েছে। বিশুদ্ধ বিষয়ানুগত প্রত্যয় ও ধারণা (pure objectivity) গ্রহণ করে দার্শনিক দৃষ্টবাদের যে ব্যাপক বিস্তার ও প্রতিষ্ঠা ঘটেছে তাতে মূল্য ও তথ্য, বিষয় ও বিষয়ী, বিজ্ঞান ও দর্শন, এবং দর্শন ও ইতিহাসের মধ্যে একটা চিন্তাগত বিপর্যয় ঘটেছে। বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের ক্ষেত্রে বিষয়ীর ভূমিকা কত দূর এবং বিজ্ঞান একান্তভাবেই বিষয়গত (objective) কিনা, এ-প্রশ্ন আজ খুবই প্রবল। অর্থাৎ, বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের ক্ষেত্রে বিষয়ীর ধ্যান-ধারণা, ও মৌল মূল্যবোধের অনুপ্রবেশ ও সক্রিয়তা যদি স্বীকার করতে হয় তবে এই প্রশ্নও প্রায় চরম হয়ে ওঠে যে, মানুষী জ্ঞানের স্বরূপ বিশ্লেষণে objectivity বা subjectivityর তর্ক মূল্যহীন। বিজ্ঞানের প্রতিজ্ঞার অর্থ-অনুসন্ধান ও তাৎপর্য উদ্‌ঘাটনে যেমন একটা নতুন মাত্রাবোধ অনিবার্য হয়ে পড়ছে তেমনই শিল্পকর্মের রূপ ও প্রকৃতির অনুধাবনও উপলব্ধির ক্ষেত্রে নতুন একটা মাত্রাবোধ যুক্ত করা বোধ হয় আরো বেশি প্রয়োজন বলে মনে

হয়। কবিপ্রতিভা ও কবিকর্মের স্বরূপ উদ্‌ঘাটনের ক্ষেত্রে জ্ঞানতত্ত্বের প্রসঙ্গ উল্লেখ করলাম এই জন্যই যে, শেষপর্যন্ত শিল্পকর্মের উপলব্ধি ও আস্বাদন প্রক্রিয়া ব্যাপারটাও জ্ঞানতত্ত্বের অঙ্গীভূত এবং শিল্প বিচারের জটিলতম সমস্যাগুলিও ক্রমপ্রসারিত জ্ঞানতত্ত্বের পরিপ্রেক্ষিতেই ক্রমশঃ স্পষ্টতর হয়ে উঠবে। ভাষাগত, ধ্বনিগত, আচারগত, অনুমানগত, এবং ভাব ও নানা আদর্শগত রূপগুলি কিভাবে এবং কেমন ধারায় পরস্পরযুক্ত হয়ে মানুষী ইতিহাস গড়ে তোলে এবং কিভাবে তাদের যুক্ত প্রবাহধারায় একটি ইঙ্গিতপূর্ণ শিল্প বা সৃষ্টিকর্মের প্রকাশ ও বিকাশ ঘটে, সেইটে বুঝে দেখা দরকার। আর্নষ্ট ক্যাসিরের-এর ব্যাপক মানবতন্ত্রী দর্শন এই প্রসঙ্গেই ক্রমশঃ অর্থযুক্ত হয়ে উঠছে। ইতিহাস দর্শন, বিজ্ঞান, সাহিত্য ও শিল্প অর্থাৎ, মানুষী কর্মের বিভিন্ন প্রকাশ ও স্বরূপ বিকাশের ক্ষেত্রে অর্থ, মূল্য, ভাব ও আদর্শের স্রষ্টা ও দ্রষ্টা মানুষকে বিচ্ছিন্ন বিশ্লেষণের প্রচেষ্টা ও প্রবণতা গ্রাহ্য বলে মনে হয়না। বর্তমান আলোচনার মধ্যে এই মন্তব্যগুলোর হয়তো তেমন প্রত্যক্ষ যোগাযোগ নেই—কিন্তু, ভারতবর্ষে রবীন্দ্রনাথের মতো এবং ইউরোপে দান্তে, সেকস্‌পীয়র ও গ্যেটের মতো শিল্পী ও শিল্প-প্রতিভা বিচারে এই একথাগুলো স্মরণীয়। মানুষী মূল্যবোধের বিভিন্ন রূপ ও বিবর্তন রবীন্দ্রনাথের কবি-প্রতিভা ও ব্যক্তিত্বের মাধ্যমে উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। শিল্পকর্ম ও কবি-প্রতিভার মাধ্যমে মূল্যবোধের নতুন প্রতিষ্ঠা ও প্রকাশ ঘটে এবং মহৎ ব্যক্তিত্ব মূল্যবোধের গভীরতর আত্ম-সমীকরণের ইঙ্গিতময় রূপ। ব্যক্তি-মানুষই মূল্যবোধের স্রষ্টা ও দ্রষ্টা এবং তার ধারক বাহক। মহৎ ব্যক্তিত্ব ওই ব্যক্তি-পুরুষ ও মানুষেরই মূল্যঘন সত্তা।

২

এ ইতিহাস-জ্ঞান ও অনুভব কম-বেশি সবারই আছে যে, রবীন্দ্রনাথ উনিশ-শতকের চিত্ত-জাগরণ এবং নবা আবিষ্কৃত মূল্যবোধের পটভূমিতেই বড়ো হয়ে উঠেছেন। কিন্তু, ওই চিত্তজাগরণের যথার্থ স্বরূপ বিশ্লেষণ হয়তো আজও তেমন হয়নি—তথ্যের অতিরিক্ত সার্থকতর দৃষ্টির পরিচয় তেমন একটা পাইনা। সেইজন্যই, কখনও কখনও রবীন্দ্র-প্রতিভার স্বরূপ বিশ্লেষণে কয়েকটি বাঁধা-ধরা ফরমূলা বা মতবাদের সাহায্য অনিবার্য হয়ে পড়েছে। মনে করা

হয় যে, রবীন্দ্রনাথ ভারতের রামমোহন-প্রতিষ্ঠিত সমন্বয়ী চিন্তা ও মূল্যবোধেরই সার্বভৌম প্রতিনিধি। এই উক্তি যথার্থ পরিপ্রেক্ষিতে অনুধাবন করা সমীচীন। কারণ, রামমোহন যে সংস্কৃতির প্রতিষ্ঠা বা স্বপ্ন দেখেছিলেন এবং যে সংস্কৃতি থেকে আজ আমরা অনেক দূরে সরে গিয়েছি, সেই সমগ্র স্বপ্ন ও সংস্কৃতির সমগ্ররূপ রবীন্দ্রনাথে ধ্বনিত ও প্রতিবিম্বিত কিনা; এ-প্রশ্নও স্বাভাবিক। অবশ্যই, মনে রাখতে হবে যে, রবীন্দ্রনাথ একান্তভাবেই শিল্পী এবং তাঁর জীবন-দর্শন, সমাজ-দর্শন, রাষ্ট্র-চিন্তা তাঁর নিজস্ব শিল্প-প্রতিভার অঙ্গ হিসেবেই প্রতিভাত। দ্বিতীয়ত, এ তথ্যও মনে রাখার মতো যে রামমোহন-উদ্বোধিত চিন্তা প্রথম হতেই মূলত স্ব-বিরোধযুক্ত এবং তাঁর মৃত্যুর পরে সে-স্ববিরোধ অতিক্রান্ত স্পষ্ট, ব্যাপক হয়েছিল। মূল্যবোধের সেই দেশান্তর ও বিবর্তনও রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং প্রত্যক্ষ করেছিলেন। তৃতীয়ত, রবীন্দ্রনাথ শুধু উনিশ শতকের স্ব-বিরোধযুক্ত চিত্ত-জাগরণের মহৎ সৃষ্টিশীল প্রতিনিধি নন, বিশশতকের ব্যাপক ও সর্বগ্রাসী স্ব-বিরোধযুক্ত সভ্যতার আবহে গড়ে-উঠা ব্যক্তিপুরুষও। সমসাময়িক সভ্যতা ও মূল্যবোধের ব্যাপক বিপর্যয়ের মধ্যে থেকে রবীন্দ্রনাথ মানুষী মূল্যবোধের চিরন্তন ও শাশ্বত ঐতিহ্য ও স্বরূপের দিকে আমাদের দৃষ্টি ফেরাতে চেয়েছিলেন। যুক্তি ও ইতিহাসের বিচারে ওই প্রচেষ্টা অসম্পূর্ণ কিংবা অপূর্ণ সেইটেও আমি কিছুটা ইঙ্গিত করেছি। ওই সমগ্র ব্যাপারটি আরো বেশি স্পষ্টতর হবে যদি এ-প্রসঙ্গে উনিশ-শতকের চিত্তজাগরণের যথার্থ স্বরূপ এবং সেই সঙ্গে ইয়োরোপীয় যুক্তিবাদী উদারনৈতিক ও একান্তযুক্তি-আশ্রিত সভ্যতার মৌল সংকটটি বুঝে দেখা যায়।

৩

ইংরেজি শিক্ষা এবং রামমোহনের মাধ্যমে সমাজ দর্শন ও ঐতিহ্য এবং ধর্মবোধ সম্বন্ধে যে মৌল ধারণা গড়ে উঠতে চেয়েছিল, তা রবীন্দ্রনাথের নিজের ভাষাতেই খুব ভালভাবে ব্যক্ত করা যায়, "য়ুরোপীয় চিত্তের জাগরণশক্তি আমাদের স্থাবর মনের উপর আঘাত করে, বৃষ্টিধারা মাটির 'পরে ভূমিতলের নিশ্চেষ্ট অন্তরের মধ্যে প্রবেশ করে' প্রাণের চেষ্টা সঞ্চার করে দেয়, সেই চেষ্টা বিচিত্র রূপে অঙ্কুরিত বিকশিত হতে থাকে।" "......য়ুরোপের সংস্রব একদিকে আমাদের সামনে এনেছে বিশ্বপ্রকৃতিতে কার্যকারণবিধির

সার্বজনীনিকতায়, আর একদিকে ন্যায়-অন্যায়ের সেই বিশুদ্ধ আদর্শ যা কোনো শাস্ত্রবচনের নির্দেশে, কোনো চিরপ্রচলিত প্রথার সীমারেখা বেষ্টনে, কোনো বিশেষ শ্রেণীর বিধিতে খণ্ডিত হতে পারেনা।" (কালান্তর)

অবশ্যই স্বীকার্য, রেনেশাঁসী মানবতন্ত্রে দৈব-শাসন-মুক্ত মানুষী স্বাধীনতার প্রথম প্রতিষ্ঠা ঘটেছে এবং ব্যক্তিমানুষের অপরিসীম সম্ভাবনার প্রতি বিশ্বাস গড়ে উঠেছে। অন্যদিকে, কোপারনিকাস, দেকার্তে, হবস্, লক, বেকন, ব্রুনো, গ্যালিলিও, নিউটন, প্রমুখদের বিজ্ঞানবোধ ও দার্শনিক চিন্তায় বুদ্ধির সার্বভৌমিকতা, যুক্তি ও কার্য-কারণ নিয়ন্ত্রিত বিশ্বভুবনের স্বরূপ এবং মানুষী আচরণের বিভিন্ন দিক নির্দেশ করা হয়। নিয়মশাসিত বিশ্বভুবনে মানুষী অস্তিত্বের একটা ধারণা যুক্ত হয়ে সমাজ ও রাষ্ট্র-চিন্তায় উদারনীতিবাদের প্রতিষ্ঠা ঘটে। রাষ্ট্রের সঙ্গে ব্যক্তির, ব্যক্তির সঙ্গে সমাজ ও মনুষ্য-সৃষ্ট বিধির, সমাজের সঙ্গে ব্যক্তিস্বাধীনতার সংযোগ এবং নিয়ম-শাসিত বিশ্ব-জগতের সঙ্গে তাদের আন্তর যোগাযোগ—এই সব প্রশ্নগুলো উদারনীতিবাদ ও যুক্তিবাদের বিভিন্ন ধারার মধ্যে ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠতে সুরু করেছিল। উদারনীতিবাদ যুক্তিবাদ ও মানবতান্ত্রিক ব্যক্তি-প্রত্যয়ের একটা চরম পরিণতি ঘটে আঠারো শতকের সমাজ ও দার্শনিক চিন্তায়, ক্যাসিরের যাকে 'philosophy of enlightenment' বলে ব্যাখ্যা করেছেন। এখানে একদিকে রেনেশাঁসের নিরীশ্বরবাদী ধারার চরম বিকাশ লাভ করেছে। অন্যদিকে আবার মানুষী মূল্যবোধগুলোর গভীরতর সমস্যা দেখা দিতে সুরু করেছিল। মানুষী অস্তিত্ব সম্বন্ধে পাস্‌কাল যে চরম প্রশ্ন তুলেছিলেন, ভল্‌তেয়ারের বস্তুতান্ত্রিক চিন্তায় তার কোন ইঙ্গিত খুঁজে পাওয়া গেলনা। নিউটনীয় বলবিদ্যা-জাত ধারণার সঙ্গে মূল্যবোধের বিরোধও ব্যক্ত হয়ে পড়লো কান্টের দার্শনিক তত্ত্বে —নাউমিনা ও ফিনমিনার মধ্যে চরম সীমারেখা টানার মধ্য দিয়ে। আরো কিছু পরে সৃষ্টিকর্মের ক্ষেত্রে সৃষ্টিশীল মনের ও চিত্তের স্বাধীনতার অনুসন্ধান ব্যাপক হয়ে উঠলো। আঠারো শতকের যুক্তিবাদী, বুদ্ধিবাদী ও প্রাকৃতিক নিয়ম-শাসিত দৃষ্টির প্রতিক্রিয়া হিসেবেই রোমান্টিক কাব্য-সাহিত্যের সূচনা।[৮] এ-ক্ষেত্রে, হোয়াইটহেডের অনুমান হয়তো অনেকটা যথার্থ। আমার মনে হয়, হেগেলের দ্বন্দ্ববাদ, মার্ক্সের সমাজতন্ত্রবাদ, এবং তারই পাশে গড়ে-উঠা কিয়েকের্গার্ডের অস্তিত্বতান্ত্রিক চিন্তা যুক্তিবাদ, বুদ্ধিবাদ ও মানবতান্ত্রিক চিন্তার

স্ববিরোধেরই বিভিন্ন রূপমাত্র। দার্শনিক চিন্তার চরম ও পরমের সন্ধানে তাই হেগেল-পরবর্তীকালে ব্রাড্‌লী, বোসানকেট, বের্গসঁ, আলেকজাণ্ডার, হোয়াইটহেড ও কলিংউড আত্ম-মগ্ন হয়ে পড়েছিলেন। আর বিপরীত দিকে মার্ক্সবাদ, এবং অধিবিদ্যাবিরোধী দৃষ্টবাদ ক্রমশ ক্রমশ প্রতিষ্ঠিত হয়ে বিশ-শতকের বুদ্ধিজীবী চিত্তকে আন্দোলিত করে তুলেছে। ব্রহ্মবাদ ও বিষয়-কেন্দ্রিক চিন্তার প্রতিতুলনায় কিয়ের্কেগার্ডের বিষয়ী-আশ্রিত মনোভাব ও প্রত্যয় বিশশতকেরই রেনেশাঁস-আশ্রিত মানবতন্ত্রের সার্বিক সংকটের আবহেই ক্রমশঃ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। অর্থাৎ, যে যুক্তিবাদী এবং মানবতান্ত্রিক আদর্শ ঘোষিত ইউরোপীয় চিন্তা ও জ্ঞানের সঙ্গে উনিশ শতকে ভারতের চিত্ত-সম্মিলন ঘটেছিল, সেই ধ্যান ও কল্পনা, বুদ্ধি ও যুক্তির গভীরেই একটা শূন্যতা এবং একটা স্ব-বিরোধ প্রচ্ছন্ন ছিল। মানব-অস্তিত্বের চরম প্রশ্নের ক্ষেত্রে যে সমগ্রবোধ, ঐক্যবোধ, এবং যে কাল-বিধৃত অথচ কালোত্তীর্ণ অনুভবের প্রেরণা সক্রিয় থাকে (যা মানুষের ইতিহাসে চিরদিন ধর্মের মাধ্যমে মানুষকে উদ্বোধিত ও স্পন্দিত করেছে) আঠারো শতকের যুক্তিবাদী ধ্যান ও কল্পনার মধ্যে কিংবা হিতবাদের মধ্যে তা খুঁজে পাওয়া যায়নি।

প্রথমিক পর্যায়ে পারসী ভাষার মাধ্যমে ইসলাম ধর্মের যুক্তিবাদ ও বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধ, দ্বিতীয় পর্যায়ে হিন্দু-দর্শন ও বৈদান্তিক ব্রহ্মবাদ এবং সর্ব্বশেষ পর্যায়ে রেনেশাঁস-উত্তর ইয়োরোপীয় নব্য জ্ঞান ও যুক্তিবাদ রামমোহনের মানস-চেতনাকে বিকশিত করে তুলেছিল। হিউম, গিবন, পেইন, ভলতেয়ার, ভলনি প্রমুখ যুক্তিবাদীর নির্দেশে তিনি কুসংস্কার, অন্ধতা স্থবিরতা, গোঁড়ামি থেকে মুক্তি পেয়ে নির্মোহ দৃষ্টিলাভ করেছিলেন সত্য কিন্তু ইসলাম, খৃষ্টধর্ম ও বৈদান্তিক ব্রহ্মবাদই তাঁকে মানুষী অস্তিত্বের চরম মূল্যের এবং সার্থকতার নির্দ্দেশ দিয়েছে। অধিকন্তু, রামমোহনও মনে করেছিলেন, যেমন আধুনিক অনেক খৃষ্টধর্মীয় পণ্ডিত মনে করছেন যে, রেনেশাঁস ও রিফরমেশন এই মানুষী স্বাধীনতা ও মুক্তি সঞ্চারের দুইদিক মাত্র। কাজেই, উনিশ শতকের নব-জাগরণের সূচনা থেকেই বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদ এবং বৈদান্তিক ব্রহ্মবাদ সমন্বিত সমগ্র সত্তারূপে প্রতিভাত হয়েছে। ইয়োরোপীয় জ্ঞান, যুক্তিবাদ ও ফরাসী বিপ্লবের মহান স্বাধীনতা প্রত্যয়ের সঙ্গে যুক্ত হয়ে রবীন্দ্রনাথ রামমোহনের মতোই আহ্বান করেছিলেন যে, "একদিন আমাদের দেশে সাধকেরা ব্রহ্মকে

যেমন আশ্চর্য উদার করিয়া দেখিয়াছিলেন এমন কোন দেশেই দেখে নাই।......সত্যং জ্ঞানং অনন্তং ব্রহ্ম যিনি, তাহারই মধ্যে মানবচরিত্রের এরূপ পরিপূর্ণ আনন্দময় মুক্তির বার্তা এমন সুগভীর রহস্যময় বাণীতে অথচ এমন শিশুর মতো সরল অকৃত্রিম সহজ ভাষায় উপনিষদ ছাড়া আর কোথায় ব্যক্ত হইয়াছে? আজ মানুষের বিজ্ঞান তত্ত্বজ্ঞান যতদূরই অগ্রসর হইতেছে, সেই সনাতন ব্রহ্মোপলব্ধির মধ্যে তাহার অন্তরে বাহিরে কোন বাধাই পাইতেছেনা।" (রবীন্দ্রনাথ, ধর্মের নবযুগ)।

উনিশ শতকের চিত্তজাগরণের এই দ্বৈত-স্বভাব স্বভাবতই হিন্দুজাতিবাদের ক্রমবিস্তার ও বিকাশের মধ্য দিয়ে ক্রমশ প্রকট হয়ে উঠতে সুরু করে। ব্রাহ্মসমাজের আত্মবিবোধ, কেশবচন্দ্র সেনের ক্রমবর্দ্ধমান ধর্মানুভবতা, স্বামী বিবেকানন্দের শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্যত্ব গ্রহণ, বঙ্কিমচন্দ্রের হিন্দুধর্মানুশ্রয়ী দেশপ্রেম এবং পরিশেষে স্বদেশী আন্দোলনের প্রসারের মধ্য দিযে উনিশ শতকের চিত্ত জাগরণ ক্রমসঙ্কুচিত হয়ে একদিকে সঙ্কীর্ণ জাতিবাদ এবং অন্যদিকে হিন্দুধর্মের আঞ্চলিকতাকে তীব্রতর করে তুললো। উনিশ শতকের ইংরেজি শিক্ষা, সংস্কৃতি, আচার ও জ্ঞানের গভীরপ্রভাবযুক্ত এবং ভারতীয় বৈদান্তিক ব্রহ্মবাদের সাধনায় নিযুক্ত বাংলার সর্বপ্রধান আলোকপ্রাপ্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করে রবীন্দ্রনাথ এই মানস-বিবর্তনের সমগ্র ধারাকেই প্রত্যক্ষ করেছিলেন। ক্রম-বর্দ্ধমান সংকীর্ণ দেশপ্রেম, বুদ্ধি-ও যুক্তি-বিহীন রাষ্ট্রনীতি, সংকীর্ণ ধর্মবোধ ও চেতনা, বিশ্বের মানবতাবিরোধী উগ্রজাতিবাদ যে ভাবে অতিক্রুত কার্যকরী হয়ে উঠছিল তাতে সঙ্গতভাবেই বিক্ষুব্ধ হয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে প্রথম মহাযুদ্ধের পরবর্তী সময় থেকে সমাজ-চিন্তা রাষ্ট্র-চিন্তায় ও ব্যক্তির বিনাশধর্মী ব্যবস্থার উদ্বোধনও স্পষ্ট হয়ে উঠলো। রবীন্দ্রনাথ অনুভব করলেন যে, "আত্ম-প্রকাশের স্বাধীনতা য়ুরোপের একটা শ্রেষ্ঠ সাধনা, আজ দেখছি য়ুরোপে ও আমেরিকায় সেই স্বাধীনতার কণ্ঠরোধ প্রবল হয়ে উঠেছে।" (কালান্তর)। "একদা ফরাসি বিপ্লবকে যারা ক্রমে ক্রমে আগিয়ে এনেছিলেন, তারা ছিলেন বিশ্ব-মানবিক আদর্শের প্রতি বিশ্বাসপরায়ন। সেই বিশ্বকল্যান ইচ্ছার আবহাওয়ায় জেগে উঠেছিল যে সাহিত্য সে মহৎ, সে মুক্তদ্বার সাহিত্য সকল দেশ, সকলকালের মানুষের জন্য : সে এনেছিল আলো, এনেছিল আশা। ইতিমধ্যে বিজ্ঞানের সাহায্যে য়ুরোপের বিষয়বুদ্ধি বৈশ্যযুগের অবতারণা করলো।

স্বজাতি ও পরজাতির মর্মস্থল বিদীর্ণ করে ধনস্রোত নানা প্রণালী দিয়ে য়ুরোপের অবোদ্ভূত ধনিকমণ্ডলীর মধ্যে সঞ্চারিত হচ্ছে লাগল। বিষয়বুদ্ধি সর্বত্র সর্ববিভাগেই ভেদবুদ্ধি, তা ঈর্ষাপরায়ণ।......তারপর থেকে য়ুরোপের চিত্ত কঠোরভাবে সঙ্কুচিত হয়ে আসছে।" (সাহিত্যে আধুনিকতা)

ঊনিশ শতাব্দীর বাংলার চিত্তজাগরণের ক্রমসঙ্কোচন ও সংকট এবং ইয়োরোপীয় রেনেশাঁসী ও যুক্তিবাদী চিন্তার অনতিক্রম্য স্ব-বিরোধ—এই দু'য়ের মধ্য দিয়ে রবীন্দ্র-মানস গড়ে উঠেছে বলেই রবীন্দ্রনাথের কাব্য, চিন্তা, কল্পনা ও অনুভবের মধ্যে একটা স্ব-বিরোধ সর্বক্ষণই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। বর্তমান যন্ত্র-সভ্যতার নির্যাতিত ব্যক্তি-মানুষের আত্ম-নিপীড়ন, যন্ত্রনা ও ক্ষোভ, বেদনা, আকুতি, শঙ্কা, ভীতি, ইত্যাদি অস্তিত্বের গভীরতর স্বরূপ রবীন্দ্র-কাব্যে বা সাহিত্যকর্মে তেমন একটা খুঁজে পাওয়া যাবেনা, যদিও তাঁর উপন্যাস নাটক ও কোন কোন প্রবন্ধ-সাহিত্যে ওই সমস্যার সম্বন্ধে আগ্রহের নির্দেশ করে। অধিকন্তু, বিশ্বজগতে এবং সমাজে ব্যক্তি-জীবনের চিরন্তন স্ব-বিরোধ যা ইস্‌কাইলাস্‌, সফোক্লিস্‌, ইউরোপিদিস্‌, দান্তে, সেকস্‌পীয়র, এবং গ্যেটের সৃষ্টিকর্মের মধ্য প্রতিভাত হয়েছে—তা রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিকর্মের মধ্যে খুব অল্পই ব্যক্ত হয়েছে, যদিও মনে হয়, তিনি অনেক ক্ষেত্রেই সেই সম্বন্ধে অগ্রসর হতে চেয়েছিলেন। সেই জন্যই, ব্যক্তির নির্যাতন ও বিনাশের মারাত্মক ভয়াবহতার শঙ্কিত হয়ে ব্যক্তিকে, এবং সভ্যতার সংকটকে সার্থকভাবে বুঝতে গিয়ে তাকে কাছে পাইনা, এমন কি তার বিশ্বমানবিকবোধ, উদারনৈতিক জাতিবাদ, সমাজ-চিন্তা, ঐতিহ্য-চৈতন্য, ও ইতিহাস-বোধও যুক্তিবাদী মনকে অনেকাংশে তৃপ্তি দেয়না। কিন্তু, ভারতীয় সভ্যতা, আদর্শ ও তার মূল্যস্বরূপ এবং ইয়োরোপীয় বিশ্বমানবিক চিন্তার সঙ্গে যুক্ত থেকে, গ্রহণ করে এবং প্রকাশ করতে গিয়ে তিনি মানবতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও যুক্তিবাদেরই সাধক ও রূপকার হয়ে উঠেছেন। সভ্যতা ও সংস্কৃতির গোড়া থেকে যে মূল্যবোধগুলো ব্যক্তিকে সর্বপ্রকার বন্ধন থেকে মুক্ত করায় অনুপ্রাণিত করেছে, রবীন্দ্র-ব্যক্তিত্বে এবং সৃষ্টিকর্মে তা খুব গভীরভাবেই ধ্বনিত হয়ে উঠেছে। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত হয়তো এ দিক থেকে কবি রবীন্দ্রনাথকে গ্যেটে, হোমর ও সেকস্‌পীয়রের সঙ্গে যুক্ত করেছেন। এ বিচার, আমার মনে হয়, খুবই সার্থক এবং ইঙ্গিতপূর্ণ।

চৈত্রের শালবন

অরবিন্দ পোদ্দার

দিনযাত্রার অস্থির নিমেষগুলো অস্থির অনন্তে উধাও—বিরামহীন। কাজ, ব্যস্ততা,, কাজ। ঘরসংসার, বাজার-হাট, আপিস-আদালত, বাদবিসম্বাদ আর কিছু নিষ্ফল স্ফূর্তি বা হাতাহাতি বক্তারক্তি। প্রতিটি প্রভাতে তার আরম্ভ, রাত্রিতে শেষ, পুনরায় প্রভাতে আরম্ভ। এই প্রাত্যহিকতার আরম্ভ আর শেষের মাঝখানে কোনো ফাঁক নেই, কোনো অলস মুহূর্ত নেই যেখানে অন্তত এই কিঙ্কিনির মদিরতা অনুপস্থিত। সর্বত্রই তার শাসন, সর্বত্রই এক নিষ্ঠুর ঘোষণা—না, সময় নেই। সেই প্রাণান্তকর অনবসরের পীড়নে মানুষের দিনলিপি কর্মবিহ্বল অথবা অসাফল্যে মলিন অথবা সমস্যার তীব্রতায় পাণ্ডুর। এই সমস্যার অতিশয় ভাবনাই মানুষের একান্ত ভাবনা; একে পশ্চাতে ক্ষণকালের বিস্মৃতির পথে ঠেলে দিয়ে অন্য কোনো ভাবনাহীন চিন্তা তার মানসপটে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে না যা অকস্মাৎ আলোর স্পর্শে উজ্জ্বল বা হঠাৎ খুশির হিল্লোলে বিভোর। অথবা যা দৈনন্দিন অভ্যাসের বন্ধন থেকে মুক্ত। সম্ভবতঃ একথা তার চৈতন্যের বাইরে যে, এই অনবসরের মাঝেও এমনি এক অজানা আনন্দ আছে, অকারণ পুলকিত হওয়া আছে, কিছু কাজ-না-বোঝা অনুভব আছে, কিছু আত্মবিস্মৃত অচেতন মুহূর্ত আছে যাকে ব্যস্ততার হিসেবে বা পয়সার ভার দিয়ে মাপা যায় না কখনও; অথচ এই ক্ষণিক খুশির মধ্যে থাকে সব শূন্যতার বিলোপ, সব মলিনতার অবসান। এই ক্ষণবিন্দুগুলোতে অনন্তকালের আনন্দ হঠাৎ ধ্বনিত হয়ে ওঠে। আমাদের বিপর্যস্ত মন কুণ্ঠিত হয়ে ভাবে, এমন কিছু আনন্দ আর ক্ষণবিন্দু আছে কি?

আছে। সমস্ত কর্ম ও ব্যস্ততা, মলিনতা ও বিষাদ, সাফল্য ও অসাফল্যের অবরোধ ব্যর্থ করে দিয়ে পাতার ফাঁকে ফাঁকে আলোর নৃত্য নিমন্ত্রণ পাঠায়, বসন্তপ্রভাতের বাতাস গায়ে লাগে, অশোকমঞ্জরি চুপি চুপি হৃদয়ের স্পর্শ পেয়ে ভ্রমর, কনকচাঁপার গন্ধে গন্ধে মুগ্ধিত তন্দ্রা মেদুর, একটি অকারণ সকাল সমস্ত বিশ্বের খুশির সংবাদ নিয়ে আমাদের সত্তায় এসে উপস্থিত হয়। তখন

আলো আর হাওয়া, পাখির অস্ফুট কাকলি আর আকাশের নীলিম সৌন্দর্য—সব মিলে এক ইন্দ্রজাল সৃষ্টি হয়। সেই মাধুর্যের স্বাদ আমাদের অঙ্গে অঙ্গে, অণুতে পরমাণুতে ভরে নেওয়া যেতে পারে, তারই বিশ্বপরিব্যাপ্ত আনন্দে আনন্দিত হওয়া যেতে পারে, এবং একটি মুহূর্তের বিহ্বলতার মধ্যে বহু জীবনের সার্থকতা খুঁজে পাওয়া যেতে পারে, সেই সকালবেলাটি যেন এক অখণ্ড গান হয়ে অন্তরে প্রবেশ করতে চায়, সব দৈন্য ভুলিয়ে দিয়ে।

সব মানুষের জীবনেই এমন এক একটি সকাল কোনোরূপ খবর না দিয়ে হঠাৎ আবির্ভূত হ'তে পারে, হয়ত,—যদি মন তার জন্যে প্রস্তুত বা আগ্রহান্বিত হ'য়ে থাকে। অবশ্য, আমাদের অধিকাংশের মন তার জন্য লালায়িত থাকে না বা তার সংবাদও রাখে না। কিন্তু কবি-চিত্তে অহরহ তার সংবাদ আসে, সেই সংবাদের জন্য তিনি উৎকণ্ঠিত হয়ে থাকেন এবং পাওয়া মাত্র আনন্দিত হয়ে উঠেন। শুধু প্রাকৃতিক সান্নিধ্য লাভ-করা কবি নন, সব কবি; একান্ত মানবিক ভাবনায় ব্যাকুল কবিও সেই সংবাদে সর্বতোভাবে ক্ষণকালের জন্য আত্মবিস্মৃত হয়ে পড়েন, সাংসারিক কর্মের আহ্বান পরম এক নিশ্চেষ্টতার মধ্যে আত্মগোপন করে। যতদূর মনে হয়, রবীন্দ্রনাথ কোনো একটি পত্রে মনের এই বিশেষ অবস্থাটিকে আলস্যসম্ভোগ নামে অভিহিত করেছিলেন বলেছিলেন, এইরূপ অবস্থায় চিত্ত যেন আপনা থেকেই বলে উঠে,—কাজকর্ম সব পরে হবে, দায়দায়িত্বের দাবি নিয়ে সংসার দূরে পড়ে থাক, আপাততঃ আকাশ বাতাস আর পৃথিবী থেকে শুধু অলসভাবে পরিপূর্ণ রসাকর্ষণ করে নাও। আলস্য শব্দটি এইরূপ অভিজ্ঞতার সঙ্গে সংযুক্ত থাকলেও প্রকৃত অর্থে তা আলস্য নয়, এও কাজ; মনের একান্ত প্রয়োজনীয় খাদ্য অন্বেষণের কাজ। এমনি ভাবে বিশ্বের অন্তর থেকে সবুজ রস সংগ্রহ না করলে কবি-চিত্ত বাড়তে পারে না, সজীব অর্থে বাঁচেও না সম্ভবতঃ। শুধু নিষ্প্রাণ কাঠরূপে বিরাজ করা গাছ বা প্রকৃতির কাজ নয়; তার কাজ পত্রে পুষ্পে ফলে বিকশিত হওয়া: কিন্তু তার জন্য চাই আলোক, আকাশ আর অবকাশ। কবি-চিত্তও তেমনি; আলস্যের মাধ্যমে রসাকর্ষণ বা খাদ্য অন্বেষণ তাঁর কবিসত্তার অন্তর্গত, তাঁর প্রকৃতির অঙ্গ।

জানি, সমস্যাজর্জর মানবিক পৃথিবীতে বসবাস করে প্রকৃতি সম্ভোগের ঔচিত্য সম্পর্কে আপত্তি উঠবে অনেক; অনেক বিজ্ঞজন তর্ক তুলে বলবেন,

প্রকৃতি-সচেতনতার দিন আর নেই, এই রসে নিমগ্ন হওয়ার অর্থ দাঁড়াবে মানবিক বিশ্বকে অস্বীকার। মানুষের পৃথিবীকে, তার সমস্ত ভয়াবহতা সত্ত্বেও, অস্বীকার করা চলে না, করলে মানবিক অস্তিত্বকেই প্রকারান্তরে অস্বীকার করা হ'বে। এই ভয়ঙ্কর সত্য মেনে নিয়েও বলা যায়, প্রকৃতি-বিশ্ব থেকেও আমাদের হৃদয়কে ফিরিয়ে আনতে পারি না, মনকে বিমুখ রাখতে পারি না। আমাদের সমগ্র মানব অস্তিত্বকে ঘিরে ঐ প্রকৃতিবিশ্ব বিরাজিত, আমাদের হাসি-অশ্রু দুঃখসুখ ও কর্মের নীরব সাক্ষী। এই বিশ্বের লীলাভূমিতেই মানুষের মানব-কর্ষণ। সূর্য থেকে যখন এই পৃথিবীর, পৃথিবীর মানুষের জীবন, তখন সূর্যকে অস্বীকার করি কি করে? তেমনি যে আকাশ তার অসীম শূন্যতা ও মাধুর্য দিয়ে আমার হৃদয় ভরে দেয়, যে প্রকৃতিবিশ্ব বর্ণের বিচিত্র সমারোহ আর সঙ্গীত আর সুষমা দিয়ে আমার চিত্তে রস, সুন্দরের অনুভব আর সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অনুভূতির সঞ্চার করে, তার প্রতি আমার মন সঙ্কুচিত হয় কি করে? প্রকৃতিবিশ্বের অকৃপণ দানে অর্থাৎ আমাদের ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে সেখানকার বস্তু সম্পর্কে সচেতন হয়েই তো আমাদের সত্তা গঠিত, আমাদের বোধ বুদ্ধি অনুভূতি জাগ্রত ও বিকশিত হয়, প্রেমে মাধুর্যে ঐশ্বর্যে আমরা উজ্জ্বল হয়ে উঠি। সুতরাং আমাদের অস্তিত্বের যা মূল উৎস তাকে আমরা অস্বীকার করি কিরূপে?

বস্তুতঃ কোনো মানুষই তা করে না, করতে পারে না, এমন কি একান্ত মানবিক সমস্যায় সমাচ্ছন্ন কোনো প্রকাণ্ড বস্তুবাদী দার্শনিকও না। আর, পারে না বলেই প্রকৃতিবিশ্বকে অন্ধকার ঘরের কোনে ছোট্ট একটি টবের মধ্যে পাওয়ার একটা অতিশয় তীব্র আকাঙ্ক্ষা আমাদের সকলের মধ্যেই লক্ষণীয়। টবের ছোট্ট গাছটি বা ফুলটি যেন আমাদের অন্তরে আকাশের সংবাদ নিয়ে আসে, সেই বিরাট বিশাল বিস্তারের আভাস আমরা পেতে চাই ঐ কচি পাতাটি বা ঐ লাজুক কলিটির মধ্যে। ঐ আকাঙ্ক্ষা কেন? তার একটি কারণ বোধ করি এই, আমাদের চিত্ত মানবিক সংসারের দৈনন্দিন সম্পর্কের মধ্যে কোনো পরিতৃপ্তিই খুঁজে পায় না, বরং তা যেন একটা সুকঠিন শৃঙ্খলের মধ্যে আমাদের সত্তাকে আবদ্ধ করে রাখতে চায়। অথচ, একটা দায়হীন, সর্বপ্রকার দীনতা থেকে মুক্ত তৃপ্তি অর্থাৎ, এক কথায়, একটা নির্মল আনন্দ-লোকে স্থিত হওয়ার আকুতি আমাদের আত্যন্তিক। আমাদের মনের

চিরকালের ক্রন্দন—মুক্তি, মুক্তি, মুক্তি; পীড়ন আর যন্ত্রণা থেকে মুক্তি; জাগতিক সম্পর্কের শৃঙ্খল থেকে মুক্তিলাভ করে আমরা পাখির ডানার আনন্দ বা ফুটন্ত ফুলের সৌরভের সাবলীলতা পেতে চাই। সেই আকূতি এবং তা চরিতার্থ করা যে সত্যই সম্ভব, টরের ঐ চারাগাছটি আমাদের প্রতি মুহূর্তে তা জানায়, আমাদের মন আনন্দিত হয়ে তাতে সায় দেয়, আমরা অমৃত কিছুর স্বাদ পাই।

তাছাড়া, অন্য কারণ বোধ করি এই, আমাদের ঘরে বাইরে যে প্রয়োজনীয় বস্তুর সমাবেশ, তার মধ্যে আমাদের মন পরিপূর্ণভাবে ছাড়া পায় না; প্রয়োজনটা সম্ভবতঃ মনের বিস্তারের প্রতিকূল। রবীন্দ্রনাথ বলতেন, জড় জিনিসগুলো মনের সঙ্গে কোনো মানবিক সম্পর্ক স্থাপন করে না, মনের খুশি হওয়ার জন্য কোনো নিত্যনতুন সংবাদ তারা নিয়ে আসে না। আসবাবপত্র-গুলোর রূপ সব সময়ই একরকম, তাদের রূপে বৈচিত্র্যের যেমন অভাব তেমনি উত্তরোত্তর তা মলিনতাই শুধু সঞ্চয় করে। ফলে, মনের সাবলীল গতির পক্ষে সেগুলো যেন বোঝা ও বাধাস্বরূপ, মন এখানে ছুটতে গিয়ে হোঁচট খায়, হাত পা ভাঙে, আকাশে বিস্তৃত হওয়ার শক্তি হারায়। আসবাব-পত্রের সীমা লঙ্ঘন করে মন যখন আকাশ আর আলোক আর হাওয়ার সন্ধান পায়, তখনই ভরে ওঠে সে, রসিয়ে ওঠে, আপন সত্তার বৃহত্তর পরিচয়ে পুলকিত হয়। আকাশ তাই তার একান্ত আপন, যেমন আপন আলো আর হাওয়া আর শ্যামল বনানী।

সাধারণ মানুষের অনুভবে এই প্রত্যয় যতটা শক্তিশালী রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে তার শক্তি অন্ততঃ শতগুণ। প্রকৃতিবিশ্বের আপন সত্তার সঙ্গে তাঁর কবিসত্তার যোগ প্রত্যক্ষ, শুধু প্রত্যক্ষ নয়, চিরকালের। তিনি সেই পৃথিবীর অমৃত প্রাণভরে পান করেছেন, আবার আপন হৃদয়ের আনন্দরস তাকে ফিরিয়েও দিয়েছেন। তাঁর মধ্যবয়সের একটি পত্রে দেখতে পাচ্ছি কবি লিখছেন, "কিন্তু এই বসন্তপ্রভাতের বাতাসে আমাকে বড় মাটি করে দেয়—কেবল এই উদার উত্তপ্ত বাতাসটিকে সর্ব্বশরীরে লাগানই একটা যথেষ্ট কর্ত্তব্য কাজ বলে মনে হয়—মনে হয় এই মিষ্টি বাতাসের প্রবাহটি যেন আমার প্রতি বাইরের প্রকৃতির একটা প্রত্যক্ষ আলাপচারী।" শুধু বসন্তের প্রভাত নয়, নিদাঘের শুষ্ক প্রান্তর, বর্ষার শ্যামল সৌন্দর্য, শরতের নাম-না-জানা সুর,

হেমন্তের দীপমালিকা, এমন কি শীতের জীর্ণ শাখা পর্যন্ত তাঁর সাংসারিক ভাবনায় ব্যাকুল বহু মুহূর্তকে অপরূপ নিশ্চেষ্টতায় ভরে দিয়েছে, এবং ঐসব মুহূর্তে বাহির বিশ্বের সঙ্গে তাঁর আপন হৃদয়ের যোগ ঘনিষ্ঠতম করেছে। তাদের প্রত্যেকের হাতেই নিমন্ত্রণের চিঠি, প্রকাশে অব্যক্ত ভাষা, নীরব আহ্বান—আলোকের, আকাশের, আর অবকাশের। তাঁর উচ্ছ্বসিত কবিহৃদয় সে নিমন্ত্রণ উপেক্ষা করে কি করে?

যে পথে বকুলবনের পাতার দোলনে
ছায়ায় লাগত কাঁপন,
হাওয়ায় জাগত মর্মর,
বিরহী কোকিলের
কুহুরবের মিনতিতে
আতুর হত মধ্যাহ্ন,
মৌমাছির ডানায় লাগত গুঞ্জন
ফুলগন্ধের অদৃশ্য ইসারা বেয়ে,

সেই পথে ধরে তাঁর চেতনা ছড়িয়ে পড়ত প্রকৃতিবিশ্বে, সেই শ্যামলের আর সেই নীলের অণুতে অণুতে প্রসারিত করত নিজেকে, এবং আপন বৃহৎ পরিচয়ে মুগ্ধ হত, আর অভিভূত। সেই প্রকৃতি জগতের সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রূপের কণা, কবিকে জানিয়েছে তাঁর বৃহত্তর পরিচয়ের কথা; তেমনি, কবিও দিয়েছেন তাদের নতুনতর পরিচয়। সে পরিচয় মানবিক, অর্থাৎ, ছায়ার কাঁপনে, পাতার মর্মরে, বকুলের গন্ধে, আমলকিবনের শিহরণে কবি পেয়েছেন মানবিক হাসি-অশ্রু-আনন্দ-বেদনা-পুলক-বিস্ময়ের স্বাদ। যা ছিল নিছক বস্তু বা বস্তুর সমারোহ, তা পেল প্রাণের আত্মীয়তা, হৃদয়ের সঙ্গ, এবং এভাবে উজ্জ্বলতর হলো সে, রসের সিঞ্চনে হলো সহৃদয়।

এ পরিচয় কবির সত্য পরিচয়, তিনি আকাশের নীলিমায় আপন প্রতিচ্ছবি দেখতে পেয়েছেন। যে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন মানবিক সমস্যার চিন্তায় নিদ্রাহীন, যিনি ছিলেন আজীবন মানুষের কল্যাণসাধনায় নিরত, মানুষের জীবনকে মহত্তর পর্যায়ে উন্নীত করা—এক কথায়, মানুষকে বড়ো করার সংগ্রাম যিনি করে গেছেন শেষ দিন পর্যন্ত, সেই রবীন্দ্রনাথই তাঁর মানবিক সংগ্রামের কথা ক্ষণকালের জন্য বিস্মৃত না হয়েও আলো আর আকাশকে

গ্রহণ করেছেন আপন অন্তরে, জীবনের অসংখ্য ক্ষণবিন্দুগুলোতে। তাঁর অনবকাশের উজান ঠেলে প্রকৃতিবিশ্ব তাঁর চিত্তে উদ্‌ভাসিত হয়ে উঠেছে সঙ্গীতের রূপ ধরে। এই সঙ্গীতের ভেতর দিয়ে সেখানকার প্রতিটি বস্তু রূপান্তরিত হয়েছে নতুন সত্তায়, নতুন ব্যক্তিত্ব লাভ করে ধন্য হয়েছে সে। সেদিক থেকে মানবিক পৃথিবীর নিকট তার নতুন পরিচয় উদ্‌ঘাটন করার জন্য, তাকে গভীর রসের সত্যতায় প্রতিষ্ঠিত করার জন্য প্রকৃতিবিশ্ব নিঃসন্দেহে রবীন্দ্রনাথের নিকট ঋণী। অবশ্য, সে ঋণ প্রকাশের ভাষা তার নেই, তথাপি, অনুমান করা যায়, অশোকের মঞ্জরি, ভয়ে মলিন শিউলি, তমালের শাখা, এমন কি উপেক্ষিত ঝুমকো লতা পর্যন্ত এক বাক্যে কবিকে দেখিয়ে বলবে 'এ আমাদেরই লোক।' যেমন বলবে ভারতবর্ষের প্রতিটি দুঃখ-তাপ-সহা মানুষ, 'এ আমাদেরই লোক।' কারণ, এরা প্রত্যেকেই রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠকে আশ্রয় করে মূর্ত হয়ে উঠেছে নতুন সত্যে, নতুন অনুরাগে, নতুন উপলব্ধির প্রগাঢ়তায়, অনুভূতির শুচিতায়।

প্রকৃতি-বিশ্ব ও মানব-বিশ্ব এই উভয় দিগন্তেই রবীন্দ্রনাথের কবি-মানস স্বচ্ছন্দে বিচরণ করেছে, এবং আপন উপলব্ধির ঐশ্বর্য দিয়ে এই দুই পৃথিবীকেই আপনার করতে চেয়েছে। অবশ্য, মানবিক বিশ্ব সম্পর্কে কবির দুশ্চিন্তার অন্ত ছিল না। প্রতিদিনকার সংসারটা আমাদের কারও কাছে ঠিক সামঞ্জস্য-পূর্ণ নয়, তার কোন ক্ষুদ্র তুচ্ছ দিক অহেতুকভাবে বড়ো হয়ে দেখা দেয়, এবং ক্ষুধাতৃষ্ণা আরামব্যারাম কলহবিবাদের সাহায্যে বর্তমান কালের প্রতিটি মুহূর্তকে কণ্টকিত সঙ্কুচিত করে তোলে। ফলে, সুখের বদলে দুঃখ ও বেদনার কালিমা জীবনের আকাশকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করে রাখে। রবীন্দ্রনাথ তাই একদা দুঃখ করে বলেছিলেন, 'মানুষের পক্ষে মানুষের জনতার মত এমন শ্রান্তিজনক আর কিছু নেই।' তাছাড়া, মানুষের হাতে মানুষের অবমাননার যে কলুষিত চিত্র তিনি তাঁর জীবদ্দশায় দেখে গেছেন, তার জন্য তাঁর দুর্ভাবনা ছিল অপরিসীম, তিনি দেখেছেন, প্রতি মুহূর্তে অনুভব করেছেন, মানবাত্মার অপমানে দিগন্ত থেকে দিগন্ত পর্যন্ত বাতাস অপবিত্র হ'য়ে উঠেছে। তাই, তাঁর প্রার্থিত স্বাধীনতা বা মুক্তি তিনি মানব-বিশ্বে কখনও লাভ করেন নি। ক্ষুব্ধ চিত্তে তিনি প্রকৃতি-বিশ্বের প্রসন্ন আবেদনে সাড়া দিয়েছেন; সেখানকার উদারতা ও প্রেমের গভীরতার মধ্যেই তিনি খুঁজে পেয়েছেন পরম নির্ভরতা

ও নির্ভয় বিশ্রামের স্থান। শুধু তাই নয়। সেখানে অপরূপ সামঞ্জস্যময়তার যে সঙ্গীত নিত্য প্রবাহিত, তা আমাদের মানবিক পৃথিবীর অসামঞ্জস্য ও বিরোধগুলোকে ঢেকে দেয়; আর সমগ্র পৃথিবী যেন সুন্দর ছবির মত আমাদের চোখে নেমে আসে, অথবা আবির্ভূত হয় কাব্যসুষমার নয়নাভিরাম রূপ নিয়ে। তার স্পর্শে সচকিত কবি-চিত্তের আকাশ থেকে সমস্ত দুর্ভাবনার মেঘ, সমস্ত উদ্বেগ ও আশঙ্কার বাষ্প বিলীন হয়ে যায়, এবং মেঘমুক্ত হৃদয়, সহজ হয়ে প্রকৃতিবিশ্বের সঙ্গীতভরা বিশালতার মধ্যে অনায়াসে আত্মবিসর্জন করতে পারে। লৌকিকতার বন্ধন ছিন্ন করে বিশ্বের নিত্য সৌন্দর্য-লোকে কবি-চিত্ত অবগাহন করে, এবং বিপুল এক মুক্তি ও স্বাধীনতার স্বাদ গ্রহণ করে।

স্বাধীনতার তৃষ্ণায় ব্যাকুল রবীন্দ্রনাথ তাঁর সারা জীবনের প্রকৃতি-অনুভবের ভেতর দিয়ে সেই মুক্তিরই আস্বাদ পেতে চেয়েছেন, ব্যক্তিগত জীবনে যা ছিল অনুপস্থিত। প্রতিটি পত্রাঙ্কুরের আবির্ভাব, প্রতিটি মুকুলের আবরণ উন্মোচন কবির জন্য জড় পৃথিবীর বন্ধন থেকে মুক্তির সম্ভাবনা ও স্বাদ নিয়ে এসেছে। তার মধ্যেও তাঁর কবি-সত্তার সার্থক অভিব্যক্তি। সুতরাং, কবির অনুভবের সরসতার দীক্ষা গ্রহণ করে এবং দীক্ষার সজীবতা দিয়ে প্রকৃতি-বিশ্বের উপলব্ধি দিয়েও আমরা কবিকে পেতে পারি, তাঁর প্রতি আমাদের আন্তরিক অর্ঘ্য নিবেদন করতে পারি। আমার মনে হয়, এমনিভাবে তাঁকে আমরা অধিকতর সত্য অর্থে পেতে পারি। কেন না, সত্যবোধহীন বন্দনা ও চীৎকার কলরবের মধ্যে কবিকে যেভাবে আমরা পাই তা শুধু কৃত্রিম বা অর্থহীন নয়, তা যেন কবির উপলব্ধি ও মানসবৈশিষ্ট্যের প্রতি একটা প্রগল্ভ উপহাস। সেটা কবিকে নিকট করে না, আমাদের তাঁর কাছ থেকে দূরে ঠেলে দেয়। তার চেয়ে বেশি সত্য প্রকৃতিবিশ্বের আহ্বান. যেন তাদের মর্মবাণীই কবি তাঁর 'স্মরণ' কবিতায় জানিয়ে গেছেন,—

> কখনো স্মরিতে যদি হয় মন,
> ডেকো না, ডেকো না সভা, এসো এ ছায়ায়
> যেথা এই চৈত্রের শালবন।

উত্তরকালের চোখে রবীন্দ্রনাথ

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত

রবীন্দ্র-প্রতিভা সমগ্রতার প্রতীক, দীর্ঘ ষাট বছরেরও অধিককালের সৃজনশীল কর্মপ্রবাহের মধ্যেই বিচিত্র সমগ্রতার সুপরিস্ফুট স্বাক্ষর নিহিত। রবীন্দ্র কর্মজগতে আকস্মিকতার চমক অনুপস্থিত, সুদীর্ঘকালের নিরবচ্ছিন্ন বিবর্তনধারায় রবিপ্রতিভার সার্বভৌমতা অন্তর্লীন। সুতরাং উত্তরকালের চোখে রবীন্দ্রনাথ বিচিত্ররূপে ভাস্বর, বহু বিচিত্র উপকরণের জন্যে, বিস্ময়, আশ্বাস, ব্যাপ্তি ও পরিপূর্ণতার জন্যে অতএব উত্তরসূরীমাত্রেই তাঁর কাছে ঋণী। সাহিত্যে, সঙ্গীতে, চিত্রশিল্পে, সমাজচিন্তায় সুন্দর, সম্পূর্ণ এমন একটি সর্বতোমুখী প্রতিভা ক্রিয়াশীল যার সামান্যতম ভগ্নাংশকে অবলম্বন করেও পরবর্তীকালের ভাবুক উদ্দীপিত কিংবা অনুপ্রাণিত হতে পারেন।

রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত জীবন কোনো নাটকীয় তরঙ্গের ঘাতপ্রতিঘাতে কখনো আলোড়িত হবার সুযোগ পায় নি। দারিদ্র্যের নিষ্ঠুর পীড়ন বা কুমারী-প্রেমের কষাঘাত তাঁর যৌবনবেগকে খণ্ডিত করেনি। জীবনের শেষ কয়েকটি মাস ছাড়া এমনকি অসুখ-বিসুখের শারীরিক ক্লেশও তাঁকে সহ্য করতে হয়নি। আত্মীয়-বিয়োগের ক্লেশ সংসারী মানুষমাত্রেই কোনো না কোনো সময়ে অনুভব করে। রবীন্দ্রনাথও সে তিমিরনিবিড় যাতনা সহ্য করেছেন একাধিকবার। কিন্তু মাইকেলের জীবন যে-অর্থে নাটকীয় রবীন্দ্র-জীবন সে অর্থে নাটকীয় নয়। রবীন্দ্র-জীবন দৃঢ়বদ্ধ মহীরুহ থেকে বিচিত্র ঐশ্বর্যময় বিস্তৃত বনস্পতি হবার ইতিহাস, সে-ইতিহাস খণ্ডিতভাবে নয়, সমগ্ররূপে প্রকাশমান বলেই মহৎ।

আমার বিশ্বাস পরবর্তীকালের বাঙালী কবিদের অনেকের রবীন্দ্র-মূল্যায়ন আমার উপরোক্ত ধারণার পরিপোষক[১] এবং রবিপ্রতিভা সৃজনশীলতা ও

---

১ "……কারণ রবীন্দ্রপ্রতিভা মুখ্যত ভাবয়িত্রী হ'লেও, কারয়িত্রী পরিকল্পনাতেও তিনি অদ্বিতীয়, এবং শিল্পের সর্ববিধ বিভাগেই তার সিদ্ধি

সংগঠনশক্তি এই উভয় দিক থেকেই যে সমান সার্থক তার প্রভূত প্রমাণ তাঁর দীর্ঘ আশি বছরের বিচিত্র কার্যাবলীর মধ্যেই নিহিত। রবীন্দ্র-সাহিত্য, চিত্রকলা ও গান একদিকে যেমন তাঁর অলোকসামান্য সৃজনীশীলতার চিহ্নিত অন্যদিকে তেমনি বিশ্বভারতীর মতো প্রতিষ্ঠান তাঁর বিরল সাংগঠনিক ক্ষমতার সাক্ষ্য। সুতরাং রবীন্দ্রনাথ অভূতপূর্ব ব্যতিক্রম তো বটেই এবং সঙ্গে-সঙ্গে সর্বগ্রাসী বিস্তৃতিরও প্রতীক—যে বিস্তৃতির হাত থেকে স্বাতন্ত্র্যরক্ষার কোনো উপায় খুঁজে পাওয়া প্রায় অসম্ভব।

রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিস্বরূপ যে উপাদানসমূহে গঠিত তার একদিকে উপনিষদ অন্য দিকে আন্তর্জাতিক মানবসংহিতা প্রাচ্য কবিদের মধ্যে তিনিই বোধ হয় সর্বপ্রথম মোহগ্রস্ত দেশীয় সমাজকে এ বিষয়ে সচকিত করেন যে প্রথা

যেমন বিস্ময়াবহ, তেমনি বাঙালীর দৈনন্দিন জীবনেও তাঁর দান সুস্পষ্ট। সেই জন্যেই স্বকীয় মণীষার স্বতন্ত্র অভিব্যক্তি খুঁজতে গিয়ে তিনি মাতৃভাষাকে যে-অভিনব রূপ দিয়েছেন, তার প্রতিভাসে কেবল সুধীসমাজই সমুজ্জ্বল নয়, অর্দ্ধশিক্ষিত বা অশিক্ষিতেরাও উদ্ভাসিত, এবং তাঁর চিত্তবৃত্তির অনুকরণ যদিও আজ আর তেমন প্রশংসা পায় না, তবু অনেকের মতে রাবীন্দ্রিক বিশ্ববীক্ষাই তরুণ-সাহিত্যেরও মূলধন।·· রামমোহন থেকে বঙ্কিমচন্দ্র পর্যন্ত অগ্রণীরা যে-সার্বভৌম সংস্কৃতির স্বপ্ন দেখেছিলেন, সন্ধান পাননি, সেই কল্পনা-বিলাসকে এই পাণ্ডববর্জিত দেশের দৃষ্টিগোচরে এনেছেন রবীন্দ্রনাথ।·· ”

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত : স্বগত

“ ··বাঙালীর সাধারণ সাহিত্যচিন্তার সঙ্কীর্ণতা থেকে রবিপ্রতিভার সার্বভৌমতা এতই সুদূরে যে তাঁর বিষয়ে কিছু বলতে হ'লে—অনেকেই আমরা আজ পর্যন্ত গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজা সারি। এটা পরিতাপের বিষয়, কিন্তু বিস্ময়ের নয়, কেননা গুল্মবহুল বাংলা সাহিত্যের এঁদো জমিতে রবীন্দ্রনাথের অভ্যুত্থান এত বড়োই আশ্চর্য ঘটনা যে তার টাল সামলাতেই আমাদের প্রায় দম ফুরোয়। কার্যত, এই অনন্য বনস্পতির ছায়ায় ব'সেই দিন কাটে আমাদের, মাপজোক নেবার কলকব্জা খুঁজে পাইনা।”

বুদ্ধদেব বসু : সাহিত্যচর্চা

ও ঐতিহ্য বিভিন্ন বস্তু এবং জাতীয় জীবনীশক্তির উৎস দেশ-কালাতিরিক্ত মনুষ্যধর্মে। অথচ, ভাবতে অবাক লাগে, প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী যাবৎ রবীন্দ্র-প্রতিভা সম্বন্ধে এদেশীয় পাঠক-সমাজের সচেতনতা ভাবালুতার সমার্থবাচক এবং উপলব্ধির বিপুল গভীরতার বদলে অর্বাচীন উচ্ছ্বাসই দীর্ঘকাল যাবৎ রবীন্দ্রসাহিত্য প্রীতির আন্তরিক নিদর্শনরূপে বিজ্ঞাপিত হয়েছে। আপাত-দৃষ্টিতে রবীন্দ্র-রচনাবলীতে যে সরলতা ও সাবলীলতা বর্তমান তার অনুগামী হওয়াই যে রবীন্দ্রপ্রীতির প্রকৃষ্ট নিদর্শন নয়, এই সহজলভ্যতার পাদপীঠে যে মেধা ও মননের, প্রজ্ঞা ও বুদ্ধির, সত্য ও সুন্দরের গভীরতর উৎস নিহিত এসত্য উপলব্ধি করার অবকাশ দীর্ঘকালের মধ্যেও মিলেছিল কিনা সন্দেহ।

এরূপ অবস্থায় পরবর্তীকালের কবি সম্প্রদায় রবিপ্রতিভাকে কী ভাবে গ্রহণ করবেন এচিন্তা যদি কৌতূহল জাগায় তাহলে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। সাহিত্যজগতে অতীতকালের অনন্য ব্যক্তিত্বসম্পন্ন কবির প্রতি পরবর্তীকালের কবির শ্রদ্ধানিবেদন অতি স্বাভাবিক ঘটনা, প্রসঙ্গত, সেক্সপীয়রকে নিবেদিত মিলটন, ওয়ার্ডস্বর্থ এবং আর্নল্ডের সুপরিচিত কবিতাবলী স্মরণীয়। এই ধরণের কবিতার প্রধানতম প্রতিক্রিয়া যদিচ বিস্ময় তবু নিছক বিস্ময়বোধের অভিব্যক্তিই রবীন্দ্রনাথের মতো কোনো অফুরন্ত—সৃজনীশীল প্রতিভার প্রতি শ্রদ্ধানিবেদনের সার্থকতম উপায় বলে নির্দ্ধারিত হবে কিনা সন্দেহ। ইংরেজি সাহিত্যে যে ভাবে সেক্সপীয়র-বিস্ময়ের (The Shakespeare Wonder) সূত্রপাত হয়েছিল অনুরূপভাবে 'রবীন্দ্র-বিস্ময়ের' সূত্রপাত হওয়াও স্বাভাবিক। চ্যাপম্যান-অনূদিত হোমার-পাঠে কীটস্‌ও বিস্মিত হয়েছিলেন। কিন্তু বিস্ময়-বোধ থেকে উৎসারিত অভিব্যক্তির অসুবিধে এইখানে যে তাতে বিস্ময়ের উৎসের সঙ্গে বিস্মিতের দূরত্ব যে অত্যন্ত বেশী তাও সূচিত হয়ে থাকে। অথচ রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পাঠকের সম্পর্ক সহজতর করতে হলে এ ধরণের বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়ে ওঠা দরকার, রবীন্দ্র-সাহিত্যের আবহাওয়ায় আমরা যে শুধু লালিতই নই, আমাদের নিশ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গেও যে রবীন্দ্র-ঐতিহ্যের গভীরতর সংযোগ রয়েছে সে-সত্যও সর্বজনবিদিত। এখনকার দিনে রবীন্দ্র-নাথকে বাদ দিয়ে সংস্কৃতির সার্থক উত্তরাধিকার যেমন কল্পনাতীত ব্যাপার, অন্যদিকে তেমনি তিনি যে আমাদের থেকে বিচ্ছিন্ন স্বতন্ত্র কোনো অমৃতলোকের সত্তা নন একথাও মনে রাখা দরকার।

সে-কারণেই ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় যখন বলেন, রবীন্দ্রনাথ আমাদের কাছে বরাবর 'ভক্তিই পেয়ে গেলেন, শ্রদ্ধা পেলেন না' কিংবা সুধীন্দ্রনাথ দত্ত যখন বলেন, 'রবীন্দ্রনাথের স্থায় এত বড় লেখকের এতদিনকার সহযোগকে আমরা যথেষ্ট উপকারে লাগাতে পারিনি, তাঁর স্বাবলম্বনের দিকে না তাকিয়ে বাঙালী শুধু তাঁর স্বাচ্ছন্দ্যের অনুকরণে অসংখ্য শাদা কাগজ অজস্র কালির আঁচড়ে ভরেচে' তখন সে-কথার তীক্ষ্ণতা মনকে স্পর্শ করে তো বটেই আমরা নতুন ক'রে রবীন্দ্রপ্রতিভা সম্পর্কিত সুদীর্ঘ কালের বদ্ধমূল ধারণাগুলোকে যাচাই করতে উৎসাহিত হই।

এদিক থেকে আধুনিককালের প্রবীন ও তরুণ বাঙালী কবিদের রবীন্দ্র-চিন্তা কতোটা সার্থক তা ভেবে দেখা যেতে পারে। রবীন্দ্রনাথকে নিবেদিত কবিতারচনার ক্ষেত্রে দেবেন্দ্রনাথ সেন কিংবা অক্ষয়কুমার বড়ালের মানসগঠনের সঙ্গে এযুগের প্রবীন কবি প্রেমেন্দ্র মিত্র, অমিয় চক্রবর্তী ও জীবনানন্দ দাশের দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য যেমন দৃষ্টিগোচরযোগ্য অন্যদিকে তেমনি তরুণতর কবিরাও যে স্বতন্ত্রভাবে ক্রিয়াশীল তারও নানা কাব্যলক্ষণ হাল আমলের কবিতায় সুপরিস্ফুট। রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশায় বিভিন্ন সময়ে কবির জন্মদিন উপলক্ষে সমসাময়িক কবিদের লিখিত কবিতাবলী পাঠে তিনি উৎসাহিত হয়েছিলেন কিনা বলা শক্ত। অন্তত মৈত্রেয়ী দেবীর জবানীতে জানা যায় যে মংপুতে থাকাকালীন জন্মদিনের কবিতাপ্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ নাকি তাঁকে একবার বলেছিলেন: " ওই তো কাগজ কলম রয়েছে, চট্ ক'রে, 'হে রবীন্দ্র কবীন্দ্র' ব'লে একটা লিখে ফেল না। আমার নামটা ভারি সুবিধের, কবিদের খুব সুবিধে হ'য়ে গেছে। মিলের জন্যে হাহাকার ক'রে বেড়াতে হয় না। রবীন্দ্রের পর কবীন্দ্র লাগিয়ে দিলেই হোলো।· " এই মন্তব্যের ভগ্নাংশও যদি সত্য হয় তাহলে বলতে হবে আপন প্রতিভার প্রশস্তিপাঠে অন্তত এক সময়ে রবীন্দ্রনাথ তৃপ্তি বোধ করতে পারেন নি। জয়ন্তী উৎসর্গ (১৩৩৮) গ্রন্থটিতে অনেক প্রবন্ধের পাশাপাশি যে ক'টি কবিতা প্রকাশিত হয়েছিল তার কোনো কোনোটিকে মনে রেখেই যদি কবিগুরু ঐরূপ উক্তি ক'রে থাকেন তাহলে সতর্ক হওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। অসীম শ্রদ্ধা ও প্রগাঢ় ভক্তি নিবেদন করবার জন্যে উচ্ছ্বাস যে অনিবার্য নয়, প্রচুর বিশেষণের প্রয়োগেই যে সর্বদা সার্থক প্রশস্তি রচনা সম্ভব হয়না একথার সত্যতা কুড়ি বছর আগেও

গভীরভাবে উপলব্ধি করার সুযোগ ছিল না হয়তো। আর সে-কারণেই জয়ন্তী-উৎসর্গ গ্রন্থে প্রকাশিত প্যারীমোহন সেনগুপ্তের 'রবীন্দ্র-প্রশস্তি' কিংবা সুরেন্দ্রনাথ মৈত্রের 'প্রশস্তি' অথবা শৈলেন্দ্রকুমার মল্লিকের 'রবি-বরণ' আন্তরিক উদ্যোগ সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত আধুনিক পাঠকমনে রেখাপাত করে কিনা সন্দেহ।

সুখের বিষয়, গত কয়েক বছরের মধ্যে রবিপ্রতিভা সম্পর্কে আধুনিক কবিদের মনোভাবের উল্লেখযোগ্য স্বাক্ষর সম্ভব হয়েছে, একাধিক কবিতায় রবীন্দ্র-পরিমণ্ডলের সার্থক চিত্ররূপ উন্মোচিত হওয়ায় রবীন্দ্রনাথকে নিবেদিত কবিতা সার্থকতা লাভ করেছে। 'রবীন্দ্রনাথ ভক্তিই পেয়ে গেলেন, শ্রদ্ধা পেলেন না'—এই অবস্থার প্রতিকার কতকটা সম্ভবপর হয়েছে। 'প্রাণের প্রতি প্রাণের, মনের প্রতি মনের, হৃদয়ের প্রতি হৃদয়ের একটা স্বাভাবিক টান আছে। ইহাকে বিশেষভাবে সৌন্দর্য বা ঔদার্যের আকর্ষণ বলিতে পারি না। ইহাকে ঐক্যের আকর্ষণ বলা যাইতে পারে।' রবীন্দ্রনাথের এই উক্তি মনে রেখে বলা যায় ঐক্যের আকর্ষণ অনুভব করেই আধুনিক কবিদের রবিবন্দনা মানুষ রবীন্দ্রনাথের অধিকতর নিকটবর্তী হয়েছে। এবং আমার বিশ্বাস রবীন্দ্রনাথকে শ্রদ্ধানিবেদনের প্রকৃষ্ট উপায় তাঁর নিকটবর্তী হওয়ার ও তাঁকে নিকটবর্তী ও সমসাময়িক করবার চেষ্টার মধ্যেই প্রচ্ছন্ন। প্রাচীন-কালের শক্তিমান ও অনন্যসাধারণ সাহিত্যিকদের সচরাচর নানা উপমায় বিশেষণে বিভূষিত ক'রে দূর থেকে শ্রদ্ধানিবেদনের যে প্রয়াস পূর্ববর্তীযুগে দৃষ্টিগোচর হয় তার মূলে দায় ও দায়িত্ব এড়াবার চেষ্টা যদি থেকে থাকে তাহলে আশ্চর্য হবার কিছু নেই।[২]

রবিবন্দনায় প্রাচীন পদ্ধতির বেশ দেবেন্দ্রনাথ সেন, অক্ষয় বড়াল কিংবা বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচনায় পাওয়া যায়। অক্ষয় বড়ালের কবিতায়—

---

[২] "Reverence is often no more than the conventional homage we pay to things in which we are not willing to take an active interest The best homage we can pay to the great figures of the past, Dante, Titian, Shakespeare, Spinoza, is to treat them not with reverence, but with the familiarity we should exercise if they were our contemporaries Thus we pay them the highest compliment we can; our familiarity acknowledges that they are alive for us." সমরসেট মম

ফুটিছে হিমাদ্রি শৃঙ্গে হিরণ্য কুসুম।
মেখলায় উঠে স্তোত্র উদাত্ত গম্ভীর।
তীরে তীরে জাহ্নবীর পল্লব কুটীর—
অঙ্গনে দোহন-গন্ধ, চূড়ে যজ্ঞ-ধূম।
অর্ধ-নিদ্রা-জাগরণে ধরা স্বর্গচ্ছবি।—
জীবনে স্বপন-ভ্রম, ফুটে রবি-কবি।

অথবা করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়ের

সরস্বতীর অমর তনয়, বারে বারে প্রণাম করি পায়,
চির-নূতন চিত্ত-হরণ তোমার নিমন্ত্রণ,—
তৃপ্তি দিবে এমন কিছু, নেই সেবকের পূজার পসরায়,
লও গুরুদেব দক্ষিণা লও শ্রদ্ধা-নিবেদন।

প্রভৃতি স্তবক পাঠকসমাজকে সেদিকেই আকৃষ্ট করে যেখানে রবীন্দ্রনাথ শ্রদ্ধেয়, সম্মানিত উল্লেখে ভাস্বর এবং শ্রদ্ধা ও প্রণাম যেখানে হৃদয়াবেগের আতিশয্যে উদ্বেলিত। সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতাও এই হৃদয়াবেগের অনুগামী। যেমন:

বাজাও কবি আলোক-বীণা মধুর নব ছন্দে,
হৃদয় শতদল সে তুমি ফুটাও সুধাগন্ধে,
যে ভাবেই উঠে প্রাণের মাঝে
তোমার গানে সকলই আছে
তোমার নামে মেতেছে দেশ, মিলেছে মহানন্দে॥

কিন্তু যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র প্রমুখ আধুনিক কাব্যের বার্তাবহ কবিসম্প্রদায় রবি-বন্দনায় উদ্বুদ্ধ হলে দেখা যায় কাছের মানুষ রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে সচেতনতা:

ঘরের দেয়ালে টাঙানো কবির
ছবিখানি
পঁচিশে বোশেখে বাইশে শ্রাবণে
টানাটানি।

* * *

শেষ হ'লে পূজা উঠি সাবধানে
ভাঙা টুলে

পুরানো দড়িতে নরা গিঁঠ বাঁধি
ছকে তুলে।
দেযালের ছবি ফিরে সে দেযালে,—
মোবা খাই দাই আপন খেয়ালে,
শুকনো ফুলের মালা খুলে নিতে
যাই ভুলে।

(যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত)

অথবা,

সাঙ্গ করে ফিরে আসি দিবসের নির্লজ্জ সংগ্রাম, পড়ি তব লেখা—
সুমধুর স্বপ্নগুলি শুভ্রপক্ষে নামে চারিধারে, মোছে অশ্রুলেখা।
তোমার কবিতা বন্ধু, জীবনের আতপ্ত ললাটে বুলায় অঙ্গুলি।
আকাশ যে নীলবন্ধু ধরণীর মন্থনের বিষে, সে কথাও ভুলি।

(প্রেমেন্দ্র মিত্র)

এখানেই প্রথম সমকালীন সমাজ-জীবনের পারিপার্শ্বিকতায় রবীন্দ্রনাথে পবিশুদ্ধ ব্যক্তিস্বরূপের অমৃতসন্ধানী প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

যেমন জন্মদিনে তেমনি মৃত্যুর তারিখেও রবীন্দ্রনাথ নব-নব সঙ্কল্পের প্রতীক। এবং ২৫শে বৈশাখ থেকে ২২শে শ্রাবণ প্রকৃত প্রস্তাবে সূর্যোদয় সূর্যাস্তের আশি বছরের আলোকে স্পন্দিত। পঁচিশে বৈশাখের পরে বাইশে শ্রাবণ নয়, বাইশে শ্রাবণের জিজ্ঞাসার প্রত্যুত্তরেই ২৫শে বৈশাখ। তাই বিষ্ণু দের ভাষ্য "মৃত্যুকে দূরেই রাখি, জীবনের পঞ্চাগ্নি-আলোয় চোখে রাখি সর্বদাই পূর্ণতার প্রতীক কবিকে" এবং প্রত্যহের সচেষ্ট উৎসবে

বছরে বছরে গ'ড়ে যাই জীবনের স্বাধীন বিন্যাস
তোমার বসন্তগানে রক্তরাগে হৃদয়স্পন্দনে
আমাদের দিনের পাপড়িতে, জীবনের ফুলে ফুলে
ভ্রমর গুঞ্জনে নব পল্লব মর্মরে
গড়ে' তুলি আজ কাল শতবর্ষ পরে
আমাদের প্রতিদিন, কবি। (বিষ্ণু দে)

আধুনিক পাঠক হৃদয়কে এতো সচেতনভাবেই স্পর্শ করে। বাইশে শ্রাবণ মরণজয়ী প্রাণের সঙ্কল্পে নিরানন্দ, ভঙ্গুর স্বদেশে দীপ্যমান। এই মৃত্যুতিথি

বিবর্ণ অন্ধকারের মধ্যেও নবনব জন্মচেতনার স্পন্দনে অনুরণিত। সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের

তুমি শুধু আজ বাইশে শ্রাবণ
আনো জীবনের আকুল প্লাবন
সূর্যের মত জ্বলুক আকাশে অগ্নিজীবন স্মৃতি।
মৃত্যুজয়ের মন্ত্রণা দিক মহৎ জন্মতিথি।

*　　*　　*

মুক্ত প্রাণের আগুনে পুড়ুক মরণের সঞ্চিতি।
আমার সাগর-স্বপ্ন জাগাক তোমার মৃত্যুতিথি।

কিংবা অন্যত্র তরুণতর কবির বর্ণনায়—

হারাবে কি ? না-না, এই শ্রাবণের সজল কাজল
মেঘে-মেঘে তারই গান, তারই সুর করে টলোমল।
তারই নাম লেখা এই বিদ্যুতের উজ্জ্বল অক্ষরে
শ্রাবণী আকাশে। আর ঝড়ের সেতারে ঝরে পড়ে
তারই সুর। তারই গান অবিশ্রান্ত বৃষ্টির ধারায়।
তারই কথা ভেসে আসে উতরোল শ্রাবণ-সন্ধ্যায়।

(প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায়)

বাইশে শ্রাবণের চিন্তা অত্যন্ত সঙ্গতভাবেই পুনরুদ্ধার ও পুনরুজ্জীবনের শপথে অঙ্গীকারে আলোকিত হয়ে উঠেছে। দুঃখের আঁধার রাত্রি, ভয়ের বিচিত্র চলচ্ছবি সম্পর্কে রবীন্দ্র-মানসলোকের সচেতনতার কথাও এক্ষেত্রে মনে আসে :

দুঃখের আঁধার রাত্রি বারে বারে
এসেছে আমার দ্বারে .
একমাত্র অস্ত্র তার দেখেছিনু
কষ্টের বিকৃত ভান, ত্রাসের বিকট ভঙ্গী যত
অন্ধকারে ছলনার ভূমিকা তাহার।

যতবার ভয়ের মুখোস তার করেছি বিশ্বাস
ততবার হয়েছে অনর্থ পরাজয়।
এই হার-জিত খেলা, জীবনের মিথ্যা এ-কুহক

শিশুকাল হতে বিজড়িত পদে পদে এই বিভীষিকা,
দুঃখের পরিহাসে ভরা।
ভয়ের বিচিত্র চলচ্ছবি—
মৃত্যুর নিপুণ শিল্প বিকীর্ণ আঁধারে॥

(রবীন্দ্রনাথ : শেষ লেখা)

এবং মৃত্যুলীলার এই অন্ধকারেও রবীন্দ্র-মানসলোকে শেষ নিমেষ পর্যন্ত মৃত্যুর সকল দেনা শোধ ক'রে বিচিত্র প্রত্যয়ের সজ্জিত প্রান্তরে উত্তরণের বিস্ময় সঞ্চারিত। খুবই পরিতৃপ্তির বিষয়, উত্তরসূরীর চোখেও এই বিস্ময়-বোধ সঞ্চারিত হবার পথে বাধা ঘটে নি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য ইয়েটস্-এর স্মৃতিতে নিবেদিত অডেনের কবিতাটি। রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে যেমন বাইশে শ্রাবণের মেঘ-ছলোছলো অঝোর প্লাবন, ইয়েটস প্রসঙ্গেও তেমনি তীক্ষ্ণ শীতের জানুয়ারীর তুষার প্রবাহের নির্মমতা :

He disappeared in the dead of winter
The brooks were frozen, the air-ports almost deserted,
And snow disfigured the public statues,
The mercury sank in the mouth of the dying day
O all the instruments agree
The day of his death was a dark cold day

এবং একথাও স্মরণীয় যে রবীন্দ্রনাথের তিরোধান যেমন দ্বিতীয় মহাসমরের তাণ্ডবের মধ্যে তেমনি ইয়েট্স্-এর মৃত্যুও এই বিশ্বযুদ্ধেরই প্রস্তুতিপর্ব (জানুয়ারী, ১৯৩৯)। রোদেনষ্টাইনের মাধ্যমে ইয়েট্স্ সর্বপ্রথম রবীন্দ্র-কাব্যের আস্বাদ পেলেন। 'আমার সমসাময়িক আর-কোনো ব্যক্তির এমন কোনো ইংরেজি রচনার বিষয় আমি জানিনে যার সঙ্গে এই কবিতাগুলির তুলনা হতে পারে।' রবীন্দ্র সম্বর্ধনাসভায় এই কথাই ঘোষনা করেছিলেন ইয়েট্স্। দু'জনেই বিবেকবান কবি। পার্থক্য এইখানটায়, জীবনের শেষের দিকে ইয়েট্স্ হতবাক, নিরুৎসুক ; রবীন্দ্রনাথ শেষ পর্যন্ত সচেতন, সন্ধানী।

পঁচিশে বৈশাখের উৎসব প্রেমের উৎসব, শান্তি ও সমন্বয়ের উৎসব। মানুষের মহত্বকে পরিপূর্ণরূপে উপলব্ধি করার দিন। শান্তিনিকেতন এই উপলব্ধির সহায় ; রবীন্দ্রনাথের প্রতিকৃতি, রবীন্দ্রসঙ্গীত, রবীন্দ্রনাথের

আঁকা ছবি বোধহয় সে-কারণেই তরুণতর কবিহৃদয়ে বৈচিত্র্যময় সৃষ্টিধর্মী অনুপ্রেরণা জোগায়।

আলাদা লিখন—ছড়া বাঁধে তা'ও
মহারচনার উদার উধাও
আত্মসাতের টানে,
কত প্রেরণার মহাতরঙ্গ খুঁজে বুঝে নিয়ে নিজ প্রসঙ্গ
মানুষে মানুষে ছড়ায় লক্ষখানে।
রব না রব না দূরে আর,
পেয়েছি কবির শান্তিলোকে
মহামিলনের খোলা দ্বার।

(সুনীলচন্দ্র সরকার)

তবে চিত্র অবচেতনার মৌন গুহার গভীরে
অজন্তার থেকে দূর হোক অন্য শিল্পের ভাস্কর্য,
করুক আনন্দ খেদ। আলো তার রূপের বলাকা
মেলে দিক দূর নভে প্রজ্ঞার অপূর্ব কারুকার্য,
সে প্রশান্তি রমণীয়। সুচেতন কবির তিমিরে
আবেক ভাস্কর তুমি, জেলে দাও ক্লান্তির আশ্চর্য॥

(বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়)

কিন্তু তার ছবি অন্য, জীবনে ভ্রূকুটি,
ব্যঙ্গ, কিংবা তীব্র সুরা—অথবা বিকল্প
দর্পণে বীভৎস ছায়া, দূরতম স্মৃতি
যামিনীতে বিপর্যস্ত। নাভি স্নায়ু শিরা
নীল রক্তে স্নাত হবে, বিবসনা নারী
ভাববে যৌবন গেল, জলুলে ঈর্ষাতে
মুখ দেখবে চন্দ্রালোকে।

(অরুণ ভট্টাচার্য)

এই ধ্বনি নীলকান্ত মেঘে মেঘে তারার কাকলী,
হৃদয়ের নিশিপদ্মে যন্ত্রণার উন্মীলিত সুখ।

সুরের তরঙ্গ সে কী বিভোর আনন্দে আঁকে ছায়া :
সমুদ্র-মুকুরে দেখি বাসনার প্রিয়তম মুখ।

(মোহিত চট্টোপাধ্যায়)

এটা স্বাভাবিক ও প্রত্যাশিত যে রবীন্দ্র-তিরোভাবের দীর্ঘকাল পরেই উচ্ছ্বাসবর্জিত পবিশুদ্ধ উপকরণের সংযোগে রবিবন্দনা সহজতর হবে। নীচের স্তবকগুলো থেকে—

আকাশে বরুণে দূর স্ফটিক ফেনায়
ছড়ানো তোমার প্রিয়নাম,
তোমার পায়ের পাতা সবখানে পাতা
কোন্‌খানে রাখবো প্রণাম। (দিনেশ দাস)

যখনই তাকাই তোমার শিরীষে, তোমার বটে
শাখায় শাখায় সুর বেজে ওঠে, পাখীরা গায়
স্নিগ্ধ সলিল ধীরে ধীরে লাগে নদীর তটে।

(শিশিরকুমার দাশ)

রবীন্দ্রনাথ মৌলি পাহাড়, জলপ্রপাত আমি .
দুঃখ তো আর বলি না ইনিয়ে-বিনিয়ে,
কবিতায় বাঁচে প্রজ্ঞাশাসিত অসুস্থ পাগলামি,
রৌদ্দুরে যাই, রৌদ্দুরে যাই মিলিয়ে।

(অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত)

অন্তত একথা বলা যায় যে রবীন্দ্রচেতনা হাল আমলের কবিদের বিচিত্রভাবেই ক্রিয়াশীল ক'রে রেখেছে এবং রবীন্দ্রের সঙ্গে কবীন্দ্রের মিল জুগিয়ে রবি-প্রশস্তির এখন আর কোনো আশঙ্কা নেই। বরঞ্চ বলা যেতে পারে রবীন্দ্র-চিন্তার ক্ষেত্রে আধুনিক কবিতা যেমন প্রসঙ্গ-প্রকরণের সহযোগ-সন্ধানী, অন্যদিকে তেমনি বহিরাশ্রয়ে, অর্থাৎ, ছন্দে, ভাষায় ও প্রতীকে স্থিতিস্থাপকতা তার কাম্য। রবীন্দ্র-কাব্যের ভাবানুষঙ্গের সাহায্যে ইদানীংকালের প্রবীন কবিদের কেউ কেউ যেমন রবিবন্দনায় বৈচিত্র্য সঞ্চারে সক্ষম অন্যদিকে তেমনি তরুণতম কবিরাও সচেতনভাবেই ভিন্নতর উপায়ে কাব্যশরীর সংগঠনে উৎসাহী। নীচের দু'টি উদ্ধৃতি ভাষা ও ছন্দের দিক থেকে রবীন্দ্ররচনার অনুকৃতি হয়েও সার্থক :

শক্তি এল সত্যের প্রত্যয়ে।
ভোরে উঠে জনে জনে পরম বিস্ময়ে
মহাবাণী, শুভ্রপটে জেনেছে তোমায় মর্মমাঝে
পেয়েছে সত্তার স্পর্শ, দিনকাজে
বিদ্যালয়, কৃষি, শিল্প, সাহিত্য সমাজে জাগে ভাষা।
প্রজ্বলন্ত আশা
মধ্যাহ্নে তোমার ছন্দে গ্রামে গ্রামে নবীন সংগ্রাম
করিছে প্রণাম।

(অমিয় চক্রবর্তী)

আমারে জাগায়ে দিলে,
চেয়ে দেখি এ নিখিলে
সন্ধ্যা, উষা, বিভাবরী, বসুন্ধরা-বধূ বৈরাগিনী,
জলে স্থলে নভতলে
গতির আগুন জ্বলে
কূল হ'তে নিলো মোরে সর্বনাশা গতির তটিনী।

(অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত)

পক্ষান্তরে অতি-সাম্প্রতিক, অতি-তরুণ কবিরাও রবিবন্দনায় বিচিত্র উপাদানের সন্ধানী, তার কিছু প্রমাণ ইতিমধ্যেই উদ্ধৃত স্তবকগুলোর কোনো কোনো-টিতে কাব্যরসজ্ঞ পাঠক খুঁজে পাবেন হয়তো। নিছক উপকরণ নয়, আন্তরিক কাব্যানুভূতির উপরেই এযুগের কবির উদ্যোগ নির্ভরশীল। এই কাব্যানুভূতি (the poetic sense) আধুনিককালের সমালোচকের বিচারে আধুনিক কবিতার আত্মার শরীর। "The poetic sense, in the work, corresponds to the poetic experience, in the poet · The poetic sense is to the poet what the soul is to man" এবং সে-কারণেই বোধহয় অতি সাম্প্রতিক বাংলা কবিতা নিছক ভাবাবেগ বা ছন্দোবৈচিত্র্যের উপর নির্ভরশীলতা থেকে মুক্তিসন্ধানী, নতুনতর এবং ভিন্নতর উপকরণে কবিতার হৃদয়পদ্ম সংগঠনে স্বাভাবিকভাবেই উৎসাহী।

রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে আমাদের ধারণা যে ক্রমে ক্রমে পরিবর্তিত হচ্ছে তার অনেক লক্ষণ সাম্প্রতিককালের কাব্যশরীরে বর্তমান। তিরিশ বছর আগে

'ঋষি' কথাটি রবীন্দ্র-ব্যক্তিত্ব প্রসঙ্গে বারবার ব্যবহার করবার রেওয়াজ ছিল। গান্ধিজী প্রবর্তিত 'গুরুদেব' কথাটিও অনুরূপ বহুসম্মানিত ধারণার ও শ্রদ্ধা-নিবেদনের পরিপোষক। কিন্তু এই ধরণের বিশেষণগুলো রবীন্দ্রনাথকে জিজ্ঞাসু পাঠকের নিকটবর্তী করার পথে অন্তরায়, অন্তত: এখনকার দিনে, রবীন্দ্রজীবনীর অজস্র উপকরণের সঙ্গে পরিচিত হয়ে, মনে করবার সঙ্গত কারণ রয়েছে। শেষ বয়সে, প্রিয়জনদের সঙ্গে নানা লঘু মুহূর্তের হাস্য-কৌতুকের ফাঁকে-ফাঁকে, তিনি এমন মন্তব্য করেছেন যা থেকে মনে করবার সঙ্গত কারণ আছে যে রবীন্দ্রনাথ তাঁর ব্যক্তিস্বরূপের ব্যাপক মহিমাকীর্তন চাননি, আকাঙ্ক্ষা করেছিলেন তাঁর ব্যক্তিস্বরূপের যথার্থ বিশ্লেষণ। আধুনিক কালে এই বিশ্লেষণ বহুল পরিমাণে সার্থকতা লাভ করেছে বলে আমার ধারণা। রবীন্দ্রনাথকে নিবেদিত বাঙালী কবিদের সম্প্রতি প্রকাশিত কবিতা সংকলন পাঠেও এই ধারণা বদ্ধমূল হবে।৩

---

৩ উদ্ধৃত কবিতাগুলি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত 'কালপুরুষ' কবিতা সংকলন থেকে গৃহীত হয়েছে। এই সঙ্কলনগ্রন্থে সর্বসমেত ৮৩ জন কবির কবিতা সংগ্রহিত হয়েছে। —লেখক

রবীন্দ্রসাহিত্যে বিজ্ঞানদৃষ্টি

গুরুদাস ভট্টাচার্য

নবজাগরণের দিনে ইয়োরোপের শ্লোগান ছিল 'প্লাস আলট্রা'—'সামনে আরও আছে'। এ শ্লোগান রোমান্টিক শিল্পী-মনের এবং বিজ্ঞানীরও। যা পরিচিত, যা কাছের, তার প্রতি একটা অবোধ অতৃপ্তি এবং যা অপরিচিত, যা দূরের, তার প্রতি তীব্র আকর্ষণবোধ কল্পবৃত্তিকে প্রাণদান করে। বিজ্ঞান পরিচিত কাছের বস্তুকে অবহেলা করেনা, তারও লক্ষ্য অজানা অচেনা সুদূরের রহস্য, তাকে জানবার আকাঙ্ক্ষা। তবু কল্পবৃত্তি ও বিজ্ঞানবৃত্তি অভিন্ন নয়, দুয়ের জানবার আকাঙ্ক্ষা, পদ্ধতি, ফলাফল এবং প্রতিক্রিয়াও এক নয়। উভয়ে দুই প্রান্তীয় মেরুর অধিবাসী। অনেক কবিহৃদয় বিজ্ঞানের সত্যের কাছে আত্মদান করতে পারে না, বলে: 'ন বুঝিয়া থাকা ভালো, বুঝিলেই নেভে আলো'। কিন্তু বিজ্ঞান জানে, না বুঝলে আলো জ্বালানো যায় না।

তবু বিজ্ঞান কল্পবৃত্তি তথা আর্টের শত্রুশিবির নয়, বরং তার সহায়ক। একথা ঠিক যে অনেক অজানা তথ্য ও তত্ত্বের রহস্য বিজ্ঞান আবিষ্কার করেছে, যাদের আশ্রয় করে একদা মন ডানা মেলত ভাবনার আকাশে। সেইসঙ্গে এও সত্য যে, বিজ্ঞানের আবিষ্কার আরও নতুন নতুন রহস্যের ইঙ্গিত এনে দিয়েছে, যা অবলম্বন করে মন আরও অবাধে আকাশযাত্রা করতে পারে আমরা একদিকে যেমন অজ্ঞাতকে জানছি, তেমনি অন্যদিকে অজানার পরিধিও অনেক বেড়ে যাচ্ছে , সেইসঙ্গে প্রসারিত হচ্ছে কল্পচেতনা, তার এলাকা, জেগে উঠছে নতুনতর ছন্দ ও ছবি।

বিজ্ঞানের ছোট বড় আবিষ্কার এবং কারিগরী কৃতিত্ব সমাজজীবনের চেহারা বদলে দিচ্ছে। সমাজের পালাবদলে মন এবং সেইসঙ্গে মানুষের সমস্ত কাজ অকাজ, জীবনরীতি এবং চিন্তা-শিল্প সবই নতুন রূপ গ্রহণ করেছে। এইভাবে বিজ্ঞান মানুষের জীবন ও মনের, সাংস্কৃতিক বিবর্তনের পশ্চাতে নিত্য সক্রিয়, আবার নতুন জীবন-মন-সজ্জিৎসা নবতর বিজ্ঞানভাবনার দিকে সমগ্র প্রচেষ্টাকে এগিয়ে দিচ্ছে। বিজ্ঞানের ব্যবহারিক দিক ছাড়াও তার

প্রয়োগ তথা পদ্ধতির দিকও আছে। নতুন-নতুন যন্ত্র যেমন আমাদের রূপ-দৃষ্টি ও ছন্দ চেতনাকে কেবলই বদলে দিচ্ছে, তেমনি বিজ্ঞানের বিশ্লেষণ ও প্রয়োগবিধিও জাগিয়ে তুলছে বিজ্ঞান চেতনাকে। তার ফলে ব্যক্তির জীবনদর্শনে ও শিল্পরূপায়নে নবীনতর রস-রীতি জেগে উঠছে। অবশ্য বিশুদ্ধ বিজ্ঞানদৃষ্টিসম্পন্ন আর্টিস্ট প্রায় দুর্লভ বললেই চলে। কারণ উভয়ের এলাকা আলাদা, পথ ও পন্থা আলাদা, তবু এযুগের শিল্পী যে অনেক বেশি তথ্য ও যুক্তি সম্মত, সেটুকুই অনেক বড়ো লাভ। এরও পরে আছে বিজ্ঞানের তত্ত্বের দিক। প্রকৃতির মধ্যে বিবিধ শক্তির যে লীলা, তার রহস্য উদ্‌ঘাটন করে, প্রকৃতিকে অনুগত ঐ শক্তির বিচিত্র লীলা এবং তার মাধ্যমে প্রস্ফুটিত যে অনন্ত সুষমা, তাকে সে উপলব্ধি করতে চায়, নিয়মের রাজত্বের পরস্পর নির্ভর বিধিগুলি জেনে তাদের কেন্দ্রে পৌঁছতে চায়, তার সুবিহিত ব্যাখ্যা দিতে চায়। শুধু প্রকৃতির নয়, চলমান জীবনের সমগ্র রূপ ও রূপান্তরকেই সে বুঝতে চায়, তার একটি সুশৃঙ্খল তত্ত্ব-ভাষ্য দেবার চেষ্টা করে। বিজ্ঞানের তত্ত্ব তখন দর্শনকে স্পর্শ করে, তাকে প্রভাবিত করে। এবং এই দর্শনের মাধ্যমে অথবা সোজাসুজি বিজ্ঞানের তত্ত্ব আর্টের রাজ্যেও প্রবেশ করে। বলা বাহুল্য, অধিকাংশ ক্ষেত্রে দার্শনিক, আর্টিস্ট তো বটেই, বিজ্ঞানের বিশ্লেষণ ও নিজেদের মতো করে গ্রহণ-বর্জন করেন। ফলে দর্শন বা আর্টের বক্তব্য মূল তত্ত্ব থেকে অনেকখানি সরে যায়, স্বরাষ্ট্রিয় প্রয়োজনও মনোমত রূপান্তরিত হয়। বিজ্ঞানী এই রূপান্তরণকে উৎসাহ দেন না, বলেন, এগুলি অপবিজ্ঞানের নমুনা। উচিত-অনুচিতের প্রশ্ন না তুলে, বিজ্ঞানের সঙ্গে দর্শন ও আর্টের এই ঘনিষ্ঠযোগকে স্বীকার করে নিতেই হয়, এই যোগাযোগে চিন্তা-অনুভব ও তাদের প্রকাশভঙ্গির আবর্তন-বিবর্তনের দিকে চোখ বন্ধ করে থাকা যায় না। কারণ এই সংযোগ বহু প্রাচীন এবং কাল যতো আধুনিক হয়ে উঠছে, এই ঘনিষ্ঠতা ততো নিবিড়তা লাভ করছে। বিজ্ঞান, জীবন ও দর্শন মিলে রূপ পাচ্ছে জীবনদর্শন, জীবনশিল্পী তাকে প্রয়োগ ও উপলব্ধি করতে চাইছেন তাঁর সৃষ্টির মাধ্যমে। অনেক ক্ষেত্রে হয়তো তা অপবিজ্ঞান, কিন্তু সবক্ষেত্রে নয়।

বিজ্ঞানেরও সংজ্ঞা ও প্রয়োগপদ্ধতির বিবর্তন হয়েছে। একদা বিজ্ঞান বলতে বোঝাতো 'তত্ত্ব বা তথ্যের জ্ঞান', পরে 'সুসম্বদ্ধ ও সুশৃঙ্খল সর্বজনগ্রাহ্য

যাবতীয় জ্ঞান', এখন 'প্রাকৃতিক ঘটনাবলী ও তাহাদের সম্বন্ধে পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণলব্ধ শৃঙ্খলাবদ্ধ জ্ঞান'-কে বিজ্ঞান বলা হয়। প্রাক্-রেনেশাঁস ও রেনেশাঁস-উত্তর, ডারউইনের আগে ও পরের বিজ্ঞানচর্চার মধ্যে সামূহিক পার্থক্য লক্ষ্যগোচর। এবং বিজ্ঞানের বিবর্তনের সঙ্গে দর্শনচিন্তা ও শিল্পরূপের বিবর্তনেরও যোগ বিদ্যমান। ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর সংস্কৃতির ভিন্নমুখিতার অন্যতম কারণও এখানে।

পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণলব্ধ জ্ঞানই যদি বিজ্ঞান হয়, তবে তার ইতিহাস চারশো কি পাঁচশো বছরের বেশি নয়। আধুনিক রোমান্টিক সাহিত্যের জন্ম একই সময়ে। 'বিজ্ঞান কল্পনার হত্যাকারী', এই অতি-সাধারণ সূত্র ধরে রোমান্টিক কবি মুখ ফিরিয়েছেন তার দিক থেকে। কিন্তু বাস্তব জীবনে বিজ্ঞানের ব্যবহারিক অবদানকে অস্বীকার করতে পারেন নি, ফলে জ্ঞানে বা অজ্ঞাতে তাঁর মনোজগতেও বিজ্ঞান আপন স্বাক্ষর রাখতে শুরু করেছে। দিনে-দিনে তার প্রভাব বেড়েছে, রবীন্দ্রসাহিত্যেও তার দৃষ্টান্ত অপর্যাপ্ত নয়।

ঊনবিংশ শতকের বাঙলায় ইয়োরোপের নব্য বিজ্ঞানচিন্তা অপরিহার্য হয়ে উঠেছিল—শুধুমাত্র স্কুল-কলেজের অবশ্যপাঠ্য বিষয়ের মাধ্যমে নয়, নানা দার্শনিক তত্ত্বচিন্তার মধ্যে দিয়েও। নব্য ন্যায়ের উদ্গাতা বাঙালী আবেগ-প্রবণ হয়েও যুক্তি-অসম্মত নয়। তাই বিজ্ঞানের যথার্থ গবেষণা সংখ্যালঘু হলেও তার তাত্ত্বিকপ্রভাব অনস্বীকার্য আন্দোলন এনেছিল যেমন বাইরের জীবনে, তেমনি মানসচিন্তাতেও। ঊনবিংশ শতাব্দীর এই আলোড়নের উত্তরাধিকারী হয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁর পাঠ্যতালিকায়, সেকালের নিয়ম মতো, বিজ্ঞানবিষয়ক বই যেমন ছিল, তেমনি হাতে কলমে বিজ্ঞানচর্চার সুযোগও তিনি পেয়েছিলেন, যদিও সে প্রচেষ্টা হাস্যকরই ছিল। প্রসঙ্গত ফুলের রস বার করার ছেলেমানুষী চেষ্টার কথা উল্লেখযোগ্য, যাকে তিনি বলেছেন, 'জীবনে এই একবার এঞ্জিনিয়ারি করতে নেবেছিলুম'। বাল্যের এই জ্ঞান ও গবেষণার মেজাজ তাঁর আজীবন সঙ্গী ছিল, নিজেকে এবং নিজের শিল্প নিয়ে নতুন নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষায় নামতে তিনি তাই কখনও পিছিয়ে আসেন নি? এবং এই জন্যেই অতিশয় রোমান্টিকতা সত্ত্বেও তিনি জীবনবিহারী শিল্পীতে পরিণত হননি, আধ্যাত্ম ভাবনার নিবিড় প্রলেপ সত্ত্বেও বিজ্ঞানবুদ্ধিকে পরিহার করেন নি। যখন যথার্থ বিজ্ঞানীদের অনেকেই

বৈজ্ঞানিক তথ্যেব সঙ্গে অলৌকিক তত্ত্বকে মিশিযে ফেলেছেন, তখন ববীন্দ্রনাথ অতিলৌকিকতাকে পেছনে ফেলে এগিয়ে যেতে চেয়েছেন যথার্থবাদী বিজ্ঞানের অভিমুখে। অনেক ক্ষেত্রেই বিজ্ঞানের বক্তব্যকে তিনি স্বগত দর্শন ও শিল্পচিন্তাব অনুগামী করেছেন, রূপবদল ঘটিয়েছেন, কিন্তু জগদীশচন্দ্রেব মতো পৌবাণিক ও বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাব অপরূপ সংমিশ্রণ ঘটান নি। তাঁব 'বিশ্ব-পবিচয' বইটি তাই স্বধর্মচ্যুত নয, একমাত্র ভাষাব ক্ষেত্র ছাডা আব কোথাও কবি (বা দার্শনিক) আত্মঘোষণা কবে নি।

বিশ্বপ্রকৃতি, জীবন ও মানুষেব ধর্ম সম্পর্কে ববীন্দ্রনাথেব একটি নিজস্ব দর্শন গড়ে উঠেছে। গডে উঠেছে ধীবে ধীবে, বযস ও অভিজ্ঞতাব নানা স্তব পেবিয়ে-পেবিয়ে। তাব ভিত্তিতে বযেছে বাস্তব জীবন ও সে-সম্পর্কে বক্তাব বিশিষ্ট মনন, আছে উপনিষদেব কাণ্টেব বের্গসঁব দর্শনসূত্র, প্রবক্তা যিনি, তিনি দার্শনিক, কবি তাঁব সূত্রধাব। একটি দুটি বইযে নয, সমগ্র ববীন্দ্রবচনাবলীতে এবং কর্মধাবাতেও ছডিযে আছে তাঁব দার্শনিকতা কালে কালে যাব বিবর্তন-বিবর্ধন হযেছে। সমুদ্রোপম সেই বচনাগুলি থেকে ববীন্দ্রনাথেব স্বগত জীবনদর্শনেব মহৎ ছবিটি তুলে আনলে দেখা যাবে, এখানেও তিনি বাস্তব, বিজ্ঞানেব দিকে পিঠ ফিরিযে থাকেন নি। কেবলমাত্র বিজ্ঞানেব তত্ত্বে নির্ভবতাই নয, বক্তব্য সুপ্রকাশেব উদ্দেশ্যে তাব নানা সমীক্ষাকে উল্লেখ ও বিচার কবেছেন, সমীকবণ কবেছেন, উদ্ভিদ ও প্রাণীজগৎ অণু ও কোষতত্ত্ব থেকে দৃষ্টান্ত আহরণ ক'বে।

ববীন্দ্রসাহিত্য ববীন্দ্রজীবনদর্শনেব বসভাষ্য। বোমান্টিকতা ও দার্শনিক-তাব পাশাপাশি বিজ্ঞানকেও তিনি এখানে বাবেবাবে ছুঁয়েছেন। প্রথম পর্বে সে স্পর্শ ছিল বিক্ষিপ্ত, কতকগুলি বৈজ্ঞানিক তথ্যেব পবিপোষক জীবনচিন্তা মাত্র। এবং মানস-আবেগেব স্রোতে সে-তথ্যও নতুন রূপ-দেহী। মধ্যপর্বে রূপান্তবণ ব্যাপকতব ও সুবিহিত, প্রথম বিশ্বযুদ্ধেব পব কবি ববীন্দ্রনাথ আবির্ভূত হযেছেন দার্শনিকরূপে, জীবনের তত্ত্ব ও অভিব্যক্তিকে একটি সুবিহিত ভাষ্যে ধবতে চেয়েছেন. সেই ভাষ্য বিজ্ঞানেব কাছে কম ঋণী নয। শেষ পর্বে তিনি আবও গভীবভাবে বিজ্ঞানবিষযে পডাশোনা ও আলোচনা কবেছেন, তাব ফল ব্যক্ত হয়ে উঠেছে তাঁব চিন্তায ও বচনায; আইডিযালিজ্‌ম্ থেকে সরে গিযে পা দিযেছেন মেটিবিযালিজ্‌ম্-এব বাজ্যে, বিজ্ঞান বুদ্ধিকে

নির্ব্যূঢ় স্বীকৃতি জানিয়েছেন, বিজ্ঞান ও শিল্পকে এনেছেন কাছাকাছি, বলেছেন : 'সায়েন্সেই বলো আর আর্টেই বলো, নিরপেক্ষ মনই হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ বাহন।'

বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার মধ্যে উদ্ভিদ ও জীববিদ্যা এবং পদার্থবিজ্ঞানই বোধহয় একালের চিন্তাকে সবচেয়ে বেশি নাড়া দিয়েছে, জীবনের সম্পর্কে নতুন ভাষ্য রচনায় কবি-দার্শনিককে সাহায্য করেছে। উনবিংশ শতকের বাঙলায় নিউটন ও ডারউইনের আবিষ্কৃত তথ্য এবং বেকন ও কাণ্টের তত্ত্বচিন্তাই প্রধান হয়ে উঠেছিল। রবীন্দ্রকাব্যের প্রথম পর্যায়ে এই বৈজ্ঞানিক তথ্য ও তত্ত্বের যে গভীর প্রভাব, সেদিকে আমাদের দৃষ্টি ফিরিয়েছিলেন অজিতকুমার চক্রবর্তী। বিশেষত 'বসুন্ধরা' ও 'সমুদ্রের প্রতি' কবিতায় বিবর্তনবাদের ছায়া স্বতঃসঞ্চারী। 'ঝুলন' কবিতায় জীবন মৃত্যুর দোলা রূপ পেয়েছে, 'বর্ষশেষ'-এ বিধৃত হয়েছে পুরাতনের পটে নতুনের লীলা, ফুলের মধ্যে থেকে ফলের আবির্ভাবের মতো। উভয় ক্ষেত্রেই বিজ্ঞান কথিত 'জীবনসংগ্রাম' বা 'স্ট্রাগ্‌ল্ ফর এক্‌জিস্‌টেন্‌স্' মৌল প্রেরণা রূপে কাজ করেছে। এই তত্ত্বকে আরও স্পষ্ট ব্যাখ্যা করা হয়েছে বিসর্জন নাটকে রঘুপতির সংলাপে, গান্ধারীর আবেদনে দুর্যোধন ও গান্ধারীর বিপরীতমুখী বক্তব্যে। এখানে কবি জীবন-সংগ্রামের সঙ্গে যুক্ত করেছেন যথারীতি 'যোগ্যতমের উদ্বর্তন'-তত্ত্বকে এবং সাম্রাজ্যবাদী দর্শনের এলাকায় এই তত্ত্ব যে কী বিকৃত রূপ গ্রহণ করে, তাও শুনিয়েছেন দুর্যোধন প্রমুখাৎ, কিন্তু বিবর্তনবাদী কবি জানেন, জীবনের অগ্রস্থিতির একটি সুশৃঙ্খল বিধি আছে, অনেক চড়াই উৎরাই পেরিয়ে সে এগিয়ে চলে স্বপন্থায়, অবশ্যম্ভাবী পরিণামের পথের আপোষ। তিনি জেনেছেন বিবর্তনকে ব্যক্তির ক্ষেত্রে (যেমন 'দুঃসময়'), বিশ্বের ক্ষেত্রে (যেমন 'যেতে নাহি দিব'), সমগ্র জীবনের ক্ষেত্রেও (যেমন গান্ধারীর রুদ্র-আবাহন মন্ত্রে)। তাঁর একটি কৈশোরক কবিতা 'সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়'-এ এই সামগ্রিক বিবর্তনের ছবি আছে, এখানে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর থাকলেও মূল বক্তব্য : জীবন এগিয়ে চলে স্থিতি থেকে গতিতে, সে-গতি আনে প্রলয়, ধ্বংস-মাধ্যমে সৃষ্ট হয় নতুন, অভিব্যক্ত হয় জীবনের ধারা।

কিন্তু কবির বিজ্ঞানচেতনা এখনও বিক্ষিপ্ত, গতির তত্ত্ব মুখ্যতঃ দর্শনের সহযোগী। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর এই গতিতত্ত্ব রূপ নিল একটি সুশৃঙ্খল দার্শনিকতার। এখানেও কবি উপনিষদ এবং পাশ্চাত্য দার্শনিকদের, বিশেষতঃ

বের্গসঁর কাছে ঋণী, তবু এপর্বে ববীন্দ্র-দর্শন তাঁব নিজস্ব সম্পদ। এবং এব সঙ্গে নিবিড় যোগ বয়েছে 'অভিব্যক্ত' গতিবিজ্ঞানেব। বের্গসঁ গতিবিজ্ঞানকে নিজ দার্শনিক তত্ত্বেব উপযোগী কবে তৈবি কবে নিয়েছিলেন, ববীন্দ্রনাথও তাই কবেছেন। বস্তুতঃ অভিব্যক্তিবাদনিষ্ঠ গতিবিজ্ঞান এই সময়েব সাহিত্যিক মানসে বড়ো বকম চিন্তাব ঢেউ তুলেছে এবং সেই চিন্তা প্রকাশ পেয়েছে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে। বোমাঁ বঁলা, বার্ণার্ড শ, টলস্টয়েব জীবন-জিজ্ঞাসায় তাব পবিচয় পাওয়া যায়। বলা বাহুল্য, দার্শনিকদেব প্রভাবও এক্ষেত্রে কম নয়। বিবর্তন উদ্বর্তন প্রাকৃতিক নির্বাচন এবং সংগ্রাম ও মৃত্যুব মধ্যে দিয়ে প্রাণেব গতিমুখব অভিব্যক্তি—বিবর্তনেব এই তথ্যসম্মত তত্ত্ব, যেমন অন্যান্যদেব, তেমনি ববীন্দ্রনাথেব এই সময়কাব উপলব্ধিব মৌল ভিত্তি। 'বলাকা' এই ভিত্তি-তত্ত্বেব, ৰাবীন্দ্রিক গতিবাদেব কাব্যরূপ, তাব ওপব প্রাসাদ নির্মিত হয়েছে 'লিপিকা'য় এবং প্রকৃতি-বিশ্বেব চাবিদিকে, বাইবে ও ভিতবে বিবর্তনেব বিচিত্র-বিবিধ অভিব্যক্তিকে কবি খণ্ড খণ্ডভাবে উপলব্ধি কবেছেন পববর্তী কাব্য ও নাট্য পালাগুলিতে।

পৃথিবীব বুকে প্রকৃতিব লীলা, ঋতুব বঙ্গনাট্য অবলম্বন কবে এই সময়ে অনেকগুলি বচনা প্রকাশিত হয়। সবগুলিবই বক্তব্য—আসা আব যাওয়া, দিনে দিনে মাসে ঋতুব বীতিবদল, আব ধবণীব পালাবদল, ভবা পাত্র শূন্য কবে নতুন কবে বাবেবাবে ভবে তোলা। কেন্দ্রীয় সৌবশক্তি এবং তাব বিকীর্ণ আলোব মাটিব বুকে শস্যেব অঙ্কুব ফুটে ওঠা আব মুছে ফেলা—এই বিষয়ে দুটি কবিতাব নাম 'সাবিত্রী' ও 'লিপি'। নিয়ত আবর্তমান ঋতুবঙ্গেব ছবি ফুটে উঠেছে 'মহুয়া' কাব্যে এবং ব্যাপকতব রূপ পেয়েছে কেতকী-শ্রাবণ-গাথা-শেষ বর্ষণ-বসন্ত-নবীন-নটবাজ ঋতুবঙ্গশালায়, ফাল্গুনী ও শারদোৎসবে। এগুলিব মূল ধুবা—'মুকুল ধবেও যেমনি, ঝবেও তেমনি'। এই নিয়মটি প্রাকৃতিক, কবি তাকে শিল্পরূপ দিয়েছেন আনন্দকে উত্তীর্ণ করে। এই 'ধবা' ও 'ঝবা' তথা মিলন ও বিবহেব মধ্যে দিয়ে প্রাণেব যে স্বতঃ অভিব্যক্তি, তাকেই তিনি দিয়েছেন নিগূঢ় রূপ, যাকে 'প্রাণপৈতি' বলে উল্লেখ কবেছেন 'বনবাণী'তে। এমনকি নিম্নতর প্রাণীজগতেও প্রাণেব এই নিত্য অভিব্যক্ত লীলারূপ তিনি প্রত্যক্ষ কবেছেন, শেষ পর্বেব কয়েকটি কবিতায় যাব স্বাক্ষব থেকে গেছে, যাকে তিনি নাম দিয়েছেন—কীটেব সংসাব।

বিবর্তনের অভিব্যক্তি যেমন উদ্ভিদ ও প্রাণীজগতে, তেমন মানুষেও। একসূত্রে সকলে বিধৃত। অনেকদিন আগে 'বসুন্ধরা' কবিতায় বা 'ছিন্নপত্রের' কয়েকটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ নিজেকে ও মানুষকে অনুভব করেছিলেন অভি-ব্যক্তিবাদের আলোকে। এই সময়ের 'মহুয়া' কাব্যে সেই অনুভব আরও সংহত ও বিজ্ঞানসম্মত। প্রকৃতি ও মানুষকে তিনি দেখেছেন বিবর্তিত গতির একই স্রোতে ভাসমান হ'তে, যেখানে আসাও সত্য, চলে যাওয়াও সমান সত্য। এই কাব্যের 'নাম্নী' জাতীয় কবিতাগুলিতে বিচিত্র নারী-চরিত্র রূপায়িত হয়েছে, যাদের সাযুজ্য কবি খুঁজেছেন উদ্ভিদ ঋতু ও প্রকৃতির রাজ্যে ('লতা যেন নারী হয়ে দিল চক্ষু ভরি')। প্রকৃতিরাজ্যের অন্যান্য প্রজাদের মতো মানবদেহের বিবর্তন, রবীন্দ্রসাহিত্যে সে তত্ত্ব অনুসারিত নয়। স্থানবিশেষে আবার হাল্‌কা চালেও কথা বলেছেন, যেমন 'সে' গ্রন্থে, ছবিও এঁকেছেন।

কিন্তু মানুষের বিবর্তন শুধু তো বহিরঙ্গ নয়, অন্তরঙ্গও অর্থাৎ সংস্কৃতিগত। মানবজীবনে বিবর্তনের অভিব্যক্তির সন্ধান করতে গেলে কেবলমাত্র দেহ ও প্রাণগত দিক থেকে দেখলেই হবে না, মানসিক-সামাজিক দিক থেকেও দেখতে হবে। একথা বলেছেন জুলিয়ান হাক্‌স্‌লী, এবং বর্তমান বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি স্বীকার করে এই অগ্রস্থিতি-তত্ত্বকে। কারণ মানুষ তো গাছ বা জন্তুর মতো কালের পুতুলমাত্র নয়, কলের পুতুলও নয়, কালের শিল্পীও। পরিবেশের দ্বারা তার দেহ-মন যেমন নিয়ন্ত্রিত হয়, তেমনি তার ঊর্ধ্বেও সে উঠতে পারে, পরিবেশকে নিয়ন্ত্রিত পরিচালিত করতে পারে। একদিকে সে একক, অন্যদিকে সে বহুতে ব্যস্ত। এই সত্যটিকে রবীন্দ্রনাথ সুন্দর করে বুঝিয়েছেন 'মানুষের ধর্ম' বইতে এবং দৃষ্টান্ত আহরণ করেছেন বিজ্ঞানীদের সমীক্ষা থেকে: 'মানবদেহে বহুকোটি জীবকোষ, তাদের প্রত্যেকের স্বতন্ত্র জন্ম, স্বতন্ত্র মরণ। অনুবীক্ষণযোগে জানা যায়, তাদের প্রত্যেকের চারিদিকে ফাঁক। একদিকে এই জীবকোষগুলি আপন আপন পৃথক জীবনে জীবিত, আর-একদিকে তাদের মধ্যে একটি গভীর নির্দেশ আছে, প্রেরণা আছে, একটি ঐক্যতত্ত্ব আছে, সেটি অগোচর পদার্থ। ·যেখানে তারা প্রত্যেকে নিজেরই স্বতন্ত্র জীবনসীমায় বর্তমান সেখানে তার মধ্যে রহস্য কিছুই নেই। কিন্তু যেখানে তারা নিজের জীবনসীমাকে অতিক্রম করে সমস্ত দেহের জীবনে সত্য সেখানে তারা আশ্চর্য।' একদিকে মানুষ এই স্বতন্ত্র জীবনসীমায় জন্ম-মৃত্যুর

দোলায় আবর্তিত, অন্যদিকে সে আশ্চর্য যার অভিব্যক্তি অনুভবে কল্পনায় ভাবনায়, ক্রমবিসর্পিত প্রকাশিত ঐতিহ্যে।

উদ্ভিদ ও প্রাণীজগতের মতো মানবজগতেও বিবর্তিত অভিব্যক্ত হয়, তার চেয়েও আরও কিছু বেশি, উভয় কোটির সাদৃশ্য সত্ত্বেও বৈসাদৃশ্য আছে। মানুষের দেহ আছে, প্রবৃত্তি আছে, সেইসঙ্গে আছে তার ইতিহাস সমাজ সংসার শিল্প চেতনা ধর্ম ঐতিহ্য। তত্ত্বটিকে রবীন্দ্রনাথ ব্যক্ত করেছেন এইভাবে: অভিব্যক্তি চলছিল প্রধানত প্রাণীদের দেহকে নিয়ে, মানুষে এসে সেই প্রক্রিয়ার সমস্ত ঝোঁক পড়ল মনের দিকে। পূর্বের থেকে মস্ত একটা পার্থক্য দেখা গেল। দেহে দেহে জীব স্বতন্ত্র, পৃথকভাবে আপন দেহরক্ষায় প্রবৃত্ত, তা নিয়ে প্রবল প্রতিযোগিতা। মনে মনে সে আপনার মিল পায় এবং মিল চায়, মিল না পেলে সে অকৃতার্থ। তার সফলতা সহযোগিতায়। যোগের এই পূর্ণতা নিয়েই মানুষের সভ্যতা।' সুতরাং মানুষকে দেখতে হবে তার বহিরঙ্গ অভিব্যক্তিতে, দেখতে হবে তার এই অন্তরঙ্গ সভ্যতার আলোকেও। পূরবীর 'তপোভঙ্গ' কবিতায় তত্ত্বটি শিল্পরূপ পেয়েছে: প্রকৃতির আসা-যাওয়া পার্থিব তত্ত্বের সাধারণ প্রকাশ, তার পটভূমিকায় কবি এঁকেছেন মনে-মনে মিল খোঁজার আলপনা। রঙীন ঋতুর মতো প্রেমও আসে চিত্তভূমিতে, চলে যায়, তারই মধ্যে কপোলে জাগে স্মিতমধুর দুচোখের তারার অনেক আকাশের অতলান্ত নীলিমা, মানসসরোবরের গভীরে বিচিত্র ঢেউয়ের উথালপাথাল পাগলামি, ভালোবাসা শুধু কোষের—স্নায়ুর চঞ্চলতা নয়, হৃদয়ের তরঙ্গও—যার অনেকখানি মানুষের নিজের তৈরি, সবটাই জড় প্রাকৃতিক নিয়মমাত্র নয়। প্রকৃতির রঙবদল আর প্রবৃত্তির রঙফেরা এক হয়েও যে এক নয়, তার পরিচয় রবীন্দ্রনাথ রেখেছেন তাঁর গীতিনাট্য নৃত্যনাট্য ও রূপকনাট্যে। গীতিনাট্যে প্রকৃতির লীলারঙ্গই মৌলতত্ত্ব, যার পটভূমিকায় দুলছে বিশ্বের জীবন-পালা, নৃত্যনাট্য ও রূপকনাট্যে সেই জীবনপালার লীলারূপ, যেখানে স্ব-পরিধিতে মানবমনের স্বগত অভিব্যক্তি, তার গড়া দ্বিতীয় ভুবনের রস-রূপ।

মানুষ যেমন অ্যানিম্যাল, তেমনি র‍্যাশনালও। তার বিবর্তন যেমন দেহের ক্ষেত্রে তেমনি মানসলোকেও। সেখানে আছে তার সমাজ ও সংসার, কর্ম ও শিল্প, চিন্তা ও চেতনা। রবীন্দ্রনাথ প্রাকৃতিক নিয়মের অভেদে মানুষকে

দেখেছেন, আবার দেখেছেন তাকে স্বতন্ত্ররূপে তার নিজস্ব এলাকায়। প্রাণের যে-গতিদর্শন বিশ্বসংসারে প্রসারিত, তারই বিচিত্র অভিব্যক্তি মানব-সংসারে ও চিত্তে। দেহের সীমায় অভিব্যক্তি বন্ধন পেরিয়ে-পেরিয়ে অগ্রস্থতিতে, মনও চায় বন্ধন থেকে নিত্য মুক্তি। অভিজ্ঞতা ও যন্ত্রণা আনন্দের মধ্যে দিয়ে সেই মুক্তিকে সে খুঁজে বেড়ায়। জীবন যে মুক্তধারা, প্রাণ নিয়ত চলমান, এই তত্ত্ব প্রকাশ পেয়েছে ডাকঘর নাটকে অমল এবং চতুরঙ্গ উপন্যাসে শচীনের মাধ্যমে। এই বিবর্তন ব্যক্তিগত ধর্মচেতনার মধ্যেও লক্ষ্যগোচর, রাজা নাটক এবং শেষ সপ্তক কাব্য তার প্রতিচ্ছবি। ধর্ম যেখানে সমগ্র সমাজের, সেখানেও সে নিত্য পরিবর্তমান, থেমে থাকা অর্থই তার মৃত্যু, তারই নাম 'অচলায়তন'। তাই পুরণো জীর্ণ অচলায়তন ভেঙ্গে নতুন চলায়তন তৈরি করতে হয়, ধর্মবোধের অভিব্যক্তি ঘটে। সমগ্র সমাজ যেখানে বিবর্তনের পথে এগিয়ে চলেছে, রাষ্ট্রধর্ম অর্থনীতিও তার সঙ্গে সঙ্গে উজিয়ে চলে, তাদের একজায়গায় ধরে রাখার অর্থ প্রাকৃতিক নিয়মের বিরোধিতা তথা সামগ্রিক মৃত্যু, সেইসঙ্গে এও সত্য যে প্রাণের অবশ্যম্ভাবী অভিব্যক্তিকে এইভাবে ধরে রাখা যায় না, থামিয়ে দেওয়া যায় না, যেভাবেই হোক সে আপন চলার পথ করে নেবেই। এই জড় ও জড়ত্ববিনাশী রাষ্ট্র ও অর্থ-নীতির প্রতিচিত্র মুক্তধারা ও রক্তকরবী। শুধু কি সমাজের বৃহত্তর ক্ষেত্রে? তার অঙ্গীভূত সংসারের ছোটছোট বৃত্তলোকেও অভিব্যক্তির সমান লীলা। কবি তা জানেন, সেই জানার পরিচিতি 'পলাতকা'র কবিতাগুলিতে। আর ছোট বৃত্তে, বৃত্তির স্বগত পরিসরেও বিবর্তন স্বকীয় পন্থায় গতিমুখর। প্রকৃতির পটভূমিকায় প্রেমের গতি-অগতিকে কবি অনুভব করেছিলেন মহুয়ায়, গীতিনাট্যে। কিন্তু এরও পরে, যেহেতু সমাজের-মানুষের-মানসের, সেহেতু প্রেমেরও যে নানা স্তর প্রক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া আছে, তার কথা তিনি বলতে চেয়েছেন চণ্ডালিকা, চিত্রাঙ্গদা, শ্যামা নৃত্যনাট্যে। এমনকি সুন্দর ও সৌন্দর্য-চেতনার মধ্যেও কবি দেখেছেন বিবর্তনের বক্র-প্রকৃত স্বরূপকে, যা পরিবেশ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, মানসিকতা দ্বারা পরিমার্জিত। পুনশ্চের 'শাপমোচন' এবং 'চিররূপের বাণী' এই বিবর্তনময় সৌন্দর্যবোধের কাব্যরূপ।

বিজ্ঞানী অবশ্য দেহের বাইরে অন্যতর কোন বিবর্তনকে বৈজ্ঞানিকতার শিলমোহর দিতে সহজে স্বীকৃত হবেন না, কারণ সে অভিব্যক্তি তাঁর এলাকায়

পড়ে না। কিন্তু বৃহত্তর অর্থে অভিব্যক্তি যে সমাজে ও মানসেও, এ সত্য অনস্বীকার্য। অপিচ, যেখানে বিজ্ঞানবিদের বিবর্তন-তত্ত্ব দিয়ে মানুষ জীবনকে প্রাণরহস্যকে বোঝবার চেষ্টা করে এবং ব্যাখ্যা করে, সেখানে সমস্ত পর্যবেক্ষণ বিজ্ঞানের বিশুদ্ধ এলাকায় না পড়লেও তা অপবিজ্ঞান নয়। কারণ তার ভিত্তি বিজ্ঞানেরই স্বয়ংক্রিয় তত্ত্ব এবং তার দৃষ্টিকোণ বৈজ্ঞানিক। সমাজ-সংসার-ধর্ম-রাষ্ট্র-অর্থ ইত্যাদি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য যান্ত্রিকভাবে বিজ্ঞান বলে গৃহীত নিশ্চয়ই হবে না, কিন্তু সেই মন্তব্য ও পর্যবেক্ষণের মূলে যে বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ও দৃষ্টি বিদ্যমান, তাঁর গতি-দর্শন যে গতি-বিজ্ঞানেরই প্রসারিত অনুভব, একথাও মনে রাখতে হবে। স্ব-প্রয়োজনে বিজ্ঞানের তথ্য ও তত্ত্বকে তিনি কতোটা রূপান্তরিত করেছেন, তার অপব্যাখ্যা দিয়েছেন কিনা—সেইটুকুই বিচার করে দেখা দরকার।

কিন্তু বলাকা-পূরবী যুগের গতিতত্ত্বের সঙ্গে বিজ্ঞানের যোগ যতটা, তার চেয়েও বেশি ঘনিষ্ঠতা দর্শনের সঙ্গে। শেষ পর্বে এসে রবীন্দ্রনাথ বিজ্ঞান সম্পর্কে অধিকতর অবহিত হয়েছেন গ্রন্থপাঠে এবং আইনস্টাইন সত্যেন্দ্রনাথ বসু প্রমুখ বিজ্ঞানীদের নিকট সংস্পর্শে এসে। উনিশশো তেত্রিশ সালে লেখা 'মানুষের ধর্ম' গ্রন্থে সবচেয়ে বড়ো স্থান দিয়েছেন বিজ্ঞানবুদ্ধিকে এবং তার কয়েক বছর পরেই লিখলেন 'বিশ্বপরিচয়', যেখানে কবি ও দার্শনিককে পেছনে ফেলে এগিয়ে এসেছে বিজ্ঞানী। বইটিতে, একমাত্র ভাষার জাদু ছাড়া আর কোথাও বৈজ্ঞানিক সত্যতা ও নৈর্ব্যক্তিকতা থেকে তিনি বিন্দুমাত্র বিচ্যুত হন নি। সে ভাষাও তথ্যের ঘনিষ্ঠতম আত্মীয়। অন্যত্র, অন্য বিষয়ের আলোচনা এবং সৃষ্টির ক্ষেত্রেও কবি বিজ্ঞানবুদ্ধিকে সামনে রেখেছিলেন।

ইতিমধ্যে বিশেষতঃ প্রাণ ও পদার্থের রাজ্যে বিজ্ঞানের নব-নব আবিষ্কার পুরনো তথ্য ও যুক্তিকে ভেঙেচুরে নতুন নতুন তত্ত্ব ও তথ্যকে সামনে এনে দিয়েছে। কোয়াণ্টা, ইলেকট্রনিক্স, রেডিও অ্যাক্টিভিটি, আপেক্ষিকতা ইত্যাদি পদার্থবিজ্ঞানে রূপান্তর এনেছে, প্রজনন-তত্ত্বের নয়া পর্যবেক্ষণ বিবর্তন অভিব্যক্তি তথা উদ্ভিদ জীববিদ্যাকে নবতর রূপ দিয়েছে। নিউটন ও ডার-উইনকে অতিক্রম করে বিজ্ঞানের তত্ত্ব আরও অনেক দূর প্রসারিত হয়েছে। বিশ্বপরিচয় গ্রন্থ এবং তার ভূমিকা থেকে জানা যায়, রবীন্দ্রনাথ বিজ্ঞানের এই অগ্রগতি সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত ছিলেন। সেই অবহিতির প্রকাশ তাঁর

বিভিন্ন রচনায়। প্রায় সমকালে লেখা খাপছাড়া প্রহাসিনী সে গল্পসল্প ইত্যাদি বইতে বিজ্ঞানের নতুন আবিষ্কৃত তথ্যগুলি ছড়িয়ে আছে মুক্তোর মতো। রিলেটিভিটির ওপর তিনি একাধিক কবিতা লিখেছেন, তাঁর 'আমি' ম্যাথেম্যাটিক্যাল গড-এর প্রতিচ্ছায়ায় রচিত বলে অনেকের অভিমত, 'পৃথিবী' কবিতায় তাঁর পৃথিবীচেতনা বিজ্ঞানসম্মত, 'সে' গ্রন্থে জীববিজ্ঞান ও পদার্থবিজ্ঞানের প্রতি কবির আকর্ষণ লক্ষণীয়। এখানে পাই—সৃষ্টি তথা বিবর্তনের তত্ত্ব, প্রজননশাস্ত্র, মহাকাশযাত্রার অনুশীলন, শারীরবিদ্যার আধুনিক আবিষ্কার, আলোর আধুনিকতম পর্যবেক্ষণ ইত্যাদি। কবি বা দার্শনিক নয়, বিজ্ঞানীই যে তাঁর আজকের প্রিয়তম, তার সাক্ষ্য মেলে 'সে' ও 'গল্পসল্প' বইতে। 'তিন সঙ্গী'-র তিনটি গল্পই এই প্রেয়োবোধের স্বাক্ষর। 'রবিবার'-এর আর্টিষ্ট অভীক প্রেমিকার মন পায়না, তাই সে জাহাজের ষ্টোকার হয়ে সাগরপাড়ি দেয়, 'শেষ কথার' নায়ক যন্ত্রবিদ্যা, পরে খনিজবিদ্যায় শিক্ষার্থী হন, এবং 'ল্যাবোরেটরী' গল্পের স্বনামেই প্রকাশ, রীক্ষাগাগার ও মানব-জীবন তথা মনকে কবি দেখেছেন রেখেছেন একই স্তরে, সমবিন্দুতে। বিজ্ঞানের সততায় যেমন তিনি নিঃসন্দেহে, তেমনি সংশয়িত হয়েছেন তার অমিতাচারে। একাধিক রচনায় সেই সংশয়কে ব্যক্ত করেছেন মানবতার দৃষ্টিপ্রদীপে।

কিন্তু বিজ্ঞানের দু একটি আবিষ্কারের উল্লেখ বা সমীক্ষার শিল্পরূপদানই বৈজ্ঞানিকতা নয়। বিভিন্ন আবিষ্কৃত তথ্য ও তত্ত্বের সমাবেশে বিজ্ঞান বিশ্বপ্রকৃতি সম্পর্কে একটি সামগ্রিক বক্তব্য গড়ে তোলে। এই বক্তব্যের অনুসরণই বিজ্ঞানবুদ্ধি। অপিচ পরীক্ষা ও পর্য্যবেক্ষণের এবং প্রয়োগের যে বৈজ্ঞানিক রীতি, তাও এখানে থাকা চাই। এই অর্থেই শেষ পর্বের রবীন্দ্র-দর্শনে এবং তাঁর পর্যবেক্ষণ ও প্রয়োগবিধিতে বিজ্ঞানচেতনা স্বতঃ বিদ্যমান। ওপরের উল্লিখিত তথ্যগুলি এই চেতনারই নানারকম স্ফুলিঙ্গ। এই বিজ্ঞান-বুদ্ধিই রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিকে আরও সহজ ও বাস্তব করে তুলেছে। যে বয়সে পৌঁছে অধিকাংশ মানুষ পিছিয়ে পড়ে, প্রগতির স্রোতে তাল রাখতে পারেনা, হয়তো বা অধ্যাত্মচিন্তাতেও ডুব দেয়, পরমায়ুর সেই পরম ক্ষণে এসেও তিনি সমকালের লীলাসঙ্গী, 'প্রতি পদক্ষেপে যার আপনারে জয় করে চলা'। ইতিহাসের আলোচনায়, সাহিত্যের বিচারে, সমাজ সমবায় অর্থনীতির বিশ্লেষণে, শূদ্র ও নারীর যথার্থ মূল্য নিরূপণে—সর্বত্রই তিনি বিস্ময়কর বিজ্ঞান-

দৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন। জীবননিষ্ঠ মানবতাবাদী কবি আজ চিনে নিতে ভুল করেন নি মানুষের মধ্যেকার সৎ ও সুন্দরকে, অন্যায় ও অসুন্দরকে, জেনেছেন তথ্য ও সত্যের ঘনিষ্ঠতাকে, তথাকথিত উদার মানবতা পরিহার করে নেমে এসেছেন পথের জনতায়—যেখানে সর্বহারা সর্বসাধারণের মিছিল, যেখানে অত্যাচারী লোভের বিরুদ্ধে উদ্দীপ্ত প্রতিরোধ। এবং সকলের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হতে দেখেছেন বিবর্তনকে, দেখেছেন বাধা আর ব্যথা ঠেলে-ঠেলে প্রাণের অপ্রতিরোধ অভিব্যক্তিকে। কেবলমাত্র বিশ্ব ও সমাজের বড়ো পরিসরে নয়, সংসার ও ব্যক্তির ছোটখাট পরিসরেও। উদ্ভিদ ও জীবদেহে প্রাণশক্তির যে বিচিত্র লীলা, বিশ্বপ্রকৃতির অঙ্গপ্রত্যঙ্গে বিবিধ বিধানের যে অপরূপ সৌষম্য, এবং এসম্পর্কে লব্ধ জ্ঞানকে আশ্রয় করে বিজ্ঞানের যে তত্ত্বদর্শন ও অগ্রগতি—এদের আশ্রয় করেই গড়ে উঠতে চাইছে একালের নব্য জীবনদর্শন। এই জীবনদর্শনের প্রবক্তা রবীন্দ্রনাথও। গতিবিজ্ঞান অভিব্যক্তিবাদ ইত্যাদি মিলিয়ে মৌল বক্তব্য দাঁড়ায়—নিত্য অগ্রস্থতি। তার চলার পথে বৈচিত্র্য আছে, ক্রোমোজোম আশ্রয়ী 'জীন্' পরম্পর মিলিত হয়ে নবনব রূপে নবনব দেহে লীলা করে চলে, স্থিতি গতিরই আবেক প্রকাশ, দৃশ্যমান গতির মাধ্যমে সে স্থানান্তরিত রূপান্তরিত হয়, এই চলাই সত্য, পিছুটান বা পেছনের ধাক্কা আছে বলেই শক্তি এগিয়ে যায়, মহাশূন্যে পাড়ি জমায়। এই অগ্রস্থতি তো মানবজীবনে, মানুষের ইতিহাসেও। এই দৃষ্টিকোণ থেকেই রবীন্দ্রনাথ জীবনের মধ্যে দেখেছেন প্রাণের লীলা, তার অব্যাহত অগ্রগতি, যেখানে প্রেমের ও শক্তির, সহযোগিতা ও প্রতিযোগিতার যুগ্ম সম্পাদনা। তারই ফল 'মানবপুত্র' ও 'শিশুতীর্থ' কবিতা—মানুষের লড়াই আর মানুষের অগ্রচারণের রূপক-সংকেত। এই তত্ত্বকে তিনি ইতিহাসের পটে বিধৃত করেছেন 'কালের যাত্রা' সংলাপ-নাটিকায়। বিজ্ঞান বিধির বন্ধনকে আবিষ্কার করে, তাকে অতিক্রম করার পথ বলে দেয়। যে বন্ধন নিষ্ক্রিয়, তার গতি নেই, প্রাণ নেই, যে-বন্ধন যুক্ত, সেই-ই প্রাণরঙ্গমঞ্চের কুশীলব। গতি-বিজ্ঞানের এই তত্ত্বদর্শন শিল্পরূপ পেয়েছে 'তাসের দেশ' নৃত্যনাট্যে।

বিশ্বপ্রকৃতির নিয়মের রাজ্যে প্রাণ-জগতের নিত্য অভিব্যক্তির মধ্যে সুষম সামঞ্জস্য এবং ধারাবাহিক সূত্র আবিষ্কারে বিজ্ঞান ব্রতী। তার পরীক্ষা পর্যবেক্ষণ তথ্য ও তত্ত্ব দার্শনিককে প্রভাবিত করে, কবিচিত্তকে আলোকিত

করে। সেই আলোর প্রভায় দার্শনিক ও কবি জীবনের নতুন অর্থ আবিষ্কার করেন। সেই অর্থ তথ্যের যতোটা কাছাকাছি, ততোটাই সে বিজ্ঞানের সঙ্গী। সেইসঙ্গে রূপান্তরও অবশ্যম্ভাবী—অন্তত: দর্শন ও শিল্পের ক্ষেত্রে। রবীন্দ্রসাহিত্যে বিধৃত জীবনদর্শনেও বিজ্ঞানের সংযোগ ও দার্শনিকদের রূপান্তরণ আছে। বৈজ্ঞানিক দর্শনকে তিনি উপলব্ধি করেছেন স্বগত মনোভঙ্গিতে। প্রকৃতি, উদ্ভিদ ও প্রাণীর মধ্যে যে বিবর্তন নিত্যবর্তমান, তাকে তিনি দেখেছেন মানুষের মধ্যে, তাকে অতিক্রম করে স্বতন্ত্র মানবিক অভিব্যক্তির পথেও। জেনেছেন, প্রাণের লীলা জন্ম-মৃত্যু পুনরুজ্জীবনের অবিরত বিলাসে; জেনেছেন, স্থানকালপাত্রভেদে চলার পথ ও পদ্ধতি বিভিন্ন রূপ নেয়, বাধা ও সংগ্রাম তদনুযায়ী ভিন্নতর হয়, ভূগোলের সঙ্গে ইতিহাসকে, প্রবৃত্তির সঙ্গে বৃত্তিকে সংস্কার ও সংস্কৃতিকে মিলিয়ে তুলনা করে বিচার করে দেখতে হয়। এইভাবে বিজ্ঞানের তথ্যসঙ্গত তত্ত্বকে কবি প্রযোগ করেছেন জীবনের সকল ক্ষেত্রে, সমস্ত পর্যায়ে। রবীন্দ্রনাথ বৈজ্ঞানিক নন, অপবিজ্ঞানীও নন, বিজ্ঞান-বুদ্ধি ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিসমন্বিত কবি দার্শনিক। জীবনকে মানুষকে ভালোবাসেন, বিচার করেন নিরপেক্ষ নৈর্ব্যক্তিকতার তথ্য পর্যবেক্ষণে।

রবীন্দ্রনাথ, শুধু রবীন্দ্রনাথ নয়, সাহিত্য-শিল্পের সঙ্গে বিজ্ঞানের যোগ সন্ধান করতে গেলে যান্ত্রিক পদ্ধতিতে উভয়কে মেলানো যাবে না কোনদিনই। কারণ সাহিত্য ও বিজ্ঞান দুইই নিত্য-পরিবর্তমান, বিজ্ঞানের গতি বরং দ্রুততর (আজকের সাহিত্যেরও নয় কি ?) এবং উভয়ের উপাদান আহরণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের মধ্যে সমূহ পার্থক্য আছে, যদিও বিজ্ঞানের এবং সাহিত্যেরও অপব্যাখ্যা হবার সম্ভাবনা অবিদ্যমান নয়। তবু বিজ্ঞান সমাজের শরীর বদলে দিয়েছে, হাত বাড়িয়েছে দর্শন ও শিল্পের রাজ্যেও, জ্ঞাতে বা অজ্ঞাতে, আজ নয়, অনেক আগে থেকেই। এবং বিজ্ঞানের সংগৃহীত তত্ত্ব রূপান্তরিত হয়ে দর্শনে সাহিত্য প্রবেশ করেছে, এই রূপান্তরণ এড়িয়ে যাওয়া চলে না। সাহিত্যে বিজ্ঞানের আলোছায়ার সন্ধানে এই রূপান্তরণ সম্পর্কে অবধানের প্রয়োজন আছে, বিজ্ঞানের যথার্থ রূপ পাওয়া না গেলে ফিরে আসার কোন কারণ নেই। কারণ এইভাবেই দার্শনিক-কবি বিজ্ঞানের তথ্য ও তত্ত্বকে জীবনে ও মানসে প্রযোগ করেন, পথের ওপারে পথ জেগে ওঠে, আকাশের ওপরে আকাশ দেখা দেয় তখনই।

রবীন্দ্রনাথের অপ্রকাশিত পত্রাবলী

সুধীন্দ্রনাথ দত্তকে লিখিত

(১)

"UTTARAYAN"
SANTINIKETAN, BENGAL

কল্যাণীয়েষু
কোনো ক্ষতি নেই। যখন যখন কাঁচা ছিল তখন লেখার ঝোঁকটা ছাপায় দেখতে তর সইত না — এখন সে বয়স গেছে, এখন না ছাপা হলেও মনে হয় না বিশ্বের বিশেষ ক্ষতি হবে। অতএব লেখাগুলো তোমাদের সময়মতো যদি ছাপাবার অনুমতি পাই অসামাজিক হবে না। কাব্যশক্তির সঞ্চয় রয়েছে সাধের প্রত্যাশীতে। লোকের ভিতর যেমন নেই — আমার অবকাশকালের ভিড়িং হচ্ছে বহু পায়ে চলার পথে, তবু কাঁচা মনের উঁচুর দিকে যাওয়া চলছে।

ইতি ১০।৩।৩৮

তোমাদের
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(২)

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

প্রত্যেক যুগের এক একটা বিশেষ ন্যাকামি থাকে। কিন্তু যার থেকে সেই ন্যাকামি প্রতিফলিত হয় সেই মূল ভাবের সত্যতা অস্বীকার করে লাভ কী? মরীচিকারও আদিতে আছে বাস্তব দৃশ্য। আসল কথা, দই মন্থন করে যে মাখন ওঠে সেটাকেই প্রধান বলে লক্ষ্য না করলে ঠক্‌তে হয়, বাকি সমস্তটাই ঘোল। বিশেষ যুগের মথিত বিশেষ আইডিয়াটাকে দাম দিয়ে সংগ্রহ করতে হবে—সস্তায় ঘোল খেয়ে মরুক বাকি পনেরো আনা। যাদের স্বাভাবিক সম্বল কম তারা ভদ্রতা রক্ষার চেষ্টায় নকল চালায় তারা সংখ্যায় বেশি বলেই তাদের নিয়ে কালের পরিচয় নয়। লুসিকে লক্ষ্য করে ওয়ার্ডস্বার্থ একটি কবিতা লিখবেন, তাতে মানুষের স্বভাবের উপর প্রকৃতির প্রভাব এমন ভাষায় তিনি বর্ণনা করেচেন তার সৌকুমার্য আমাকে মুগ্ধ করে আমার কানে এর যে সুর বাজে তাকে আমি খাঁটি বলেই জানি। মানুষের অন্তরে বাহিরে সুরের সঙ্গে সুরের মিলন ইংরেজী সাহিত্যে এই প্রথম সুস্পষ্ট হয়ে বেজে উঠেচে। আমার আনন্দের মধ্যে তার স্বীকৃতি জেগেছিল, আজো জাগে। কীট্‌সের কাব্যের জাদু অল্পবয়সে মনের মধ্যে সোনার কাঠি ছুঁইয়েছিল, এখনো তার মোহ আমার মন থেকে ঘোচে নি। এ যুগে শেলিকে তোমাদের ভালো লাগুক বা না লাগুক্ তার রচনায় মেকি কিছুই নেই একথা মানতেই হবে। Essays of Elia আমার কাছে essay শ্রেণীর রচনার আদর্শ বলে মনে হয়। আজ পর্য্যন্ত কেউ তার নকল করতে পারে নি, এতই "নাজুক" তার রস। জাপানীতে একটা তিন লাইনের কবিতা আছে। তাতে বলচে, জেলে তার চৌকোণা জাল ফেলল জলে, মাছ পড়ল ধরা কিন্তু তারার প্রতিবিম্ব সে তুলতে পারলেনা। শ্যাওলা ঢাকা গভীর জলের essay অনেক আছে, তার থেকে বড়ো বড়ো রুই কাৎলাও ধরা পড়ে আধুনিককালের পীবরতনু উপন্যাসের মতো—কিন্তু ল্যাম্বের essays সাহিত্যস্বর্গের রস সরোবর ওতে তারার আলোর সূক্ষ্ম হাস্যলীলা। নকলবাজেরা জাল ফেলে তা ধরতে পারলেনা। হতে পারে এখনকার মতে টেনিসন তাঁর কাব্যে মহারাণী

ভিক্টোরিয়ার সগোত্র, আন্তরিক ইংরেজী গ্রাম্যতাকে বাইরের অত্যলঙ্কারে ঝলমলিয়ে তুলেছেন, তাঁর দলবলও জুটেছিল অনেক—যেমন একদা জুটেছিল দাশুরায়ের অনুবর্ত্তী পাঁচালীর দল। কিন্তু টেনিসন বাহ্যত যতখানিই জায়গা জুড়ুন তাঁর মাপেই তাঁর কালকে মাপা চল্‌বেনা।

আমার মতে সেদিন ইংরেজী সাহিত্যে আমার মন যে অবাধ প্রবেশ লাভ করেছিল তার কারণ ছিল সেই যুগের সাহিত্যের অন্তরে। তার মধ্যে সর্ব্বজনীন আমন্ত্রণ ছিল, আতিথ্য ছিল। যেখানে আতিথ্য নেই সেখানে ঐশ্বর্যের পরিচয় নেই। ভিতরে সেখানে ভৈরবী চক্র বসে, সে কিন্তু যজ্ঞ নয়, সেখানে বাইরের লোককে রুদ্ধদ্বারের বাইরেই বসিয়ে রেখে দেয়। আমার চিঠিতে এই কথাই আমি বল্‌তে চেয়েছি।

কিন্তু তাই বলে কি কাজের কথা চাপা পড়বে? একসময় থেকে দেখচি অক্সফোর্ড বাংলা কাব্যের ঝুলির সম্বন্ধে তোমার ও প্রশান্ত উভয়েরই উৎসাহ হঠাৎ একেবারে নির্ব্বাসিত। আমিই তৎপূর্ব্বে এই গ্রন্থপ্রকাশের সঙ্কটজাল থেকে নিষ্কৃতি লাভ করতে চেয়েছি। তোমাদেরও যদি সেই দশা হয়ে থাকে তাহলে ছেড়ে দাওনা কেন—দায় যদি মানতে না চাও তবে তাকে নিরর্থক বোঝার মত সুদীর্ঘকাল বয়ে বেড়াচ্চ কী ভেবে? এই বই প্রকাশ নিয়ে আমার ভয়ের কারণ যথেষ্ট আছে, তার উপরে লজ্জার কারণ যোগ করচ কী জন্যে? ইতি ২ জানুয়ারী ১৯৩৫

তোমাদের

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(৩)

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

তোমার প্রথম কবিতার বই বের হলে কিছুদিন অপেক্ষা করেছিলেম। দেখবার কৌতূহল ছিল লোকে কী বলে। দেখলুম ভালোমন্দ কিছুই বললেনা। তাতে বিস্ময় বোধ হয়েছিল—কিন্তু এটা বুঝতে পেরেছিলুম ক্রিটিকরা যা হোক কিছু একটা বলতে ভরসা পাচ্ছিল না। সাহিত্যে নতুন রূপের

আবির্ভাব দেখলে বাঁধামতওয়ালারা সাধারণতঃ তাড়া করে আসে। কিন্তু যদি ভাল লাগে তাহলে কী বলবে ভেবে পায়না। ভালো লাগা উচিত কিনা ঠাহর করতে পারেনা। প্রথমটা তোমার ভাষার অপরিচিত দুরূহতায় গোল বাধে। কিন্তু তার ভিতর দিয়েও তোমার যে স্বকীয়ত্ব দেখা যায় তাতে বিদ্রূপ করবার অবসর পেলেও বিরুদ্ধবাণীকে থামিয়ে দেয়। তোমার শত্রুমিত্র কেউ তোমার বইখানিকে কোনো সম্ভাষণই করলেনা—অনায়াসে নিন্দা করতেও পারে নি, অনায়াসে ভালো বলতেও দ্বিধা বোধ করেছে। তোমার কাব্য এসেচে সাহিত্য ক্ষেত্রে অপরিচিত বেশে—স্পর্দ্ধিত আধুনিকতার তারস্বরও তার নয়, সাবেক আমলের মধুর সৌজন্যেরও অভাব আছে।

নিজে সমালোচনা করবার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু আমি ভীরু। পিছিয়েছিলেম তার কারণ এই, তুমি অসঙ্কোচ প্রকাশ্যে আমার কাব্যভাষা থেকে ভাষা নিয়ে ব্যবহার করেচ। পাছে কেউ ভাবে আমার সঙ্গে তোমার কাব্যগত সাম্প্রদায়িক যোগ আছে বলেই আমি তোমাকে পুরস্কৃত করচি এই আমার ভয় ছিল। বস্তুত যা তোমার নিজের কাজে লাগবে তাকে সর্ব্বজন সমক্ষেই গ্রহণ করবার সাহস তোমার ছিল, কারণ সেই সব অলঙ্কার দিয়ে তোমার কাব্যের স্বরূপ বিন্দুমাত্র আচ্ছন্ন হয় নি। যারা গ্রহণ করে অথচ স্বীকার করতে চায়না নিজেদের অধিকারিত্ব সম্বন্ধে ভিতরে ভিতরে বোধ করি তাদের সংশয় থাকে —তোমার সংশয় নেই। বাংলা সাহিত্যে তুমি যথার্থই আধুনিক কিন্তু তোমার কাব্য আধুনিকত্বের ভেক ধারণ করতে উপেক্ষা করেছে, অথচ পরিচিত কাব্যের নেপথ্যবিধানে যে উত্তরীয় তোমার পছন্দ হয়েছে সেটা সহজেই গায়ে দিয়ে সাহিত্য সভায় প্রবেশ করতে তোমার কুণ্ঠা হয়নি।

তোমার অর্কেষ্ট্রা বই সম্বন্ধে আমার অভিমত তুমি সসঙ্কোচে দাবী করেচ। দৈহিক শক্তির ক্লান্তি ও মানসিক শক্তির ম্লানতা সম্বন্ধে আমি বারবার নিজের ব্যবহারে প্রতিবাদ করি বলেই তোমরা বুঝতে পারনা বয়সটা আমার শরীর মনের উপর কী রকম বোঝা হয়ে চেপেছে। এখনো কলমটা কিছু বলতে পারে বলেই তাকে চালাতে চাওয়া নির্দ্দয়তা। শক্তির কিছু উদ্বৃত্ত নিয়েই কর্ম্ম থেকে নিবৃত্ত হওয়া শ্রেয়। একেবারে দেউলে হয়ে চিত্রগুপ্তের দরবারে গিয়ে দাঁড়ানো অশোভন।

আমার শরীরটা আজকাল প্রায়ই হরতাল করতে উদ্যত হয় মনটাও তার

সঙ্গে ষড়যন্ত্রে যোগ দিয়েছে। একদিন বিনা নোটিসে হঠাৎ কল বন্ধ করে দিয়ে বসবে। পূর্ব্বাবদ্ধ কর্ম্মে এখনো নিষ্কৃতির সম্ভাবনা নেই অথচ সে কর্ম্মে প্রতিকূলতা ছাড়া আনুকূল্যের আশা করিনে। শেষপর্যন্ত এই দায়টা একলা নিয়েই চলব—আর সব কিছু এখন নামিয়ে রেখে যাত্রা করব ঘাটের দিকে এই সংকল্প করেছি।১ ইতি ১৩ সেপ্টেম্বর ১৯৩৫

তোমাদের
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রোমাঁ রঁল্যার চিঠি

কালিদাস নাগকে লিখিত

প্রিয় মহাশয়,

রবীন্দ্রনাথের সহানুভূতি আমাকে কিরকম আনন্দ দিয়েছে তা আপনাকে বলবার আমার প্রয়োজন নেই। তাঁর সহানুভূতি প্রকাশে আমি আনন্দিত হয়েছি কারণ তিনি আমার এত প্রিয়। রবীন্দ্রনাথ যে সকল শব্দ ব্যবহার করেছেন আমি সে সকল শব্দের মাধ্যমেই তাঁর শুভেচ্ছার উত্তর দিতে ইচ্ছুক। বুদ্ধি ও হৃদয়ের দিক থেকে ইয়োরোপের কোন কবি এবং ভাবুক রবীন্দ্রনাথ অপেক্ষা আমার নিকট বেশী ঘনিষ্ঠতর নন। এর দ্বারাই প্রমাণ হয় যে ভারত ও পশ্চিমের চিন্তার মধ্যে যে কৃত্রিম ব্যবধান সৃষ্টি করা হয়েছে তা কতটা শূন্যগর্ভ। কারণ—আমি কে ? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হলে আমাকে এই কথাই বলতে হবে যে জাতি হিসাবে আমি একজন অকৃত্রিম ফরাসী, ফ্রান্সের মধ্যবর্তী মফঃস্বল অঞ্চলের ফরাসী। যে পরিবারে আমার জন্ম বহুশতাব্দী ধরে সে পরিবারের বিদেশের সঙ্গে কোন যোগাযোগ নেই। জীবনের পনর বছর অবধি নিভেয়ারের ক্ষুদ্র সহরের গণ্ডীর ভেতর আমার দিন কেটেছে এবং তার পর চিন্তাজগতে নিমগ্ন হবার পর জীবনের এই শেষ কয়বছর ছাড়া এশিয়ার সঙ্গে আমার কোন ব্যক্তিগত সম্পর্কই ছিলনা। এমনকি ইয়োরোপেরই অন্যান্য দেশের সঙ্গে আমার বিশেষ যোগাযোগ ঘটেনি।

১ শ্রীমতী রাজেশ্বরী দত্তের সৌজন্যে

কিন্তু এটা সম্ভব হয়েছে যে আমার নিঃসঙ্গ আত্মার মধ্যে অস্তিত্বের গহন থেকে উদ্ভূত এক সুগভীর সৌভ্রাতৃক মনুষ্য সত্তার স্পন্দন ধীরে ধীরে বিস্তৃত হয়ে প্রথমে জার্মানী তারপরে রাশিয়া তারপরে ভারতবর্ষ—এবং এমনকি ভারত ছাড়িয়ে দূর প্রাচ্যের আত্মার কাছাকাছি পৌঁছেচে এবং এইভাবে এই প্রাণস্পন্দনের সঙ্গীত আমাকে আচ্ছন্ন করেছে। এটা সত্যি যে এখনও পর্য্যন্ত আপনাদের ভারতবর্ষের বিশাল চিন্তাধারার সঙ্গে আমার পরিচয় স্বল্প। কিন্তু একথা আমি জোর করে বলতে পারি যে কখনই কোন মুহূর্তেই আমি বোধ করিনি যে ভারতীয় চিন্তা যতটুকু আমি অধ্যয়ন করেছি বা শিক্ষা করেছি তার সঙ্গে আমার যোগাযোগ নেই। ভারতীয় চিন্তাধারার কোন কিছুই আমার কাছে নূতন আবিষ্কার বলে মনে হয়নি, সব কিছুকেই মনে হয়েছে পুনরাবিষ্কার, এ যেন আমার নিজের ঐশ্বর্য্য যা আমি মাটীর ভেতর রেখে গিয়েছিলুম তাকেই যেন আবার নতুন ক'রে খুঁজে বার করেছি। তাছাড়া ভারতীয় চিন্তার সঙ্গে গ্রীসের ও ইয়োরোপের সর্ব্বযুগের শ্রেষ্ঠ প্রতিভাশালী চিন্তানায়কদের আত্মীয়তা আমাকে বিস্মিত করেছে। আমার কাছে এই দুয়ের মধ্যে একটি পার্থক্যই ধরা পড়েছে সেটা হচ্ছে এই যে ভারতীয় চিন্তানায়কদের মননের আন্তঃ সারবস্তু আমার কাছে গ্রীক ও ইয়োরোপীয় চিন্তানায়কদের মনন অপেক্ষা আরও ঐশ্বর্য্যশালী বলে মনে হয়েছে। তাঁদের চিন্তা আরও গভীর আরও সম্পূর্ণ আরও ব্যপক। তাঁদের মনন্ যে ভাষায় রূপ পেয়েছে তা আমার কাছে আরও দীপ্তিমান বলে মনে হয়েছে। গভীরতা, ব্যাপকতা ও দীপ্তি হচ্ছে ভারতীয় প্রতিভার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য কিন্তু তা সব সময়েই একই মানবিক চিন্তা, "আমাদের চিন্তা, এ আমি ভালো করেই জানি।"

ভবদীয়
রোমা রঁল্যা

রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশ্যে

অমিয় চক্রবর্তী

সেই পুরাতন জ্যোতি—
ধ্যানশিল্পী জানান প্রণতি।
—যস্তদ্বেদ স বেদ—
চেতনা উদয় অন্তহীন
হৃদয়ে ধরেন সমাসীন।
প্রকাশিত সূর্য কোটি লোকে,
উদ্ভাসিত দেখেন আলোকে

—সকৃৎ, উপাস্য, দৈব জ্যোতি—
কবি তাঁর জানান প্রণতি।
প্রতিদিন জাগ্রত সম্বিৎ
দেখেন সংসারে ব্রহ্মবিদ।
করুণার সৃষ্টিকাজে শেষে
এ জন্মের পারে এসে
মৃত্যুলোক পার হন প্রাণে,
—মৃত্যোরাত্মনং পরিহরানীতি—
জ্যোতির আহ্বানে
পৃথিবীতে তাঁর
এই কাব্য দীপ্তিধারণার।

রবীন্দ্র ঠাকুর

প্রেমেন্দ্র মিত্র

সব কথা স্তব্ধ হ'লে
দেখি এক পবিত্র যন্ত্রণা
সৃষ্টিমূল থেকে উৎসারিত
সময়ের শূন্যপটে
এঁকে যায় জ্বলন্ত বিস্ময়।
আনন্দাৎ এব খল্বিমানি—
জেনেও তা রক্তাক্ত সংশয়।

নিজেকে তা মাটিতেই বাঁধে,
কথা সুর ছবি হয়ে
সকলের সাথে হাসে কাঁদে।
তবু অনির্বাণ
সত্তার অতৃপ্ত প্রশ্ন বিদ্রোহের যন্ত্রণা বিধুর
উদ্‌ভ্রান্ত বিক্ষুব্ধ যুগে হয়ত কখনো
নাম নেয় রবীন্দ্র ঠাকুর।

কোটি বৎসরের বৃক্ষ

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

চারিদিকের বিষণ্ণ চিৎকারে
তোমার অনন্ত নিদ্রা, বৃক্ষ। তুমি কোটি বৎসরের
পরমায়ু নিয়ে স্থির মাটির ভেতর
আলো হও।

আমাদের স্বদেশ নরক।
উৎসবের নামে আজ গলায় কর্কশ রক্ত ওঠে,
যম করে পৌরহিত্য কবির সভায়।

সমস্ত জীবন তুমি রৌদ্র নিয়ে মাথার ওপর
মাটির গভীরে কবে চলে গেছ। কবির অভাবে,
বৃক্ষের অভাবে আমরা আজ শুধু জন্মদিন মানি,
রক্ত দিয়ে আর্তনাদ মুছি।

মাটির গভীরে, বৃক্ষ, হীরা করো জন্মের অশুচি।

তাঁর গল্প, তাঁর ছবি

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

যাদৃশী ভাবনা যস্য। আমার ভাবনাকে আমি তাঁর
গল্পেতে পেয়েছি।
গল্পেতে, অর্থাৎ এই ক্ষুধা-সাধ-সংশয়ের ঝড়ে,
গল্পেতে, অর্থাৎ এই শরীরী স্বপ্নের কণ্ঠস্বরে;
গল্পেতে, অর্থাৎ কিছু পরিচিত মানুষের চিন্তার শিকড়ে।
যাদৃশী ভাবনা যস্য। আমার ভাবনাকে আমি তাঁর
গল্পের ভিতরে পেয়ে গেছি।

(তাহলে, যদিও তাঁর মুখ ছিল ধ্বান্তারির দিকে,
তিনিও সুস্থির চিত্তে শুধে গিয়েছেন এই শতাব্দীর দেনা।
তাহলে অবশ্য ছিল রাত্রির আঁধারও তাঁর চেনা।
হয়ত দেখেননি তিনি শুধুই প্রদীপ্ত পৃথিবীকে।)

যাদৃশী ভাবনা যস্য। আমার ভাবনাকে আমি তাঁর
ছবিতে পেয়েছি।

ছবিতে, অর্থাৎ যত ভয়াবহ রেখার ভিতরে ,
ছবিতে, অর্থাৎ যত রেখায়িত যন্ত্রণার ঘরে
ছবিতে, অর্থাৎ যত নষ্ট ক্লিষ্ট অন্ধকার মুখের উপরে।
যাদৃশী ভাবনা যস্য। আমার ভাবনাকে আমি তাঁর
ছবির ভিতরে পেয়ে গেছি।

রবীন্দ্রনাথের ছবি চন্দ্রালোকে সুখী প্রেমিক

অরুণ ভট্টাচার্য

এসো রাত্রি, নির্জন নিখিলে ,—
অসংবৃত প্রেমিকের গান
ভাসাবে অকূল পারাবারে—
চন্দ্রালোকে আহত পরাণ

নিরখিয়া প্রেমিক পুরুষ
বিস্মিত ব্যাকুল বেদনায়
প্রশ্ন করে মরমী সাথীরে,
কোথা যাব মাতাল হাওয়ায় ?

এসো রাত্রি, প্রথম যৌবনে
আররির দুঃখের যন্ত্রণা,
তোমার সংকীর্ণ খেলাঘরে
আমাদের উজ্জ্বল বাসনা

জন্ম দেবে নতুন প্রেমিক,
গোপনতা মৃত্যু তথা পাপ ;
এসো রাত্রি স্তব্ধ চন্দ্রালোকে,
ফুরাবে সকলি জ্বালা, তাপ।

তুমি

অরুণকুমার সরকার

অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকি
ছিন্নবেশ পথিক যেমন রাজপ্রাসাদের দিকে।
আনন্দ আর উৎসব আর শান্তি
কত বর্ণালী আলোর উজ্জ্বল অপচয়।
মনে হয় ঈশ্বরের মতো অমিতব্যয়ী হে সুদূর,
তুমি আমার প্রণম্য,
তুমি আমার অন্তরঙ্গ নও।

কিন্তু মাঝে মাঝে তোমার জানালা দিয়ে যখন
গান ভেসে আসে
আমার প্রায়ান্ধকার ঘরে, রুগ্ন দেয়ালের বাধাকে অগ্রাহ্য ক'রে
মনে হয় তুমি আমার মনের কথা জানো
তুমি আমার আপন।

অথবা কোনো চৈত্রদিনের হাওয়ায়
যখন তোমার জানালার পর্দাগুলো উড়ে যায়
আর তোমার দেয়ালের বেদনাক্লিষ্ট মুখচ্ছবিগুলি চোখে পড়ে
তখন মনে হয় তুমি আমাকে জানো
আমি তোমাকে চিনি।

তোমার সম্বন্ধে তবুও আমি
মনস্থির ক'রে উঠতে পারিনি।

একটি রবীন্দ্রসঙ্গীতের অনুবাদ

'মনে হল পেরিয়ে এলেম অন্তবিহীন পথ'

DREAM

I dreamed I had journeyed an interminable way
to come to thy threshold from the blazing shores
of annihilation to an eternity of perennial green

I have wreathed a garland of dew kissed jesmine
whose tender fragrant offering echoes through
the air accept them, lest they wither in shame

The rain clouds cast today deep blue shadows
over the sylvan scene the breeze carries a
mournful sigh of someone lost for ever

I saw thy solitary lamp from afar, glowing serenely
beneath thy cottage window, and oh ! my eyes were like
anxious birds bewildered in the dark tempest

Translated from Bengali by Tagore Huq (for Anubha)
A lyric from "Geetabitan" Vol 2 by Rabindranath Tagore.

রবীন্দ্র সঙ্গীত

●

রাজ্যেশ্বর মিত্র

সুধীর চক্রবর্তী

প্রফুল্লকুমার দাশ

কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ বেদান্তচিন্তামনি

অপ্রকাশিত স্বরলিপি

ধ্রুপদসঙ্গীতের পূর্ণ তালিকা

●

রবীন্দ্রসঙ্গীতে ধ্রুপদ ও টপ্পা

রবীন্দ্রনাথের ওপর ভারতীয় সঙ্গীত এবং প্রাচীন বাংলার সঙ্গীত উভয়েরই বিশেষ প্রভাব পড়েছিল—অনেক ক্ষেত্রে আমাদের পরিচিত বস্তুকেই কবি নতুন করে পরিবেশন করেছেন। ভারতীয় সঙ্গীতের ক্ষেত্রে ধ্রুপদের প্রভাব তাঁর ওপর অসামান্য, বাংলা গানের ক্ষেত্রে টপ্পার প্রভাব তাঁর ওপর অপরিসীম। টপ্পা বলতে খাঁটি টপ্পাটুকুই নয়, টপ্পার নানারকম প্রকারভেদের সঙ্গেও তিনি ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত ছিলেন।

ধ্রুপদের সংগঠন বৈশিষ্ট্য এবং তার মর্যাদা রবীন্দ্রনাথকে বিশেষ আকৃষ্ট করেছে। এই কলিবিভাগ এবং গাম্ভীর্য্য তাঁর ধর্মসঙ্গীতে উৎকৃষ্টভাবে বর্তমান। স্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী এবং আভোগ—এই চারটি কলির এমন সমন্বয় রবীন্দ্রনাথের পূর্বে বাংলা গানে ছিল না এবং পরেও হয়নি। এদিক থেকে রবীন্দ্রনাথের প্রচেষ্টাই একমেবদ্বিতীয়ম্। বিশেষ করে রবীন্দ্রসঙ্গীতের সঞ্চারী একটি পরম উপভোগ্য বস্তু। প্রাক্-রবীন্দ্র যুগের গানে সঞ্চারীর প্রচলন অতি সামান্যই ছিল। রবীন্দ্রনাথ এই অভাবমোচন করলেন এবং প্রমাণ করলেন "ইমাজিনেশান" থাকলে বাংলা গানে কত উৎকৃষ্ট বৈচিত্র্য প্রকাশ করা সম্ভব। রবীন্দ্রনাথ ধ্রুপদের গঠনশিল্পই প্রধানত গ্রহণ করেছেন অর্থাৎ তার "ফর্ম"-এর দিকটা এবং এই গঠনশিল্পের সহায়তায় আমাদের ধর্মসঙ্গীতকে কাব্যসঙ্গীতের পর্য্যায়ে উন্নীত করলেন। রামপ্রসাদ সেকালকার বিবিধ গানের ফর্ম থেকে একটা নিজস্ব আকৃতি গঠন করে গেছেন। কিন্তু তিনি ছিলেন শতকরা একশ' ভাগই ভক্ত, অতএব রামপ্রসাদী একান্তভাবে তাঁর নিজস্ব ঢঙের ভক্তিসঙ্গীত। রবীন্দ্রনাথ শতকরা একশ' ভাগই কবি—যে কবির পরিচয় উপনিষদ প্রদান করেছে। অর্থাৎ বিশ্বপ্রকৃতি তাঁর কাছে এমন একটা সৌন্দর্য্য উদ্‌ঘাটিত করেছিল যে সৌন্দর্য্য রমণীয়তা অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করে। এই দৃষ্টি লাভ হলে বিশ্বচরাচরে সৌন্দর্য্যের যে নিয়তলীলা প্রবহমান তার আনন্দরস কবির অন্তরকে অভিষিক্ত করে দেয়। রবীন্দ্রনাথ সেই দৃষ্টিলাভ করেছিলেন—এই কারণেই তাঁর ধর্মসঙ্গীত, ভক্তিসঙ্গীত সবই কাব্যের মহান

সৌন্দর্য্যের রমণীয়তায় সুসমৃদ্ধ। হিন্দুস্থানী ধ্রুপদের যে গানগুলি কাব্যের বৈশিষ্ট্যকে সম্যক প্রস্ফুটিত করেছে বা যে গানগুলি থেকে তিনি সুন্দর সৃষ্টির প্রেরণা পেয়েছেন সেইগুলির সুর এবং সংগঠনকে তিনি গ্রহণ করেছেন। ধ্রুপদ তাঁর সৃষ্টির সঙ্গে ওতঃপ্রোতভাবে সংযুক্ত। এক সময় তিনি বিশেষ আগ্রহ সহকারে বহু হিন্দুস্থানি ধ্রুপদ ভেঙে বাংলা গান রচনা করেছিলেন, কিন্তু কিছুকাল পরে আর এদিকে অগ্রসর হননি কারণ যে দৃষ্টিকোন থেকে তিনি এই রচনায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন তার প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়ে গিয়েছিল—তথাপি পরবর্তীকালের বিবিধ রচনায় ধ্রুপদের গতি মাধুর্য্য বা সংগঠনকলার বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেয়েছে। "শ্রাবণের পবনে আকুল বিষন্ন সন্ধ্যায়"—তার শেষের দিকের রচনা। এটি একান্তভাবেই কাব্যসঙ্গীত কিন্তু কিন্তু এর গঠনবৈশিষ্ট্য মূলত ধ্রুপদাঙ্গীয়। এইরকম গানের আর একটি উদাহরণ রবীন্দ্রসঙ্গীতেও কমই পাওয়া যায়।

টপ্পা রবীন্দ্রনাথকে প্রভাবিত করেছিল অন্যভাবে। টপ্পার আকর্ষণ তিনি নিবিড়ভাবে অনুভব করেছিলেন তার মানবিক আবেদনের জন্য। টপ্পা আবেগপ্রধান। এর আন্দোলনযুক্ত তানের মধ্যে প্রাণের যে আকুলতা প্রকাশ পায় তা আর কিছুতেই ফোটাতে পারা যায় না। বাংলা টপ্পা চার পাঁচ লাইনে সীমাবদ্ধ কিন্তু তার ব্যাপকতা অনেকখানি। এই যে অল্পের মধ্যে অনেকখানি প্রকাশ করার আর্ট এইটিই টপ্পার বৈশিষ্ট্য। রবীন্দ্রনাথের এই রকম ছোট রচনা অনেক আছে যাতে মনোহর টপ্পার প্রয়োগশিল্পের পরিচয় পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথ টপ্পার দানাদার তানের পদ্ধতি গ্রহণ করেন নি বা বোলতানের ভঙ্গীও নয়, তিনি নিয়েছিলেন টপ্পার ছোট ছোট সুরের কাজ যাতে কাব্যের আবেদন বিচিত্রভাবে শিল্পী এবং শ্রোতার মনে প্রভাব বিস্তার করে। তিনি গ্রহণ করেছিলেন টপ্পার নমনীয়তা এবং কমনীয়তা যা কাব্যকে কাব্যসঙ্গীতে উত্তীর্ণ করে। রবীন্দ্রনাথের পূর্ববর্ত্তী বাংলা গান টপ্পার রসে অভিষিক্ত। প্রণয় সঙ্গীত থেকে ভক্তিরসাত্মক গান—সব দিকেই টপ্পার প্রয়োগপদ্ধতির নানা বিকাশ ঘটেছে। আড়-খেমটা জাতীয় গান এর অন্যতম। এই শ্রেণীর গান বিবিধ নাট্যরসে সমৃদ্ধ অর্থাৎ প্রণয়, হর্ষ, বেদনা প্রভৃতি নানারূপ মনোভাবের প্রকাশ এই আড়-খেমটায় প্রকাশ করা সম্ভব হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ এই আড়-খেমটা চালে বহু গান রচনা করেছেন।

তাঁর প্রথম যুগের রচনায় এই ধরণের গান প্রচুর পাওয়া যায়। স্বরলিপি গীতিমালায় এই জাতীয় বহু গানের স্বরলিপি প্রকাশ করেছিলেন তাঁর অগ্রজ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ। এর পরেও বহু গানে এই পদ্ধতির প্রকাশ ঘটেছে। প্রায়শ্চিত্ত নাটকের গানগুলির মত মনোহর টপ্পা জাতীয় গান বাংলায় আর নেই। তাঁর শেষ জীবনের রচনাতেও টপ্পার প্রয়োগ প্রায়ই লক্ষ্যগোচর হয়। নৃত্যনাট্যগুলিতে বিক্ষিপ্তভাবে টপ্পার বিবিধ রূপ ফুটে উঠেছে। তাঁর ভক্তিরসাত্মক বা ব্রহ্মসঙ্গীতেও টপ্পার প্রয়োগ অল্প নয়। রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে গান শোনবার সৌভাগ্য যাঁদের হয়েছে তাঁরাও জানেন তাঁর গলায় টপ্পার সুমিষ্ট কাজগুলি কী মধুরভাবে ফুটে উঠত।

রবীন্দ্রসঙ্গীতের মূল দুটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ধ্রুপদ এবং টপ্পা। একটি আর একটির ভাবসাম্য রক্ষা করেছে। দুটির কোনটিই তিনি ওস্তাদি ঢঙে গ্রহণ করেননি বলে দুটির প্রকৃতির মনোহর দিক তাঁর সঙ্গীতে প্রকাশ পেয়েছে—কেউ তার স্বত্ব দিয়ে তার গানকে পুরোপুরি দখল করে বসে নি। এই কারণে রবীন্দ্রসঙ্গীতে এমন একটি সম্ভ্রম এবং মর্যাদা রয়েছে যা সুরকারের ব্যক্তিত্বে সমুজ্জ্বল অথচ ধ্রুপদ এবং টপ্পার মহিমা তাতে এতটুকু ক্ষুণ্ণ হয়নি।

রাজ্যেশ্বর মিত্র

চিত্রপ্রেরণাজাত সঙ্গীত ও রবীন্দ্রনাথ

১

শিল্পীর মন শিল্পের জনয়িতা। কিন্তু সেই মনকে শিল্পসৃজনে উদ্বুদ্ধ করে নানা ঘটনা, দৃশ্য এবং পুঞ্জিত স্মৃতি। শিল্পীর মনে প্রেরণাসঞ্চারের প্রত্যক্ষ উপাদান হিসাবে ঈশ্বর, প্রকৃতি ও মানবতার শুদ্ধ অনুভবকে গ্রহণ করা হয়। কিন্তু পরোক্ষপ্রেরণারও একটি সক্রিয় ভূমিকা স্বীকৃত হয়ে থাকে। ভাস্কর্য, চিত্র ও সংগীতের প্রেরণাকে পরোক্ষ প্রেরণা বলা চলে। মূলত বিভিন্ন সুকুমারশিল্পের মধ্যে অন্তর্লীন এমন অনেক ঘনিষ্ঠতার সূত্র খুঁজে পাওয়া যায়, যার মাধ্যমে শিল্পক্ষেত্রে পরোক্ষপ্রেরণার ভূমিকা স্বীকৃতি পেয়েছে। অবশ্য সাহিত্যেই অন্যান্য বিভিন্ন শিল্পের ছায়াসন্নিপাত দৃসবচেয়ে দৃষ্টিগোচর।

সংগীতের ক্ষেত্রেও পরোক্ষ প্রেরণা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সংগীত দুরকমের—বাণীময় এবং সুরময়। প্রথমটিকে বলে vernacular music, দ্বিতীয়টিকে বলে pure music। এই উভয়ক্ষেত্রেই অর্থাৎ সংগীতের বাণীশ্লোক রচনা ও সুরসৃষ্টিতে, পরোক্ষপ্রেরণা থাকে। আসলে, সংগীতের সঙ্গে সবসময়েই যোগাযোগ থাকে সাহিত্য ও সমকালীন জীবনের। সংগীতকারের ব্যক্তিমনের উপর থাকে সামাজিক প্রভাব, তাছাড়াও তাঁর স্বকীয় মানসবেদনা সংগীতের নিগূঢ় প্রান্তরে নিজেকে ব্যক্ত করে। নানা পরোক্ষপ্রেরণা তাঁকে উদ্বুদ্ধ করে এবং তারই অনুষঙ্গে আমাদের মনে সঞ্চারিত হয় বিচিত্র উদ্বেলতা। একথা ভেবেই হয়ত সেসিল গ্রে মন্তব্য করেছিলেন—Indeed, it is probably not an exaggeration to say that at least three quarters of the world's greatest music has connection with something outside of itself, some extraneous implication whether literary pictorial, illustrative, psychological or anything else you like to call it সংগীতে বিভিন্ন পরোক্ষ প্রেরণার মধ্যে, আমার মনে হয়, চিত্র-প্রেরণার একটি মৌলিক ভূমিকা আছে। চিত্রের ধর্ম অবশ্য আপাতদৃষ্টিতে সংগীতের চেয়ে স্বতন্ত্র। কেননা চিত্রের ঋজুরেখা আর রূপবর্ণের সঙ্গে সংগীতের অরূপ ভাবপ্রবাহের কোন যোগ নেই। কিন্তু একটু গূঢ় দৃষ্টিতে বিচার করলে দেখা যায়, সংগীতে ও চিত্রে বিরোধ নেই। বরং চিত্র সংগীতকে প্রাণবন্ত করতে পারে, সংগীতসৃষ্টির প্রেরণা হতে পারে।

সংগীতকে অনেকে 'সুরময় কবিতা' বলেন। রবীন্দ্রসংগীত এ প্রসঙ্গে সর্বশ্রেষ্ঠ উদাহরণ। কবিতার সঙ্গে সংগীতের যেমন আত্মীয়তা, কবিতার সঙ্গে চিত্রের তেমনি সহমর্মিতার কথা অনেকে উল্লেখ করেছেন। এ প্রসঙ্গে জনৈক Simonides পাঁচশ খৃষ্টপূর্বাব্দে বলেছিলেন—'কবিতা একটি মুখরচিত্র, চিত্র একটি নীরব কবিতা'। প্রতিধ্বনি করে বিখ্যাত Horace তাঁর ut pictura poesis নামক তত্ত্বটি প্রকাশ করেন, যার প্রথমেই তিনি লিখেছিলেন—কবিতা এক চিত্রপ্রতিম শিল্প। এরপর থেকে চিত্র ও কবিতার ক্ষেত্রে অনেক ভাবান্দোলন হয়েছে। কারুর কারুর কবিতা এই দুইশিল্পের যুগল-সম্মিলনের প্রতিবাদ, আবার এমন অনেক কবি আছেন যাঁদের কবিতা এই দুইশিল্পের যোগপন্থের নিরুপম মূর্তি। অষ্টাদশ শতকে Lessing এই দুই শিল্পের প্রকৃতিবিরুদ্ধতা নির্দেশ করেছিলেন। তাঁর মতে, চিত্রের কাজ বস্তুর

সঙ্গে বস্তুর সম্পর্ক নির্ণয় এবং কবিতার কাজ বিভিন্ন ঘটনার মধ্যে ঐক্য আবিষ্কার। অথচ তাত্ত্বিকরা যখন এই সব বিশ্লেষণে ব্যস্ত, ঠিক তারই পরবর্তী শতকে ইংলণ্ডের কাব্যক্ষেত্রে প্রি-র‍্যাফেলাইট কবিতা আন্দোলন সুরু হয়েছে। সুইনবার্ণ ও ডি, জি, রসেটির মত কবি তাঁদের কবিতায় চিত্রধর্ম সন্নিবেশের পরীক্ষা করছেন। ১৮৪৮-৫০ সালে এই প্রি-র‍্যাফেলাইট কবিরা কবিতা ও চিত্রের পারস্পরিক সম্মেলনের সৌন্দর্য আবিষ্কারে মগ্ন ছিলেন। চিত্রের প্রেরণা ও কবিতার মধ্যে চিত্রকর্ম, এই দুটি দিকই তাঁর কাব্যরচনায় প্রধান মনে করতেন। সেই জন্যই তাঁদের সৃজনমহিমায়, কবিতা চিত্রে এবং চিত্র কবিতায় পরিণত হল ('poetry became painting and painting became poetry')। কবিতা-আন্দোলন হিসেবে প্রি র‍্যাফেলাইট ভাবধারা যদিও পরবর্তীকালে অনুসৃত হয়নি কিন্তু উত্তরকালের কবি-শিল্পীদের মনে তার শ্রদ্ধেয় স্মৃতি আজো অম্লান।

কবিতা ও চিত্রের এইসব বিবাহসংবাদ আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বরণীয় হলেও বাংলাদেশে এ প্রসঙ্গে যে কোন আলোচনাই অনেকের পক্ষে স্বাদু হবেনা। কিন্তু রবীন্দ্রনাথকে অবলম্বন করে আমরা এই ভাবপ্রসঙ্গে যোগ দিতে পারি অকুণ্ঠ মহিমায়। কেননা 'ঘরের মধ্যে চিরপ্রবাসী' রবীন্দ্রনাথ, তাঁর শিল্পকর্মের মাধ্যমে বাংলাসাহিত্যকে এমন আন্তর্জাতিক গুরুত্ব ও সংরাগ দিয়ে গেছেন যার সাহায্যে আমরা তাঁর অলোকসামান্য প্রতিভাকে বুঝতে পারি। রবীন্দ্রনাথ নিজে চিত্রশিল্পী ছিলেন। তাঁর অপ্রকাশ্য অগোচর গভীররাতের স্বপ্নের সান্দ্র আবেগ তাঁর আঁকা ছবিগুলিতে রূপ নিয়েছে। তাঁর আলেখ্যসদৃশ কবিতার অভাব নেই। মহুয়া পর্বের কবিতাগুলিতে স্পষ্টতই তাঁর রূপাচ্ছন্ন কবিমনের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। সবচেয়ে রোমাঞ্চকর তথ্য এই যে, তিনিও প্রি-র‍্যাফেলাইট কবিদের মত, চিত্রের প্রেরণায় কবিতা লিখেছেন। শেষ জীবনে, ১৩৪০ সালের শ্রাবণ মাসে প্রকাশিত হয়েছিল তাঁর 'বিচিত্রিতা' কাব্য। এ কাব্য চিত্রিত এবং সেই কারণে আবহমান রবীন্দ্রকাব্যে বিচিত্রও বটে। এই কাব্যের বিচিত্র কবিতাগুলি বিশিষ্ট কয়েকটি চিত্রের প্রেরণায় রচিত। গগনেন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলাল, সুরেন কর, সুনয়নী দেবী প্রভৃতির আঁকা একত্রিশটি চিত্র অবলম্বনে বিচিত্রতার একত্রিশটি কবিতা রচিত। বিচিত্রিতার কয়েকটি কবিতা রবীন্দ্রনাথ নিজের আঁকা চিত্রের প্রেরণাতেও

লিখেছিলেন। বাংলাকাব্যের ইতিহাসে এই কাব্য রবীন্দ্রনাথের মনে পরোক্ষ প্রেরণার উজ্জ্বল উদাহরণ। বাংলাদেশে কবিতা ও চিত্রেব আপাতবিরোধী সমন্বয়ে তিনিই প্রথম পুরোহিত। সৌভাগ্যত তার এই মেলবন্ধনের প্রয়াস একমাত্র কবিতার ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ নেই সংগীত সৃজনেও প্রসারিত হয়েছে।

আধুনিক পৃথিবীতে কবিতার ক্ষেত্রে চিত্রের প্রেরণা ও প্রভাবেব কথা সকলেই স্বীকার করেন। কিন্তু সংগীত রচনায় চিত্রপ্রেবণা সঞ্চারেব তথ্য সর্বাধুনিক। সংগীত-সমালোচক Michael Ayrton তাঁর Music inspired by Painting প্রবন্ধে জানিয়েছেন: The nonmusical aspect of the composer's inspiration apparent in programme music, composed on specific subjects has led many composers to pay passing tribute to the other arts The romantic trend towards programmic music in the early nineteenth century provoked a spate of orchestral music directly resulting from emotions derived both from painting and literature Litera ture naturally played the largest part In lesser degree painting played its part in the creation of the romantic movement. There is indeed a considerable quantity of Liszt's work, directly derived from the visual arts Inspired by Michelangels, Liszt composed 'Il Pen Seroso' and, after seeing a Raphael at Milan, he wrote his equally celebrated 'sposalizio'

ফ্রানৎজ লিজ্‌ট (১৮১১-১৮৮৬) উনিশশতকেব একজন অসামান্য সুবকার। জাতে হাঙ্গেরিয়ান। তাঁর দুটি সংগীতরচনার সৃষ্টি-উৎসেব যে রোমাঞ্চকর তথ্য পাওয়া গেল তাকে বিশ্লেষণ করলে আমরা দুটি সিদ্ধান্ত করতে পারি। প্রথমত, মাইকেল এঞ্জেলো এবং রাফ্যায়েলেব ঐ ছবি দুটি না দেখলে লিজ্‌ট হয়ত কোনদিনই II Pen Seroso এবং Sposalizio-র মত পৃথিবীখ্যাত সুরসৃষ্টি করতেন না। অর্থাৎ এ-সৃষ্টি সম্পূর্ণতই চিত্রপ্রেরণা নির্ভর। দ্বিতীয়ত এই বর্ণনা থেকে জানতে পারি উনিশশতকের পাশ্চাত্য সংগীতকে চিত্র কী গভীর পূর্ণতা দিয়েছিল। বস্তুত, উনিশশতকের আগে পাশ্চাত্যসংগীতে কোন literary motif ছিলনা। সংগীতকে পূর্ববর্তী শিল্পীরা সংগীত হিসেবেই দেখতেন। অলংকারের বর্ণসম্পাতে তাকে ব্যঞ্জনাময় ও আকর্ষণীয় করতেন

না। সেজন্যই বাক্, হ্যাণ্ডেল, মোৎসার্ট প্রভৃতির রচনায় শুদ্ধধ্বনিমগ্নতাই আমরা পাই। এই সময়কার সংগীত ধর্মকেন্দ্রিক ও আভিজাত্যপূর্ণ। তারপর অষ্টাদশশতকের উপান্ত থেকেই বেতোভেনের শিল্পসাধনার সূত্রে আমরা সংগীতে ব্যক্তিমনের উন্মাদনা পেলাম। তাঁর পরবর্তী ফ্রানৎজ স্যুবার্ট সংগীতকে সাহিত্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত ক'রে গেলেন গ্যেটে, শিলার প্রভৃতি কবির লেখা অসংখ্য কবিতায় সুর সংযোগ করে। ঠিক এই সময়েই জার্মান রোমান্টিক সাহিত্যের উদ্ভব-পর্ব। সেই নববিকশিত পেলবতার পটভূমিতে দাঁড়িয়ে পাশ্চাত্ত্যসংগীতকে চিত্র, কবিতা, প্রভৃতি সুকুমারশিল্পের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতর করলেন রবার্ট স্যুমান, ফ্রানৎজ্ লিজ্ট, রিচার্ড ভাগনার প্রভৃতি শিল্পী। এইসময় থেকেই চিত্রপ্রেরণাজাত অনেক সংগীতের সংবাদ মিলছে। ফ্রানৎজ লিজ্টের অনেক বিখ্যাত রচনাই চিত্রপ্রেরণাজাত। ইতিপূর্বে উল্লিখিত রচনাদুটি ছাড়াও তাঁর আরও দুটি বিখ্যাত রচনা আপাতত উল্লেখযোগ্য। বার্লিনে Kaulbach এর একটি ছবি দেখে সৃষ্টি করেছিলেন the slaughter of the Huns এবং পিসায় orcagna-র বিখ্যাত ফ্রেসকো দেখে তার প্রেরণায় রচনা করেছিলেন The dance of death। উনিশশতকের মাধ্যমিক পর্যায়ে ফরাসী শিল্পক্ষেত্রেও ঘটলো নতুন আন্দোলন। এই আন্দোলনের প্রধান কথাটি ছিল—'All arts constantly aspire to the conditions of music'। এই বাণীকে অবলম্বন ক'রে ফরাসী symbolist কবিরা এবং Impressionist চিত্রকররা শিল্পসৃজনে উদ্বুদ্ধ হলেন। এইসব কবি ও শিল্পীদের ঘনিষ্ঠবান্ধব সুরকার ক্লদ দেব্যুসি (১৮৬২-১৯১৮) তাঁর সুরসৃষ্টিতে চিত্রপ্রেরণা ও সাহিত্যবোধের চরম পরিচয় দিলেন। তার চমৎকার উদাহরণ মিলছে দেব্যুসির বিখ্যাত রচনা La Damaizelle elue তে। এই সুরটি রচিত হয়েছিল প্রি-র‍্যাফেলাইট কবি ডি. জি রসেটির The Blessed Damozel নামক সুন্দর কবিতাটি অবলম্বনে। রসেটি কবিতাটি লিখেছিলেন একটি চিত্রের প্রেরণায়। সুতরাং চিত্রপ্রেরণাজাত একটি কবিতা দেব্যুসির মাধ্যমে সংগীতে পরিণত হ'ল। এই পরিণতি শিল্পক্ষেত্রের ঘনিষ্ঠ মিলনসম্ভাবনার প্রতীক। দেব্যুসি রচিত চিত্রপ্রেরণাজাত সংগীতের অন্য আরেকটি উদাহরণ La Primavera। এ সংগীতটি বত্তিচেল্লীর একটি ছবির প্রেরণায় সৃষ্ট। পাশ্চাত্ত্য সংগীতের ক্ষেত্রে চিত্রপ্রেরণার গুরুত্ব নির্ণয়ের জন্য আরও

অনেক উদাহরণ দেওয়া চলে, তবে আপাতত বোধহয় ঐ প্রসঙ্গে একটি তথ্যপঞ্জী না দিলেও আমাদের বক্তব্য প্রতিষ্ঠিত করতে অসুবিধে নেই।

২

সংগীতে চিত্রপ্রেরণাপ্রসঙ্গ য়ুরোপখণ্ডে প্রবল। কিন্তু ভারতীয় রাগসংগীত পাশ্চাত্ত্য ক্লাসিক্যাল সংগীতের মতই শুদ্ধ সুরময় হলেও চিত্রপ্রেরণার কথা সহজে ভাবা যায় না। ভারতীয় মার্গসংগীতের ধ্রুবপ্রবাহ অনেক শতাব্দী থেকে প্রবহমান। তার সনাতন রাগমার্গে চিত্রপ্রেরণাজাত য়ুরোপীয় সংগীতের মত পরিবর্তনের আভাস ও রোমান্টিকতার চিহ্ন অনুপস্থিত। পবিত্র দেবতার মত ভারতীয় রাগসমূহের শুদ্ধ স্বরগ্রাম বংশানুক্রমে পূজিত হচ্ছে। মার্গ-সংগীতের শুদ্ধান্তঃপুর সামাজিক বিবর্তনে অল্পই কম্পিত। শাস্ত্রীয় পরিমণ্ডল, ঘরানার নিয়মনিষ্ঠা এখনও মার্গসংগীতের শিল্পীর আচরণীয়। কাজেই পাশ্চাত্যসংগীতের মত অমন চিত্তাকর্ষক প্রগতি, বিশেষত চিত্র-আন্দোলনের সঙ্গে সম্পৃক্ত সংগীত প্রয়াস, ভারতীয় সংগীতে অভাবিত এবং অসম্ভব। কিন্তু রাগসংগীতের প্রকৃষ্ট আলোচনাকালে চিত্রসংযোগের পরিচয় ফুটে ওঠে। কেননা ভারতীয় সংগীতের মূলাধার রাগগুলি গ'ড়ে উঠেছে রূপকল্পনার সহায়তায়। ফলত, রাগ ও রূপের সমন্বয়ী লীলা ভারতীয় সংগীতে প্রযুক্ত। রূপের মাধ্যমে অরূপের ব্যঞ্জনাসৃষ্টির একান্ত ভারতীয় প্রয়াস এখানেও শোভন-তার সঙ্গে সংযুক্ত। ভারতীয় রাগরাগিণীগুলির মধ্যে অনেক ক'টির অন্তরালে এক একটি রূপচিত্রের কল্পনা করা হয়েছে। এই অভিনব পরিকল্পনায় ভৈরবের রাগরূপ পিনাকীর চিত্র, টোড়ির রাগরূপ বীণাপানি নায়িকার চারিপাশে সুরাহৃত হরিণের দল; ভোরের বিভাস রাগিণীর রূপচিত্রে রতিক্লান্তা নায়িকার ছবি ইত্যাদি। এইসব রূপ-চিত্র কল্পনার পূর্ব-ইতিহাসটি অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক। এই রাগরাগিণী কণ্ঠে রূপান্বিত করবার সময় গায়কের মানসনেত্রে ফুটে উঠবে বসন্তরাসের উতরোল রূপচিত্র; আর অমনি প্রমত্ত পঞ্চমে গায়কের কণ্ঠোল্লাস ধ্বনিত হয়ে উঠবে। কিংবা ধরা যাক মল্লারের প্রসঙ্গ। মল্লারের রূপচিত্র বর্ণনায় মূল সংস্কৃতশ্লোকে আছে:

গৌরী কৃশা কোকিলকণ্ঠনাদা

গীতচ্ছলেনাত্মপতিং স্মরন্তী

আদায় বীণাং মলিনা রুদন্তী
মল্লারিকা যৌবনদূনচিত্তা।

মল্লার-রূপায়নের সময় এই গৌরীরূপা বিরহিনী যুবতীর কথা মনে ক'রে গায়কের কণ্ঠে করুণ মীড়ের হাহাকার ফুটে উঠবে। চিত্রপ্রেরণার মাধ্যমে সংগীতে অনুরক্ত চিত্তসঞ্চারে এই প্রয়াস ভারতবর্ষেই একমাত্র প্রচলিত। যার উদ্দেশ্য প্রসঙ্গে ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় সঙ্গতভাবেই মন্তব্য করেছেন: The Indian musician, if he is worth anything is constantly trying to bring up the image and unfold it before the vision of the sympathetic listener It is a double process, invocation and evocation.

কয়েকবছর আগে ভারতভ্রমণরত পাশ্চাত্য সংগীতবিদ্ পার্সি ব্রাউন এই বিচিত্র ভারতীয় গীতপদ্ধতিকে visualized music নামে অভিহিত করেছেন। তাঁর মতে এই বিচিত্র সংগীতরীতি উদ্ভব পশ্চিম ভারতীয়। অবশ্য জানা যায়নি এই রীতি মূলত ভারতীয় অথবা পারস্য থেকে আগত কিনা। তবে 'The Indian tendency is to visualize abstract things and it is quite possible that it was Indian in origin'-এই মন্তব্যটি গুরুত্বপূর্ণ।

রাগরূপগুলির বিভিন্ন চিত্রে হিন্দুদেবতার কল্পনা লক্ষ্য করা যায়। সেই অর্থে রাগরূপগুলির ভারতীয়তা দাবী করা অসঙ্গত নয়। কিন্তু অধিকাংশ রূপচিত্রই নায়ক-নায়িকার প্রেমবিলাসের পটভূমিকায় কল্পিত। বিলাস, বিভ্রম, রূপমত্ত কামাতুরতার সমাজচিত্রও প্রকারান্তরে রাগরূপের মাধ্যমে পরিস্ফুট।

রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় রাগসঙ্গীত চর্চা করেছিলেন। অনেক রবীন্দ্রসংগীতের রাগাশ্রয়ী সুরে একথার প্রমাণ মেলে। রাগসঙ্গীতে কৃতবিদ্য ছিলেন বলেই এমন মনে করা অন্যায় নয় যে, তিনি রাগ ও রূপের উল্লিখিত বিস্তার সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। কিন্তু রবীন্দ্রসংগীতে রাগাশ্রয় থাকলেও রাগানুবর্তী রূপ নেই। অর্থাৎ এক একটি রাগের অন্তঃস্থ রূপচিত্রটিকে তিনি যেন পরিবর্তিত করেছেন। এর প্রমাণস্বরূপ একটি উদাহরণ উপস্থিত করব। রবীন্দ্রনাথের গানে রাধিকার ভাব কিন্তু সহজেই অনুভব করা যায়। সখী আর সজনীর কথা বারবার উচ্চারণ করে রবীন্দ্রনাথের গানের নায়িকা আমাদের রাধিকার কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। বিদ্যাপতির 'এ ভরা বাদর মাহ ভাদর' গানটি

রবীন্দ্রনাথের বিশেষ প্রিয় ছিল। এ গানে মল্লার সুর বসিয়ে তিনি কতবার গেয়েছেন। কবিতাতেও এসেছে বিদ্যাপতি রচিত সেই ভরাভাদর গানের প্রসঙ্গ। সেইজন্য বর্ষার বারিধারার সঙ্গে অনুষঙ্গিনী রাধার রূপচিত্রটি তাঁর মনে চিরমুদ্রিত ছিল। তাই রবীন্দ্রনাথের অনেক বর্ষার গানে মল্লার সুর প্রযুক্ত থাকলেও তদনুষঙ্গে 'যৌবনমূনচিন্তা' মল্লারিকার রূপাভাস গায়ক ও শ্রোতা কারো মনে জাগে না। বরং ফুটে ওঠে রাধার বিরহিণী রূপচিত্র। অর্থাৎ মল্লার সুরও বাণীলোকে সন্নিবেশিত হয়ে তার সহজাত রূপ পরিবর্তন ক'রে আরেক নায়িকার রূপানুবর্তী হয়েছে। এখানেই সুরের উপর বাণীর বিজয়, মার্গসঙ্গীতের ধ্রুবমার্গে প্রগতির চিহ্ন এবং কবিতা ও গানের আত্মীয়-বন্ধন। নিরবয়ব রাগসঙ্গীত শুধু সন্নিবেশের গুণেই সুস্পষ্ট অবয়ব লাভ করেছে। বিভিন্ন প্রাদেশিক সংগীতধারায় এভাবে সন্নিবিষ্ট হয়ে রাগসঙ্গীত বিতত হয়েছে। মল্লারিকার একান্ত বেদনার সুর রাধিকার বিশ্ববেদনার সুরে পরিব্যাপ্ত হয়েছে। খণ্ড আর্তি সঞ্চারিত হয়েছে বিপুল আর্তিতে।

৩

রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাব্যজীবনের প্রাথমিক পর্বে একটি কাব্যের নাম দিয়েছিলেন 'ছবি ও গান'। এই নামকরণ আকস্মিক নয়। তাঁর সমগ্র কাব্যজীবনকেই এই নামে চিহ্নিত করা চলে। চিত্ররেখার বর্ণমায়া ও সংগীতের ভাবলাবণ্যসন্ধান তাঁর কবিচিত্তের চিরন্তন অন্বিষ্ট। সেই রেখা ও ভাবের অনুষঙ্গে তাঁর কবিতা এমন অভিনবতা পেয়েছে যা তাঁকে মহান কবি হিসাবে বিশ্ববরেণ্য করেছে। কবি ম্যাথু আর্নল্ড তাঁর একটি দীর্ঘ কবিতায় (Epilogue to Lessing's Laocoon) এক শাশ্বতসমস্যা উত্থাপন করেছেন। তাঁর প্রশ্ন, জগতে অনেক শ্রেষ্ঠ চিত্রকর কিংবা সংগীতকার আছেন কিন্তু শ্রেষ্ঠ কবির সংখ্যা এত কম কেন? অর্থাৎ চিত্রকর এবং সংগীতকারের শিল্পসিদ্ধি, কবির শিল্পসিদ্ধির তুলনায় সহজতর কেন? উত্তরে তিনি জানাচ্ছেন, চিত্রকর ও সংগীতকারের জগৎ সীমায়ত, সংক্ষিপ্ত এবং তাৎক্ষণিক মুহূর্তে খণ্ডিত—

> In outward semblance he must give
> A moment's life of things that live;

Then let him choose his moment well,
With power divine its story tell!

কিন্তু এর পাশাপাশি কবির জগৎ বড় বিস্তৃত। তাঁকে সীমায়ত বস্তুর ব্যাখ্যা করতে হয়। তাঁর হাতে রঙও নেই, সুরও নেই। আছে শব্দ। যে শব্দকে তাঁর অনুভূতির সুযোগ্য বাহন করতে হয়। এবং তারপরেও তাঁর পরম কাজটি বাকি থাকে। কেননা—

But, ah, then comes his sorest spell
Of toil! he must life's *movement* tell!
The thread which binds it all in one,
And not its separate parts alone!

কবিতারচনার এই কঠিন সমস্যা রবীন্দ্রনাথ উত্তীর্ণ হ'তে পেরেছিলেন এবং রবীন্দ্রসংগীতগুলি যেহেতু তাঁর শ্রেষ্ঠ-কবিতার গুণসম্পন্ন অতএব রসোত্তীর্ণ।

সুতরাং দেখা গেল ছবি ও গানের ভাবসম্মিলনই ছিল রবীন্দ্রনাথের কাব্য-সাধনার অন্যতম সুর। তাঁর চিত্রপ্রেরণাজাত সংগীতগুলি এ প্রসঙ্গে বিশিষ্ট উদাহরণস্থল। কেননা ঐ গানগুলি যেহেতু চিত্রপ্রেরণায় রচিত আবার শ্রেষ্ঠ কবিত্বে মণ্ডিত অতএব তার শিল্পসৌকুমার্যে কবিতা, চিত্র ও সংগীতের ত্রিধাসংযোগ ঘটেছে। 'ছবি ও গান' থেকে একটি কবিতা উদ্ধৃত করছি।

ওই জানালার কাছে বসে আছে করতলে রাখি মাথা—
তার কোলে ফুল পড়ে রয়েছে সে যে ভুলে গেছে মালা গাঁথা।
শুধু ঝুরু ঝুরু বায়ু বহে যায় তার কানে কানে কী যে কহে যায়—
তাই আধো শুয়ে আধো বসিয়ে ভাবিতেছে কত কথা।
চোখের উপরে মেঘ ভেসে যায়, উড়ে উড়ে যায় পাখি—
সারাদিন ধ'রে বকুলের ফুল ঝ'রে পড়ে থাকি থাকি।
মধুর আলস, মধুর আবেশ মধুর মুখের হাসিটি—
মধুর স্বপনে প্রাণের মাঝারে বাজিছে মধুর বাঁশিটি।

আলেখ্যপ্রতিম এই কবিতাটি কার প্রেরণায় লেখা? কোন্ চিত্র দেখে? তার উত্তর মেলে না। এই কবিতাটি রচনার কিছুদিন পরে রবীন্দ্রনাথ এটিকে সুরসংযোগ ক'রে সংগীতে পরিণত করেছিলেন। তাই একে চিত্রপ্রেরণাজাত সংগীত বলতে বাধা নেই; যদিও গানটির প্রেরণামূলে স্থানকালপাত্রের পরিচয় হারিয়েছে। অবশ্য তাই ব'লে বাতায়নবর্তিনীর সজীব প্রেরণাকে ভুললে

চলবে না। কেননা সারা গানটিতে তার অপরোক্ষ অস্তিত্ব ও বিশিষ্ট বিদ্য-মানতার নিপুণ বর্ণনা রয়েছে।

এ যেমন আলেখ্যসদৃশ সংগীতরচনা তেমনই আরেকটি সংগীতে পাই গান দিযে আলেখ্যরচনা। বীথিকা-কাব্যেব অন্তর্গত সেই গানটি হল—

একলা বসে হের তোমাব ছবি
এঁকেছি আজ বাসন্তী বং দিয়া।

এই প্রবন্ধেব বিচক্ষণ পাঠক প্রশ্ন তুলতে পাবেন পূর্ববর্তী পরিচ্ছেদ দুটির প্রধান বক্তব্যগুলিব সঙ্গে রবীন্দ্রনাথেব কোন সম্পর্ক আছে কিনা। অর্থাৎ পাশ্চাত্ত্যসংগীতের মত বিশিষ্ট চিত্রপ্রেরণাজাত সংগীত কি ববীন্দ্রনাথ বচনা কবেছিলেন? বলা বাহুল্য, তাঁব চিত্রপ্রেরণাজাত সংগীত আছে। না থাকলে ববীন্দ্রনাথের কবি মনীষায পূর্ব-পশ্চিমেব মাল্যবন্ধনের স্মবণীয় সত্তার আমবা পেতাম না। তাঁর অন্তত দুটি গানেব পশ্চাৎপটে চিত্রপ্রেরণাব কথা সুবিদিত। শিল্পী অসিতকুমাব হালদাবের দুটি চিত্র দেখে রবীন্দ্রনাথ দুটি গান বচনার প্রেবণা পেযেছিলেন। গান দুটি হল—'অগ্নিবীণা বাজাও তুমি কেমন কবে' এবং 'একলা ব'সে একে একে অন্যমনে'। গান দুটি যাঁরাই শুনেছেন তাঁবাই জানেন সংগীতকাবেব ভাবচেতনা কীভাবে চিত্রেব রূপবেখা-বর্ণেব সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম ক'রে অনুভূতিব নিরবয়ব সুবময়তায পরিণতি পেয়েছে।

ববীন্দ্রনাথ তাঁব শিল্পীমনেব বিচিত্র খেয়ালখুশিতে মেতে অনেক সময়ই কবিতাতে সুরাবোপ ক'রে সংগীতরূপ দিতেন। কবিতাব সাংগীতিক রূপান্তরের এই মোহমায়া তাঁকে এমন অধিকাব করেছিল যে, পঞ্চাশটিরও বেশি কবিতা এমনি গানেব সাজ পরেছে। এই পঞ্চাশটি কবিতাব মধ্যে দুটি আবার মূলত ছিল চিত্রপ্রেবণাজাত। পরে সুবসংযোগের সেতুবন্ধে এ দুটি গানের তালিকায় যুক্ত হওয়ার ফলে তাদের চিত্রপ্রেরণাজাত সংগীতের সমভূমিতে স্থাপন করতে পারি। এ প্রসঙ্গে প্রথমেই উল্লেখযোগ্য 'বিচিত্রিতা'-র একটি কাব্যসংগীত :

ঝাঁকড়া চুলের মেয়ের কথা কাউকে বলিনি,
কোন্ দেশে যে চলে গেছে সে চঞ্চলিনী।
সঙ্গী ছিল কুকুর কালু, বেশ ছিল তার আলুথালু,
আপনা-পরে অনাদরে ধুলায় মলিনী।

হুটোপাটি ঝগড়াঝাঁটি ছিল নিকারণেই
দিঘির জলে গাছের ডালে গতি ক্ষণে-ক্ষণেই।
পাগলামি তার কানায় কানায় খেয়াল দিয়ে খেলা বানায়,
উচ্চহাসে কলভাষে কল'কলিনী ॥

দেখা হ'লে যখন-তখন বিনা অপরাধে
মুখভঙ্গী করত আমায় অপমানের ছাঁদে।
শাসন করতে যেমন ছুটি হঠাৎ দেখি ধুলায় লুটি
কাজল আঁখি চোখের জলে ছল'ছলিনী ॥

আমার সঙ্গে পঞ্চাশবার জন্মশোধের আড়ি,
কথায় কথায় নিত্যকালের মতন ছাড়াছাড়ি।
ডাকলে তারে 'পুঁটলি' ব'লে সাড়া দিত মরজি হ'লে,
ঝগড়া-দিনের নাম ছিল তার স্বর্ণনলিনী ॥

'বিচিত্রিতা'-র সব কবিতাই চিত্রপ্রেরণাজাত একথা আগেই উল্লিখিত হয়েছে। চিত্রদর্শনে উদ্দীপিত ভাবকেই তিনি কাব্যশরীর দিয়েছেন। 'ঝাঁকড়া চুলের মেয়ের কথা' কবিতাটি রবীন্দ্রনাথের নিজেরই আঁকা একটি ছবির প্রেরণায় লেখা। একেই পরে সুরশোভিত ক'রে তিনি চিত্রপ্রেরণাজাত সংগীতের সমলগ্ন ক'রে গেছেন।

চিত্রপ্রেরণাজাত আরেকটি কবিতার সংগীতরূপপ্রাপ্তির ইতিহাস পাওয়া যাচ্ছে। সেই কাব্য-সংগীতটি হ'ল 'বলাকা'র 'ছবি'। রবীন্দ্রকাব্যের মরমী পাঠকমাত্রই জানেন ১৩২১ সালে এলাহাবাদে কবিতাটি রচনা করেন। সম্পূর্ণ এক আকস্মিক প্রেরণায় কবিতাটির উদ্‌বোধন হয়েছিল কবিচিত্তে। কবির ভাগিনেয়-পুত্র সুপ্রকাশের বাড়িতে কবির চিরন্তন স্মরণপ্রতিমা কাদম্বরী দেবীর চিত্র দেখে তিনি কবিতাটি রচনা করেন। পরে ১৩৩৮ সালে কবিতাটির গীতরূপান্তর ঘটে। এই রচনাটি সম্পূর্ণতই চিত্রপ্রেরণাজাত; অর্থাৎ, এলাহাবাদে ঐ ছবিটি না দেখলে রচনাটি আদৌ উৎসারিত হ'ত না। তার ফলে আমরা রবীন্দ্রসাহিত্যের একটি অনুপম কাব্যসংগীত পেতাম না। এই কাব্য-সংগীতটির সৌন্দর্য ও উৎকর্ষের শ্রেষ্ঠ নিরিখ এই জাতীয় আরেকটি কবিতার

সঙ্গে তুলনা। তুলনীয় কবিতাটি প্রি-র‍্যাফেলাইট কবি ডি. জি. রসেটির The Portrait। এ-কবিতাটি রসেটির মৃতা পত্নীর ছবির প্রেরণায় উদ্দীপিত।

This is her picture as she was :
It seems a thing to wonder on,
As though mine image in the glass
Should tarry when myself am gone.

* *

Here with her face doth memory sit
Meanwhile, and wait a day's decline,
Till other eyes shall look from it
Eyes of the spirit's Palestine
Even then the old gaze tenderer,
While hopes and aims long lost with her
Stand round her image side by side

দুটি কবিতা একই প্রেরণায় লেখা : দুখজাগানিয়া এক নারীর আলেখ্য আর তার পুঞ্জিত স্মৃতি। কিন্তু প্রকাশভঙ্গীর কি অসামান্য পার্থক্য। রসেটি তাঁর ব্যক্তিগত নির্বেদে আনতকোমল। তাই তাঁর কবিতা রেখাময় স্মরণচিহ্নে মুখর। রবীন্দ্রনাথের 'ছবি' কিন্তু ব্যক্তিগত স্মৃতির সীমাবদ্ধতাকে কাটিয়ে পরিব্যাপ্ত। সেই কারণেই নৈর্ব্যক্তিক, নিরবয়ব এবং ভাবময়। সম্ভবত এই নৈর্ব্যক্তিক ভাবময়তা কবিতাটিতে অন্তঃশীল ছিল বলেই সুরারোপ সম্ভব হয়েছে। আরও লক্ষণীয়, 'ছবি' কবিতার সমগ্র অংশে কবি সুর দেননি। তত্ত্বাংশ বাদ দিয়ে কেবল স্মৃতিময়ী প্রসঙ্গে উদ্বেলিত অংশটুকু গীতরূপ পেয়েছে। এই সংহত সংগীতটি এতদূর নৈর্ব্যক্তিক গভীরতাসম্পন্ন হয়েছে যে ১৩৩৯ সালে শাপমোচন গীতিনাট্যে রবীন্দ্রনাথ গানটিকে প্রয়োগ করেছেন। এইখানেই সংগীতটির জয়সংবাদ। চিত্রের রূপবর্ণরেখাময়তাকে অবলম্বন ক'রে যে প্রেরণার জন্ম তার সিদ্ধি ঘটেছে অসীম অবর্ণ ভাবময়তায়। আন্তর্জাতিক চিত্রপ্রেরণাজাত সংগীতগুলির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের চিত্রপ্রেরণাজাত সংগীতগুলির এইখানেই ভাবাত্মক সমলগ্নতার সূত্র। বিশ্বসংগীতসভায় সেইজন্যই রবীন্দ্রনাথ একজন শ্রেষ্ঠ সংগীতকার।

সংগীতের শব্দস্রোত চিত্রের চক্রকরে কখনও কখনও পথ ভোলে। সেই পথভোলা-পথিকের রূপ, সিন্ধুপারের পাখির মত, আমাদের মনকে সুদূরে আকর্ষণ করে। মনকে অসীমে ব্যাপ্ত করতে হ'লে সীমার বন্ধন মানতে হয়।

সংগীতে চিত্রপ্রেরণা সঞ্চারিত হয়ে তেমনই ব্যাপ্তি আনে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানে চিত্রপ্রেরণাকে শোভনতার সঙ্গে সংবদ্ধ করেছেন। তারই বিভিন্ন পর্যায় এতক্ষণ আলোচিত হ'ল। মূলকথা এই যে, চিত্র ও সংগীতের সংযোগ যেন দুই মেরুর দূরোন্বয়। কিন্তু সেই দুর্লভ এবং দুরূহ সমন্বয়ে অনেক আনন্দের উপকরণ মেলে। রবীন্দ্রনাথ আমাদের দেশে এই বিরলমিলনের পুরোহিত।

সুধীর চক্রবর্তী

রবীন্দ্রসংগীতে ধ্রুপদের প্রভাব

আমাদের সংগীতের ক্ষেত্রে 'ধ্রুপদ' শব্দটি প্রচলিত থাকলেও মূলতঃ এই শব্দটির পাঠ ছিল 'ধ্রুবপদ'। যে পদ[১] ধ্রুব, স্থির, অপরিবর্তনশীল তাকে ধ্রুবপদ বলা হয়। বর্তমানে ধ্রুপদ শব্দটি দ্বারাও সেই অর্থ বোধ হয় বলে আমরা আলোচ্য প্রবন্ধে প্রচলিত শব্দটিই ব্যবহার করব। রবীন্দ্রসংগীতে ধ্রুপদের প্রভাব সম্বন্ধে আলোচনা করার পূর্বে সংশ্লিষ্ট বিষয় হিসাবে ধ্রুপদ সম্বন্ধে সাধারণভাবে কিছু অবতারণা করা প্রয়োজন।

প্রবন্ধান্তরে পূর্বে আলোচিত হলেও প্রসঙ্গক্রমে পুনরায় উল্লেখ করতে হয়, সহস্রশাখাযুক্ত সামবেদে সামগানের বহুল বর্ণনাদি আছে। সামগানের পরে ছন্দোগান সমাজে প্রচার লাভ করে। তৎকালে সামগান গায়ককে সামগ এবং ছন্দোগান গায়ককে ছন্দোগ বলা হত। অতঃপর নানা প্রকার প্রবন্ধগান সৃষ্ট ও প্রচলিত হয়। ধ্রুপদ (ধ্রুবপদ) এই প্রবন্ধগান-প্রভাবিত, এবং ধ্রুপদকে প্রবন্ধগানেরই প্রকারভেদ বলা যায়।

শার্ঙ্গদেব তাঁর বিখ্যাত 'সংগীত রত্নাকর' গ্রন্থে পাঁচ প্রকার গীতের উল্লেখ করেছেন, যথা—শুদ্ধা, ভিন্না, গৌড়ী, বেসরা ও সাধারণী। শুদ্ধা গীতিতে সরল ও শ্রুতিমধুর স্বর প্রয়োগ করা হত। ভিন্না গীতিতে বক্র স্বর এবং সূক্ষ্ম ও শ্রুতিমধুর গমক প্রয়োগ করা হত। গৌড়ী গীতিতে স্বর তিন সপ্তকব্যাপী এবং পাশাপাশি স্বরে গমকযুক্ত ছিল। বেসরা গীতিতে স্বর কেবলমাত্র দ্রুতগতিতে ব্যবহার করা হত। সাধারণী গীতি উক্ত চার প্রকার গীতির মিশ্রণে উদ্ভূত ছিল। এ তো গেল প্রাচীন কালের কথা।

---

১ এ ক্ষেত্রে পদ শব্দটি পদের অর্থ হিসাবে গ্রহণীয়।

বর্তমানে ধ্রুপদের চারটি বাণী সম্বন্ধে শোনা যায়, যথা—গোবরহার, খাণ্ডার, ডাগুব (ডাগর) ও নওহার। বাণী শব্দটি রীতি অর্থে প্রযুক্ত। এই চার বাণীর মধ্যে গোবরহার বাণী শান্তরসের দ্যোতক, প্রসাদগুণ ও ধীরগতিসম্পন্ন। খাণ্ডার বাণী বীররসের উদ্দীপক ও বৈচিত্র্যশীল কিন্তু তত ধীরগতিসম্পন্ন নয়। ডাগুর বাণী সহজ, সরল ও মাধুর্যপূর্ণ। নওহার (নৌহার) বাণীতে স্বরগুলির মধ্যে পরস্পর দুই, তিন বা অধিক স্বরের পার্থক্য থাকে, তাতে কৌশলের পরিচয় পাওয়া গেলেও তেমন রসসৃষ্টি হয় না। গোবরহার শব্দটি গৌড়ীয় শব্দের অপভ্রংশ। কারো কারো মতে এই চার বাণীর সঙ্গে চারজন গুণী সংশ্লিষ্ট। যেমন তানসেনের সঙ্গে গোবরহার অর্থাৎ গৌড়ীয় বাণী সংশ্লিষ্ট, যেহেতু তানসেন গৌড়ীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন। রাজা সমোখন সিং খণ্ডার নামক স্থানের অধিবাসী ছিলেন—তদনুষঙ্গে খাণ্ডার বাণী, ব্রিজচন্দ্র দিল্লির নিকটবর্তী ডাগুর গ্রামের অধিবাসী ছিলেন—তদনুষঙ্গে ডাগুর (ডাগর) বাণী, শ্রীচন্দ ছিলেন নৌহারের লোক—তদনুষঙ্গে নওহার (নৌহার) বাণী উদ্ভূত। এর মধ্যে কোনো কোনো বাণীতে পরবর্তীকালে বাহুল্য ও বিকৃতি অনুপ্রবেশ করলেও বিশেষ লক্ষ্য করবার বিষয় শার্ঙ্গদেব-কৃত সংগীতরত্নাকর গ্রন্থে বর্ণিত শুদ্ধা, ভিন্না, গৌড়ী ও বেসরা এই চার বাণীর (মিশ্রিত সাধারণী বাণী ছাড়া) সঙ্গে পরবর্তীকালে প্রচলিত চার বাণীর কতকটা সামঞ্জস্য আছে। যা হোক, রসসৃষ্টির দিক থেকে বিচার করলে বর্তমানে প্রচলিত চার বাণীর মধ্যে গৌড়ীয় বাণীকেই প্রধান স্থান দিতে হয়, তারপর যথাক্রমে ডাগুর, খাণ্ডার ও নৌহার বাণীর স্থান। বর্তমানে শুদ্ধবাণী নামে যা প্রচলিত তা গৌড়ীয় বাণী ও ডাগুর বাণীরই নামান্তর অর্থাৎ শান্তরস, প্রসাদগুণ, ধীরগতি এবং সহজ, সরল ও মাধুর্যপূর্ণ স্বরবিন্যাস, এই ক'টি শুদ্ধ-বাণীর বৈশিষ্ট্য। রবীন্দ্রনাথের ধ্রুপদাঙ্গ গানে এই বৈশিষ্ট্যগুলি বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়।

বর্তমানে রাগসংগীতের ক্ষেত্রে ধ্রুপদ পরিবেশনের কতকগুলি রীতি ও লক্ষণ পরিলক্ষিত হয়। তার মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকটি উল্লেখযোগ্য :

১। ধ্রুপদ আরম্ভের পূর্বে বিস্তারিত রাগালাপ। বর্তমানে নোম্ তোম্ ইত্যাদি অর্থহীন শব্দের সাহায্যে রাগালাপ করা হয়। সম্ভবতঃ এগুলি পূর্ব-প্রচলিত কোনো অর্থবোধক শব্দবিন্যাসের অপভ্রংশ।

২। ভক্তিরস, শান্তরস ও বীররসের প্রকাশ। অবশ্য ধামার তালের হোরী গানে শৃঙ্গার রসের সন্ধান মেলে।

৩। ধ্রুপদ প্রথমে সম-লয়ে গেয়ে পরে দ্বিগুণ, চতুর্গুণ ইত্যাদি লয়ে বাঁট করা হয়। বাঁট শব্দের অর্থ বাঁটোয়ারা বা বণ্টন। রাগ ও তালের বৈশিষ্ট্য রক্ষা করে ধ্রুপদের শব্দগুলিকে দ্বিগুণ চতুর্গুণ ইত্যাদি লয়ে পরিবেশন করাকে বাঁট বলে। তা ছাড়া, 'অতীত গ্রহ, অনাগত গ্রহ প্রভৃতি ছন্দোবৈশিষ্ট্যও ধ্রুপদ গায়ন-রীতির অংশ। ধ্রুপদে তানের প্রয়োগ হয় না।

৪। বর্তমানে ধ্রুপদে চৌতাল, সুরফাঁকতাল, ঝাঁপতাল, তেওরা, ধামার ইত্যাদি তাল ব্যবহার হয় এবং মৃদঙ্গ বা পাখোয়াজ বাদিত হয়। পূর্বে ব্রহ্মতাল, মত্তাল, লক্ষ্মীতাল, গণেশতাল প্রভৃতি তালের ব্যবহার ছিল। কিন্তু বর্তমানে এ-সব তালে গাওয়ার মতো গুণী প্রায় নেই বললেই চলে।

৫। ধ্রুপদের গাম্ভীর্যের প্রতি লক্ষ্য রেখেই আনুষঙ্গিক বাদ্যযন্ত্রাদি নির্বাচিত হয়। বর্তমানে ধ্রুপদে তাল-সংগতের যন্ত্র হিসাবে পাখোয়াজ ব্যবহৃত হয়।

হিন্দুস্থানী সংগীতে ধ্রুপদ-গায়ককে 'কালোয়াৎ' বলা হত। কালোয়াৎ কলাবন্ত শব্দের অপভ্রংশ। যিনি উৎকৃষ্ট গায়ন-ক্ষমতা ও রচনা-শক্তির অধিকারী তিনি কলাবন্ত, কলাবৎ বা কালোয়াৎ। তানসেন কালোয়াৎ ছিলেন। কিন্তু কালোয়াৎ 'কোটিকে গুটিক মেলে'। অনেক ক্ষেত্রে ভ্রমবশতঃ অনেক অনধিকারীর উদ্দেশ্যেও এ শব্দটির প্রয়োগ হতে দেখা যায়। বর্তমানে শুদ্ধ-বাণীর ধ্রুপদকে শ্রেষ্ঠ বলা হয়। পূর্বেই বলা হয়েছে এই শুদ্ধবাণী মূলতঃ গৌড়ীয় বাণী ও ডাগুর বাণীর নামান্তর।

রবীন্দ্রসংগীতে ধ্রুপদের প্রভাব সম্বন্ধে আলোচনা করতে হলে, ধ্রুপদ সম্বন্ধে উল্লিখিত বিষয়গুলি স্মরণ রাখা আবশ্যক। রবীন্দ্রনাথ যে ভারতীয় ধ্রুপদের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাশীল ছিলেন, তাঁর নানা উক্তিতে তা প্রমাণিত হয়। তা থেকে এখানে কিছুটা উদ্ধৃত করা যুক্তিসঙ্গত হবে—

"আমরা বাল্যকালে ধ্রুপদ গান শুনতে অভ্যস্ত, তার আভিজাত্য বৃহৎ সীমার মধ্যে আপন মর্যাদা রক্ষা করে। এই ধ্রুপদগানে আমরা দুটো জিনিস পেয়েছি—একদিকে তার বিপুল গভীরতা, আর এক দিকে তার আত্মদমন, সুসংগতির মধ্যে আপন ওজন রক্ষা করা। এই ধ্রুপদের সৃষ্টি আগেকার চেয়ে

আরো বিস্তীর্ণ হোক, আরো বহুকক্ষবিশিষ্ট হোক, তার ভিত্তিসীমার মধ্যে বহুবৈচিত্র্য ঘটুক, তা হলে সংগীতে আমাদের প্রতিভা বিশ্ববিজয়ী হবে।"

রবীন্দ্রসংগীতে এই 'ধ্রুপদের সৃষ্টি' 'আরো বিস্তীর্ণ' হওয়া, 'বহুকক্ষবিশিষ্ট' হওয়া, 'বহুবৈচিত্র্য'শীল হওয়া, ইত্যাদি বিষয়গুলি কিভাবে সার্থক হয়েছে তৎসম্পর্কে আলোচনাই বর্তমান প্রবন্ধের মুখ্য বিষয়। অন্যভাবে বলতে পারা যায়, ধ্রুপদের মৌলিক বিশেষত্বগুলি রবীন্দ্রসংগীতে কিভাবে কার্যকরী হয়েছে। সর্বাগ্রে মনে রাখা আবশ্যক রবীন্দ্রসংগীত কথা ও সুরের মিলিত 'অর্ধনারীশ্বররূপ'। সেজন্য যে-কোনো পরিপ্রেক্ষিতেই বিচার করা যাক্-না কেন, সকল ক্ষেত্রে এই 'অর্ধনারীশ্বর রূপ'এর স্বাক্ষর মিলবে। বর্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধেও ওই একই কথা। রবীন্দ্রসংগীতে ধ্রুপদের প্রভাব সম্বন্ধে আলোচনা করার পক্ষে উক্ত বিষয়-সংশ্লিষ্ট গানগুলিকে মোটামুটি দুভাগে ভাগ করে নেওয়া সুবিধাজনক, যথা—ধ্রুপদাঙ্গ রবীন্দ্রসংগীত এবং ধ্রুপদাঙ্গ ছাড়া অন্যান্য রবীন্দ্রসংগীত।

রবীন্দ্রসংগীতের ক্ষেত্রে ধ্রুপদ শব্দটির পরিবর্তে ধ্রুপদাঙ্গ শব্দটির ব্যবহার সম্বন্ধে কিছু স্পষ্টীকরণ আবশ্যক। রাগসংগীতের ক্ষেত্রে ধ্রুপদ পরিবেশনের যে-সব নিয়ম ও রীতি আছে, রবীন্দ্রসংগীতের ক্ষেত্রে সেগুলি হুবহু অনুসৃত হয় না, যদিও মৌলিক বিষয়গুলি, যেমন সুর, তাল ইত্যাদি সম-ঐতিহ্যবাহী। ধ্রুপদের সঙ্গে কিছু স্বাতন্ত্র্য থাকায় রবীন্দ্রসংগীতে ধ্রুপদ শব্দের পরিবর্তে ধ্রুপদাঙ্গ শব্দের ব্যবহার অধিকতর যুক্তিসঙ্গত। তদ্রূপ খেয়ালাঙ্গ, টপ্পাঙ্গ ইত্যাদি শব্দগুলি ব্যবহার করা সমীচীন।

ধ্রুপদাঙ্গ রবীন্দ্রসংগীত : সুর-রচনা বা সুর-যোজনার দিক থেকে বিচার করলে ধ্রুপদাঙ্গ রবীন্দ্রসংগীতে দুটি শ্রেণী পাওয়া যায়, যথা—হিন্দি গান ভাঙা ধ্রুপদাঙ্গ রবীন্দ্রসংগীত এবং স্বাধীনভাবে সুর-যোজিত ধ্রুপদাঙ্গ রবীন্দ্রসংগীত। এর মধ্যে হিন্দিগান ভাঙা ধ্রুপদাঙ্গ রবীন্দ্রসংগীতে রবীন্দ্রনাথ প্রায় সব ক্ষেত্রে সুর, ছন্দ ও ভাবের দিকে হুবহু হিন্দিগানকে অনুকরণ করেন নি, ওই-সব গানে তাঁর কতকগুলি মৌলিক বিশেষত্ব প্রকাশ পেয়েছে—যার ফলে কথা ও সুর তুল্যমূল্য হয়েছে। এ বিষয়টি এত বিস্তারিত যে স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা না করলে রবীন্দ্রনাথের এই শ্রেণীর গানের যথার্থ মূল্যায়ন সম্ভব নয়। স্বর্গতা ইন্দিরাদেবী চৌধুরানী তাঁর 'রবীন্দ্রসংগীতের ত্রিবেণীসংগম' গ্রন্থে এ সম্বন্ধে

চমৎকার পথনির্দেশ করে গেছেন। যা হোক, রবীন্দ্রসংগীতের ক্ষেত্রে হিন্দিগান ভাঙা ধ্রুপদাঙ্গ গানই হোক, অথবা স্বাধীনভাবে সুর-যোজিত গানই হোক উভয়বিধ গানেরই পবিবেশন-বীতি একরূপ। এই পরিবেশন-রীতিতে কিছু স্বাতন্ত্র্য আছে। এই স্বাতন্ত্র্য সম্বন্ধে সম্যক জানা না থাকলে পরিবেশন-বীতি বক্ষা করা সম্ভব হয় না।

বাগসংগীতেব ক্ষেত্রে ধ্রুপদেব পবিবেশন-রীতি সম্বন্ধে ইতোপুর্বে আলোচনা কবেছি। সেই পবিপ্রেক্ষিতে বিচাব কবলে দেখা যাবে ধ্রুপদাঙ্গ ববীন্দ্র-সংগীতে প্রধান স্বাতন্ত্র্য হল এই যে তাতে দ্বিগুণ, চতুর্গুণ ইত্যাদি লয়েব কৌশল দেখানোব বীতি নেই। কাবণ তাতে কথাব ভাঙচুব ও অস্পষ্ট-গানেব ভাবকে খর্ব কবে। একটি ধ্রুপদাঙ্গ ববীন্দ্রসংগীতেব দৃষ্টান্ত দিলে বিষয়টি অধিকতব পবিস্ফুট হবে। 'তাঁহাবে আবতি কবে চন্দ্র তপন' চৌতালেব এ গানটিব স্থাযী অংশের কথার বিন্যাস এরূপ :

তাঁ ০ । হা বে 11 আ ০ । ব তি । ক বে । চ ন্ । দ্র ত । প ন 1
1 দে ০ । ব মা । ন ব । ব ন্ । দে চ । র ণ 1
1 আ ০ । সী ন । সে ই । বি শ্ । শ শ । ব ণ 1
1 তাঁ ০ । ব জ । গ ত । ম ন্ । দি রে । তাঁ বে 11

এই অংশকে দ্বিগুণ-লযে গাওয়া হলে কথার বিন্যাস এরূপ হয় :

গদি ঘেনে 1 ধা ধা । দিন্ তা । কৎ তাগে । দিন্ তা । তেটে কতা । গদি ঘেনে 1
১ ০ ২ ০ ৩ ৪
তাঁ০ হাবে 11 আ০ রতি । করে চন্ । দ্রত পন । দে০ বমা । নব বন্ । দেচ রণ 1
1 আ০ সীন । সেই বিশ্ । শশ বণ । তাঁ০ রজ । গত মন । দিরে তাঁবে 11

চতুর্গুণ লয়ে কথাব বিন্যাস এরূপ হয় :

ঘেনে 1 ধা ধা । দিন্ তা । কৎ তাগে ।
১ ০ ২
তাঁ০হাবে 11 আ০রতি করেচন্ । দ্রতপন দে০বমা । নববন্ দেচবণ ।
। দিন্ তা । তেটে কতা । গদি ঘেনে 1
০
। আ০সীন সেইবিশ্ । শশরণ তাঁ০রজ । গতমন্ দিবেতাঁরে 11

সংগীত-বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিগণ উপলব্ধি করবেন, লয় বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শব্দেব কিরূপ ভাঙচুর হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে উচ্চারণেব দ্রুততা ও অস্পষ্টতার জন্য শব্দের ব্যাকরণগত ধ্বনিবৈশিষ্ট্য কিরূপ ব্যাহত হয়—যা রবীন্দ্রসংগীতের

বৈশিষ্ট্যের পরিপন্থী। সংগীতের স্বরের যেমন বিশেষ বিশেষ ধ্বনি-রূপ আছে, ব্যাকরণের স্বর ও ব্যঞ্জন বর্ণেরও বিশেষ বিশেষ ধ্বনি-রূপ আছে। রবীন্দ্র-সংগীতে কথার ধ্বনি-রূপ ও সুরের ধ্বনি-রূপ একত্র মিলিত হয়ে অখণ্ড একটি ধ্বনি-রূপ ব্যক্ত করে। কাজেই যে ক্ষেত্রে কথা ও সুর 'অর্ধনারীশ্বর'রূপে বিদ্যমান সে ক্ষেত্রে কথা ভাঙাচোরার প্রশ্ন ওঠে না—এ কথা সমঝদার ব্যক্তিমাত্রই স্বীকার করবেন।

রাগসংগীতের ক্ষেত্রে ধ্রুপদে অতীত, অনাগত, আড় ইত্যাদি ছন্দ-বৈচিত্র্য দেখানো হয়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ধ্রুপদাঙ্গ গানে সেরূপ করার রীতি নেই। কারণ তাতে তালের ঝোঁকের স্থান পরিবর্তিত হয়ে যায় এবং গীতি-রূপকে খর্ব করে। অতীত ও অনাগত ছন্দে কিভাবে ঝোঁকের স্থান পরিবর্তিত হয়ে যায়, 'তাঁহারে আরতি করে চন্দ্র তপন' গানটির দৃষ্টান্ত অংশতঃ দিলেই বিষয়টি পরিস্ফুট হবে :

অতীত গ্রহ—

1 ধা ধা। দিন্ তা। কৎ তাগে। দিন্ তা। তেটে কতা। গদি ঘেনে 1
১ ০ ২ ০ ৩ ৪
11 ০ আ। ০ র। তি ক। রে চ। ন্ দ্র। ত প 1
1 ন দে। ০ ব। মা ন। ব ব। ন্ দে। চ র 1
1 ণ আ। ০ সী। ন সে। ই বি। শ্ শ। শ র 1
1 ণ তাঁ। ০ র। জ গ। ত ম। ন্ দি। রে তাঁ 1 রে·

উল্লিখিত অংশে দেখা যাচ্ছে, 'আরতি' শব্দের আ (দীর্ঘ) স্বর, 'করে' শব্দের ক, চন্দ্র শব্দের (কর্তা) চ ইত্যাদি প্রস্বনোপযোগী অক্ষরগুলি তালের ঝোঁক পাচ্ছে না। তা ছাড়া, অনাগত গ্রহের ক্ষেত্রেও দেখা যাবে প্রস্বনোপ-যোগী অক্ষরগুলি তালের ঠিক-ঠিক ঝোঁক পাচ্ছে না।

অনাগত গ্রহ—

ঘেনে 1 ধা ধা। দিন্ তা। কৎ তাগে। দিন্ তা। তেটে কতা। গদি ঘেনে I
১ ০ ২ ০ ৩ ৪
আ 11 ০ র। তি ক। রে চ। ন্ দ্র। ত প। ন দে 1
1 ০ ব। মা ন। ব ব। ন্ দে। চ র। ণ আ 1
1 ০ সী। ন সে। ই বি। শ্ শ। শ র। ণ তাঁ 1
1 ০ র। জ গ। ত ম। ন্ দি। রে তাঁ। রে আ 1

এই সকল আলোচনা থেকে আশা করি পাঠকগণ উপলব্ধি করবেন উল্লিখিতরূপ লয় ও ছন্দের হেরফেরে রবীন্দ্রসংগীতের বিশেষ ধ্বনি-রূপ খর্ব হওয়ার ষোলো-আনা আশঙ্কা থাকে—সে ক্ষেত্রে রবীন্দ্রসংগীতের 'অর্ধনারীশ্বর' রূপ নষ্ট হয়।

রাগসংগীতের ক্ষেত্রে বর্তমানে ধ্রুপদ গানে যে-যে তাল ব্যবহৃত হয় তৎসম্বন্ধে পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। ধ্রুপদ গানের বিষয়বস্তু সাধারণতঃ ধর্মবিষয়, প্রকৃতি-বর্ণনা, রাজার বন্দনা ও রাগ বর্ণনা এই ক'টিতেই সীমাবদ্ধ থাকতে দেখা যায়। কিন্তু রবীন্দ্রসংগীতে ছ'টি পর্যায়ের মধ্যে অধিকাংশ ধ্রুপদাঙ্গ গান পূজা পর্যায়ের অন্তর্গত।

রাগসংগীতের ধ্রুপদের তালগুলিকে রবীন্দ্রনাথের ধ্রুপদাঙ্গ গানগুলিকে চিহ্নিত করার জন্য প্রামাণিক হিসাবে গ্রহণ করা হলে পূজা পর্যায়ে যে গানগুলির সন্ধান মেলে পরে একটি বিস্তারিত তালিকা সংশ্লিষ্ট স্বরলিপিগ্রন্থ ও তদনুযায়ী রাগের উল্লেখসহ সংকলন করা হল।

প্রফুল্লকুমার দাস

হিন্দুসঙ্গীত ও কবিবর স্যার শ্রীরবীন্দ্রনাথ

"সঙ্গীতের মুক্তি"-শীর্ষক প্রবন্ধে পূজ্যপাদ রবীন্দ্র বাবু লিখিয়াছেন, "তাল জিনিসটা সঙ্গীতের হিসাব বিভাগ। এর দরকার খুবই বেশী সে কথা বলা বাহুল্য। কিন্তু দরকারের চেয়ে কড়াক্কড়ি যখন বড় হয়, তখন দরকারটাই মাটী হইতে থাকে।" * * *

"ইউরোপীয় গানে স্বয়ং রচয়িতার ইচ্ছামত মাঝে মাঝে তালে ঢিল পড়ে এবং প্রত্যেক বারেই সমের কাছে গানকে আপন তালের হিসাবনিকাশ করিয়া হাঁফ ছাড়িতে হয় না। কেননা সমস্ত সঙ্গীতের প্রয়োজন বুঝিয়া রচয়িতা তার নিজের সীমানা বাঁধিয়া দেন।" * *

প্রতীচ্য সঙ্গীতবিদ্যার সমাচার আমি বেশী রাখিতে পারি নাই। সুতরাং মাঝে মাঝে তাহাতে বেতালের প্রশ্রয় দেওয়া হয় কি না, তাহা আমি জানি না। তবে এই জানি যে, "Musical sound means a uniformity in the periodicity of vibration"। এই uniformity in periodicity-তে

ব্যভিচার যদি ইউরোপীয় সঙ্গীতশাস্ত্র প্রশ্রয় দিয়া থাকে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, প্রতীচ্য সঙ্গীতশাস্ত্রের মূলে সর্বজনগ্রাহ্য বৈজ্ঞানিক তথ্য অতি স্বল্প পরিমাণেই নিহিত আছে। হিন্দু সঙ্গীতশাস্ত্রেব তালাধ্যায়টী কিন্তু বিশ্বব্যাপী কালসম্বন্ধীয় একটি বৈজ্ঞানিক তথ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। নিখিল লোকব্যবহার এই কালজ্ঞান হইতে জন্ম লাভ করে। কোন্ কালে ইহা করিতে হইবে, এবং কখন ইহা করিতে হইবে না, কালজ্ঞান ব্যতীত তাহাব অবধাবণ অসম্ভব। ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান ভেদে কাল ত্রিবিধ। পর্যাযক্রম হইতে আমাদেব এই কালজ্ঞান হইয়া থাকে। জ্ঞানের স্বরূপ চিন্তা করিলে, উপলব্ধি হয়, ইহা অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ এই ত্রিকাল বিষয়ক। বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎকে অতীতের সহিত সম্বদ্ধ করিতে না পারিলে, জ্ঞান-বিজ্ঞানের উদয় হয় না। সত্য বা তথ্যজ্ঞানই বিজ্ঞান। বৈজ্ঞানিক তথ্য প্রাকৃতিক নিয়মসমুদাযেবই পর্য্যায়ান্তর। প্রাকৃতিক নিয়ম কাহাকে বলে? যে অব্যভিচাবী নিয়মানুসাবে পরমেশ্বর তাঁহাব সৃষ্ট জগতে কার্য সম্পাদন করেন, আপনাকে প্রকাশ করেন, আত্মশক্তির পরিচয় প্রদান করেন, তাহাই প্রাকৃতিক নিয়ম। পরিণামের ফলাফলের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া প্রাকৃতিক তথ্যসমূহ যখন সঙ্কল্পিত উদ্দেশ্যসিদ্ধি-সাধনোপায়স্বরূপে ব্যবহৃত হয়, তখন বিজ্ঞান পুষ্টি লাভ করে। ফলাফল কিন্তু উপাদানভূত ধাতু ও কালপরিমাণার্থক মাত্রাজ্ঞান সাপেক্ষ। মাত্রাসমষ্টিই কলনাত্মক কাল। পরিপুষ্ট বিজ্ঞান, কলাবিদ্যাবই নামান্তর মাত্র। অরূপীকে রূপ মাধুর্যে প্রস্ফুটিত করিবার জন্য, অনির্বচনীয়কে বচন-ভঙ্গীতে প্রকাশ করিবার জন্য, কলাবিদ্যার প্রয়োজন ও প্রচার হইয়া থাকে। সঙ্গীতে, কাব্যে, চিত্রকলায় আমরা ইহার পরিচয় পাইয়া থাকি। কলা কিন্তু কৌশল ব্যতীত উৎকর্ষলাভ করিতে পারে না। যে উপায়ে কলাবিদ্যার উদ্দেশ্য অনায়াসে সাধ্য হইযা উঠে তাহাই যোগ, তাহাই কৌশল, "যোগঃ কর্ম-সুকৌশলম্"। সঙ্গীতশাস্ত্রেব তালতত্ত্বে, কাব্যেব ছন্দতত্ত্বে, আমরা এই পরিপুষ্ট বিজ্ঞানের সমাচাব পাইয়া থাকি।

সকলের জাত আছে, যেমন হ্রস্বদীর্ঘমাত্রা বিন্যাসই ছন্দের স্বরূপ, সঙ্গীতে তালেরও স্বরূপ ঠিক তদ্রূপ। কলনাত্মক কালই তাল। তাল ছন্দেবই পর্য্যায়মাত্র। কাব্যে নিহিত ছন্দের ন্যায় সঙ্গীতে তালেরও যতি আছে। সঙ্গীতে তালের যতিকে 'লয়' বলে। এতদর্থে 'লয়' প্রাদুর্ভাবফলক (প্রাদুর্ভাব

হইয়াছে ফল যাহার), ইহা অত্যন্ত বিনাশ নহে। অতীতের অপেক্ষায় ক্রম-পরিমাণাত্মক ভবিষ্যদ্দর্শনই সঙ্গীতে তালের লয় প্রদর্শন। যেমন মাত্রা-সংখ্যা ও যতিগতভেদ নিবন্ধন ছন্দবিভেদ ঘটিয়া থাকে, সঙ্গীতেও ঠিক তেমনই মাত্রাসংখ্যা ও যতিভেদে তালের প্রকারভেদ, সুতরাং নামভেদও হইয়া থাকে। অতএব স্বীকার করিতে হইবে, হিন্দু সঙ্গীতশাস্ত্রে ব্যাখ্যাত তালতত্ত্ব পরিপুষ্ট বিজ্ঞানসম্মত। এবং যাহা বিজ্ঞানসম্মত তাহা অব্যভিচারী হইবারই কথা। এই জন্যই হিন্দুর কি সঙ্গীততন্ত্রে কি সমাজতন্ত্রে, বিধিবিধানের ব্যভিচার লইয়া এতাদৃশ একটা কড়াকড়ি ব্যাপার পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। কেননা, পরিপুষ্ট বিজ্ঞানসম্মত লোকব্যবহারে ব্যভিচারের প্রশ্রয় নাই।

ধাতুমাত্রা সমবায়ে সুরতালজ্ঞ ব্যক্তি যখন যে রাগে, যে তালে ইচ্ছা, সেই রাগে ও তালে গীত রচনা এবং গানের সহিত তাহার সঙ্গত করিতে পারেন। কিন্তু 'সঙ্গীতের মুক্তি'-শীর্ষক প্রবন্ধের পাঠকবর্গ হয়তো মনে করিতে পারেন যে আমি কথাটা বড় জোর করিয়া বলিতেছি। কারণ বিশ্ববিশ্রুত কবি লিখিয়াছেন, "অনেক দিন হইতেই কবিতা লিখিতেছি। * * * এজন্য ছন্দতত্ত্ব কিছু কিছু বুঝি। সেই ছন্দের বোধ লইয়া যখন গান লিখিতে বসিলাম, তখন * * * আমার রচনার উপর তালের দেবতা * * * ফোঁস করিয়া উঠিলেন। আমার জ্ঞান ছিল ছন্দমধ্যে যে নিয়ম আছে, তাহা বিধাতার গড়া নিয়ম * * *। সুতরাং তার সংযমে সঙ্কীর্ণতা থাকিতে পারে না, তাহাতে বৈচিত্র্যকে উদ্‌ঘাটিত করিতে থাকে। সেই কথা মনে রাখিয়া বাংলা কাব্যে ছন্দকে বিচিত্র করিতে সঙ্কোচ বোধ করি নাই।"

"কাব্য ছন্দে যে কাজ, গানে তালের সেই কাজ। অতএব ছন্দ যে নিয়মে কবিতায় চলে, তাল সেই নিয়মে গানে চলিবে। এই ভরসা করিয়া গান বাঁধিতে চাহিলাম। তাহাতে কি উৎপাত ঘটিল একটি দৃষ্টান্ত দিই।" কবি প্রদত্ত প্রথম দৃষ্টান্তটী এই,—

কাঁপিছে দেহলতা থরথর, চখের জলে আঁখি ভরভর
দোদুল তমালেরি বনছায়া তোমার নীল বাসে নীল কায়া,
বাদল নিশীথেরি ঝরঝর তোমার আঁখিপরে ভর ভর। ইত্যাদি

যে কথা ছিল তব মনে মনে চমকে অধরের কোণে কোণে।

নীরব হিয়া তব দিল ভরি কি মায়া-স্বপনে যে মরি মরি,
নিবিড় কাননের মরমর বাদল নিশীথের ঝরঝর ॥

ইহার উপর টিপ্পনী স্বরূপে কবি লিখিতেছেন, "এ ছন্দে আমার পাঠকেরা কিছু আপত্তি করিলেন না। তাই সাহস করিয়া ঐটেই ঐ ছন্দেই সুরে গাহিলাম। তখন দেখি যাঁরা কাব্যের বৈঠকে দিব্য খুশী ছিলেন, তাঁরাই গানের বৈঠকে বক্রচক্ষু। তাঁরা বলেন, এ ছন্দের এক অংশে সাত, আর এক অংশে চার, ইহাতে কিছুতেই তালে মেলে না।"

এই তো গেল কবির কথা। ছন্দে যদি দোষ না থাকে তবে, সুরে গান করিলে, কেন তালযোগে তাহার সঙ্গত করা যাইবে না,—একথা কি বেশ পরিষ্কার করিয়া তালতত্ত্ববিদ্‌গণকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল? সাহিত্যের দৃক্‌ভূমি হইতে কবিতাটি আলোচনা করিবার এ স্থান নহে। কবিতাটি যেমনই হউক, ইহার সপ্তমে ও চতুর্থে যতি বিন্যস্ত আছে। আপনারা সকলেই জানেন, বাঙ্গালা পদ্যে হ্রস্বদীর্ঘ-ভেদ বিবর্জিত অক্ষরবৃত্ত ছন্দই বহুল ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহাও সেই একাদশাক্ষরনিবদ্ধ বর্ণবৃত্ত 'বিলাসিনী' ছন্দের স্বরূপ। 'বিলাসিনী' ছন্দে, যতি বিন্যাসের কোন বাঁধাবাঁধি নিয়ম না থাকায়, ইহার সপ্তম চতুর্থে যতি বিন্যাসে, কোনই ক্ষতি হয় না (পিঙ্গলাচার্য কৃত ছন্দসূত্র ষষ্ঠাধ্যায়, ২৭ সূত্র দ্রষ্টব্য)। সুতরাং হ্রস্বদীর্ঘ-ভেদ বিবর্জিত বাঙ্গালা পদ্য-সাহিত্যে সপ্তম-চতুর্থে যতিযুক্ত করিয়া একাদশাক্ষরাত্মক 'বিলাসিনী'-ছন্দ কবির অভিপ্রায়ানুযায়ী ছন্দে গান করিলে, তালযোগে তাহার সহিত সঙ্গত অনায়াসে চলিবারই কথা। সঙ্গীতশাস্ত্রে তালতত্ত্বের মূলীভূত বৈজ্ঞানিক তথ্য যদি সত্য হয়, তাহা হইলে আমি বলিব এ বিষয়ে কবির বক্তব্যকে ভয় করিবার প্রকৃত তালজ্ঞ ব্যক্তির কোনই কারণ নাই। কারণ যাবতীয় 'বিলাসিনী'-ছন্দ, যে শাস্ত্রব্যাখ্যাত তালে সঙ্গত করা যাইতে পারে, সেই একাদশমাত্রাত্মক "শ্রীশেখর" তালে, সাতটী তালি ও চারিটি ফাঁক আছে এবং ছন্দের অনুযায়ী সপ্তমে ও চতুর্থে লয় আছে।

এই তো গেল এগার মাত্রার কথা। কবি-রচিত আরও একটি গান আপনাদের সমক্ষে পরীক্ষিত হইতেছে। গানটি এই—

"দুয়ার মম পথ পাশে সদাই তারে খুলে রাখি।
কখন তার রথ আসে ব্যাকুল হয়ে জাগে আঁখি। ইত্যাদি

কবিবর কর্তৃক দৃষ্টান্তরূপে ধৃত ইহা নয় মাত্রার ছন্দ। ইহাও অক্ষরবৃত্ত এবং পঞ্চমে ও চতুর্থে যতি বিন্যস্ত। হ্রস্বাদি ভেদের কথা ছাড়িয়া দিলেও, ইহাকে ছন্দোমঞ্জরী ব্যাখ্যাত "মণিমধ্য" ছন্দের মধ্যে গ্রহণ করা যায় (ছন্দো-মঞ্জরী ৩২ পৃঃ এবং ছঃ কুঃ ২২ পৃষ্ঠা)। 'মণিমধ্য' ছন্দে পঞ্চম চতুর্থে যতি বিন্যস্ত হইয়াছে। যদি ঠিক ঠিক ছন্দানুযায়ী গানের সহিত সঙ্গত করিতে হয়, তাহা হইলে যে নয়মাত্রাত্মক "জনক" তালযোগে ইহার সঙ্গত করিতে হইবে, সেই তালে ছয়টি তালি এবং তিনটি ফাঁক আছে। আর ছন্দানুবর্তী পঞ্চমে চতুর্থে লয়ও প্রদর্শিত হইয়াছে।

কবি লিখিতেছেন, "চৌতাল তো বার মাত্রার ছন্দ। কিন্তু এই বার মাত্রা রক্ষা করিলেও, চৌতালকে রক্ষা করা যায় না। এই তো বারো মাত্রা,"—

(লছমীপদ—পূরবী)

"বনের পথে পথে বাজিছে বায়
নূপুর রুনু রুনু কাহার পায়।
ইত্যাদি

কবি লিখিতেছেন, "ইহা চৌতাল নহে। একতালাও নহে, ধামারও নহে, ঝাঁপতালও নহে। লয়ের হিসাব দিলেও তালের হিসাব মেলে না। তালওয়ালা সেই গরমিল লইয়া কবিকে দায়িক করেন।"

কিন্তু বার মাত্রা হইলেই, সেটি হয় একতালা না হয় চৌতাল যে হইতেই হইবে, সঙ্গীতশাস্ত্র এমন কি কোন কঠিন নিয়ম বিধান করিয়াছেন? বার মাত্রার তাল আরও অনেক প্রকার আছে। যেমন খেম্‌টা, আড়খেম্‌টা, রাস মোহন ইত্যাদি। ইহারা প্রত্যেকেই বার মাত্রার ছন্দ। মাত্রার কলনগত প্রভেদ ও লয়ের প্রভেদ হেতু ইহাদের বিভিন্ন নামকরণ হইয়াছে। ধামার যে সাত মাত্রার তাল, তন্মধ্যে ছয়টি পূর্ণ মাত্রা, আর দুইটি অর্ধ মাত্রা। সুদক্ষ বাদ্যকারের হাতে তাহা সম্যক প্রদর্শিত হইতে পারে। এই জন্যই ধামার এখানে খাটিবে না। ঝাঁপতালও দশ মাত্রার তাল, সুতরাং কবিতার ছন্দ যখন বার মাত্রায় নিবদ্ধ, তখন কবির অভিপ্রায়ানুযায়ী গান করিতে হইলে, ঝাঁপতালে ইহার সঙ্গত হইতে পারে না। প্রোক্ত দ্বাদশাক্ষর নিবদ্ধ ছন্দটী, ছন্দশাস্ত্রব্যাখ্যাত 'বাহিনী' ছন্দ। 'বাহিনী' ছন্দে সপ্তমে ও পঞ্চমে যতি বিন্যস্ত হইয়া থাকে। বাহিনী-ছন্দে গ্রথিত যে কোন কবিতা সুরযোগে গান করিলে,

যে বার মাত্রাত্মক ঠেকা সহকারে সঙ্গত করিতে হইবে, শাস্ত্রসিদ্ধ সেই "প্রতিমা-ভঙ্গ" তালেরও সপ্তমে পঞ্চমে লয় প্রদর্শিত হইয়াছে।

কবির অভিপ্রেত বর্ণবৃত্ত ছন্দানুপাতে গান করা অপেক্ষা পরম্পরাগত স্বরের মাত্রাবৃত্তানুযায়ী গায়ন করিলে গানের রূপশ্রী যে আশাতীতভাবে উছলিয়া পড়ে, এ কথা বোধ হয় প্রেক্ষাবান মাত্রেই স্বীকার করিবেন। আমার মনে হয় এতদ্দ্বারা পদ্য-কাব্য এবং সঙ্গীতের পার্থক্যও সূচিত হইল। রসাত্মক বাক্য কাব্য। ভাববাহুল্যে, চিত্তবিনোদনে রসাত্মক বাক্যের প্রভূত প্রভাব অস্বীকার করিবার কাহারও উপায় নাই। বিশ্বের যে রস, যে সৌন্দর্যরাশি ক্রান্তদর্শী কবি কর্তৃক সঙ্কলিত ও ছন্দনিবদ্ধ হইয়া অস্মদ্ সমক্ষে যে রূপ-রসে ভাববৈভবের বিচিত্রে প্রকাশ পাইয়া থাকে, সঙ্গীতে তাহা চরমোৎকর্ষ লাভ করে। সঙ্গীত যতিমাত্রাদিবিন্যস্ত ছন্দনিবদ্ধ স্বরাদির আরোহণাবরোহণ, মূর্ছনা, কম্পন প্রভৃতি বিবিধ উপায়ে ভাষাকে প্রাণস্পর্শিনী শক্তিতে পরিণত করে। রসাত্মক বাক্য যে নিয়মে (যেমন কথকতায়) আবৃত্ত হইয়া থাকে, ঠিক তন্নিয়মাধীন হইয়া কবিতা গীত হইবার রীতি নাই। এই জন্যই কাব্যের ছন্দ যে নিয়মে রচিত হইয়া থাকে, সঙ্গীতের ছন্দ ঠিক তৎবিধানে সর্বথা নিয়ন্ত্রিত হয় না। বঙ্গভাষায় হ্রস্ব-দীর্ঘ ভেদ-বিবর্জিত অক্ষর সমবায়ে পদ্য-কাব্যের ছন্দ গ্রথিত হয়। এই জন্য বাংলা ছন্দে রচিত কোন কবিতা-বিশেষকে গায়নকালে, যে রাগিণী যে কবিতাটিতে সংযোজিত হইবে, সেই রাগিণীর উপাদানভূত স্বরাদি ধাতুতে, কবিতার ছন্দযতিবিন্যাস প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া, হ্রস্বদীর্ঘাদি মাত্রার বিন্যাস পূর্বক তাহা গানে বসাইবার উপদেশ আছে। গানে ধাতু ও মাত্রাই মুখ্য, কবিতায় নিবদ্ধ পদাবলী মুখ্য নহে। গীতাদিতে মাত্রা ও ছন্দের অনুরোধে হ্রস্বদীর্ঘের বিনিময় হইয়া থাকে। ইহা সঙ্গীতশাস্ত্র-সঙ্গত। এই সমস্ত কারণে প্রতীয়মান হইতেছে, গীতাদি বিষয়ে স্বরাদিতে নিবদ্ধ যে ছন্দ মুখ্য, পদ্য-কাব্যসাহিত্যে তাহা গৌণ মাত্র।[১]

কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ বেদান্তচিন্তামণি

---

১ রবীন্দ্রনাথের 'সঙ্গীতের মুক্তি' নামক বক্তৃতায় হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে তাঁদের প্রয়োগ সম্পর্কে যে আলোচনা করেছিলেন তারই প্রতিবাদস্বরূপ ১৯১৭ সালের ১৪ই ডিসেম্বর প্রেসিডেন্সি থিয়েটার মঞ্চে বিশিষ্ট রূপদীয়াগণ এক

ধ্রুপদাঙ্গ রবীন্দ্রসংগীতের পূর্ণ তালিকা ॥ পূজা পর্যায়

চৌতাল :

অসীম আকাশে অগণ্য কিরণ। মারু কেদারা। স্ব ২৫[১]
আইল শান্ত সন্ধ্যা। শ্রী। স্ব ৪৫
আছ অন্তরে চিরদিন। কাফি। স্ব ২২
আজি কোন্ ধন হতে বিশ্বে আমারে। মিশ্র কেদারা। স্ব ২২
আজি মম মন চাহে জীবনবন্ধুরে। বাহার। স্ব ৪
আজি হেরি সংসার অমৃতময়। বিলাবল। স্ব ২৩
আনন্দ রয়েছে জাগি। হাম্বীর। স্ব ৪
আমারে করো জীবনদান। শঙ্করা। স্ব ৪
এখনো আঁধার রয়েছে হে নাথ। আসাবরী। স্ব ৮
এসেছে সকলে কত আশে। হাম্বীর। স্ব ২৬
ওঠো ওঠো রে—বিফলে প্রভাত। বিভাস। স্ব ২৪
কামনা করি একান্তে। দেশকার। স্ব ২৫
কে যায় অমৃতধামযাত্রী। বেহাগ। স্ব ২৪
কেমনে ফিরিয়া যাও। ভৈরবী। স্ব ৪
চিরদিবস নব মাধুরী। নটমল্লার। স্ব ২২
জগতে তুমি রাজা। কানাড়া। স্ব ৮
জাগিতে হবে রে। মিশ্র শঙ্করা। স্ব ৪৫
জাগ্রত বিশ্বকোলাহল-মাঝে। বিভাস। স্ব ২৪
ডুবি অমৃতপাথারে। ললিত। স্ব ৮
তাঁহারে আরতি করে চন্দ্র তপন। বড় হংসসারঙ্গ। স্ব ২২
তুমি জাগিছ কে। গৌড়। স্ব ২৬
তোমা লাগি নাথ। পূরবী। স্ব ২২

সভায় মিলিত হয়। উপরোক্ত আলোচনাটি সুস্থ সমালোচনার একটি দিক নির্দেশ করবে মনে করে প্রকাশ করা হ'ল। উৎসাহী পাঠক সম্পূর্ণ বইটি পাঠ করতে পারেন। সঃ উত্তরসূরী

১ প্রত্যেক গানের শেষে 'স্ব' ও সংখ্যা স্বরবিতানের খণ্ড-বাচক।

সুরফাঁকতাল :

ঝাঁপতাল :

আজি রাজ-আসনে তোমারে । বেহাগ । স্ব ২৬
এত আনন্দধ্বনি উঠিল কোথায় । বাহার । স্ব ২৬
কে রে ওই ডাকিছে । আলাইয়া । স্ব ২৫
গরব মম হরেছ প্রভু । দেশ । স্ব ২২
জাগে নাথ জোছনারাতে । বেহাগ । স্ব ৩৬
ডাকিছ কে তুমি তাপিত জনে । খাম্বাজ । স্ব ২২
নূতন প্রাণ দাও প্রাণসখা । লাচারী টোড়ী । স্ব ৪
বীণা বাজাও হে মম অন্তরে । পূরবী । স্ব ২৫
মম অঙ্গনে স্বামী আনন্দে হাসে । বাহার । স্ব ২৫
হরষে জাগো আজি । হাম্বীর । স্ব ২৭
হৃদিমন্দিরদ্বারে বাজে । কেদারা । স্ব ২৩

আড়া চৌতাল :

শুভ্র আসনে বিরাজো । ভৈরব । স্ব ৪
সংসারে কোনো ভয় নাহি । ইমন্ কল্যাণ । স্ব ২৫
সবে আনন্দে করো । দেওগিরি বিলাওল । স্ব ২৪

ঝাঁপতাল :

অন্তরে জাগিছ অন্তরযামী । বেহাগ । স্ব ২৫
অসীম কালসাগরে । ভৈরবী । স্ব ৮
আজি এনেছে তাঁহারি আশীর্বাদ । মিশ্র টোড়ী । স্ব ৪৫
আমরা যে শিশু অতি । যোগিয়া । স্ব ৪৫
আমার মন তুমি নাথ লবে । মিশ্র ছায়ানট । স্ব ২২
আমারেও করো মার্জনা । মিশ্র যোগিয়া । স্ব ৪৫
আমি দীন অতি দীন । খট্ । রামকেলী । স্ব ২৩
এ কী সুগন্ধ হিল্লোল বহিল । মিশ্র যোগিয়া । স্ব ২৩
কী ভয় অভয়ধামে । বেহাগ । স্ব ২৬
কেন বাণী তব নাহি শুনি । স্ব ৮
কেমনে রাখিবি তোরা । সিন্ধুড়া । স্ব ২৬
কোথায় তুমি আমি কোথায় । ককুভ । স্ব ২৫
চরণধ্বনি শুনি তব নাথ । সিন্ধু । স্ব ২৫

তেওরা :

বাজে বাজে রম্য বীণা। ইমন্ কল্যাণ। স্ব ২৭
বিপুল তরঙ্গ রে। ভীমপলশ্রী। স্ব ২৫
ভুবনজোড়া আসনখানি। স্ব ১৬
মধুররূপে বিরাজো। তিলক কামোদ। স্ব ৮
মহানন্দে হেরো গো সবে। তিলক কামোদ। স্ব ৪
মহাবিশ্বে মহাকাশে১। ইমন্ কল্যাণ। স্ব ৪
মোরে ডাকি লয়ে যাও। মিশ্র রামকেলী। স্ব ২৭
যখন তুমি বাঁধছিলে তার। স্ব ৪৩
যে কেহ মোরে দিয়েছ সুখ। কাফি। স্ব ২২
লহো লহো তুলে লহো। স্ব ৩১
সকল ভয়ের ভয় যে তারে। বেহাগ। স্ব ৯
সংশয় তিমির মাঝে২। রাজবিজয়। স্ব ৪৫
সত্যমঙ্গল প্রেমময় তুমি। ইমন্ কল্যাণ। স্ব ২৩
সবাই যারে সব দিতেছে। স্ব ৭
সেই তো আমি চাই। স্ব ৪৪
হৃদয়বেদনা বহিয়া প্রভু। সিন্ধু। স্ব ২৫

বিলম্বিত ত্রিতাল :

আজি মম জীবনে নামিছে। আড়ানা। স্ব ২৪
এবার নীরব করে দাও হে। কানাড়া। স্ব ৩৭
বেঁধেছ প্রেমের পাশে। কাফি-কানাড়া। স্ব ২৩

পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে ধ্রুপদ গানে তাল-সংগতের যন্ত্র হল পাখোয়াজ। প্রশ্ন হতে পারে উল্লিখিত তালিকার সব গানের সঙ্গে কি পাখোয়াজ বাদিত হওয়া আবশ্যক। সে-সম্বন্ধে কিছু বিচার-বিবেচনা করা প্রয়োজন। চৌতাল, সুরফাঁকতাল ও ধামার তালের গানে অবশ্যই পাখোয়াজ বাদিত হবে। কিন্তু যেহেতু আড়াচৌতাল, ঝাঁপতাল, তেওরা তাল ও বিলম্বিত ত্রিতাল ধ্রুপদ ছাড়াও অন্য শ্রেণীর গানে ব্যবহৃত হয়, সেজন্য ওই সব তালের গানবিশেষে তব্‌লা যন্ত্রের ব্যবহার দূষণীয় তো নয়ই বরঞ্চ সমীচীন।

---

১ ভিন্নরূপে চৌতাল
২ ভিন্নরূপে ত্রিতাল

'সুসঙ্গতির মধ্যে আপন ওজন রক্ষা করা' ধ্রুপদের এই বৈশিষ্ট্যের বিচারে আরো অনেক রবীন্দ্রসংগীতকে ধ্রুপদাঙ্গ বলা চলে। তার মধ্যে কতকগুলি বিশেষ বিশেষ তালের গান উল্লেখযোগ্য :

নবপঞ্চতাল : জননী, তোমার করুণচরণখানি। মিশ্র গুণকেলী। স্ব ২৬

একাদশীতাল : দুয়ারে দাও মোরে রাখিয়া। সুরট-মল্লার। স্ব ৪

নবতাল : নিবিড় ঘন আঁধারে। সাহানা। স্ব ৪

প্রেমে প্রাণে গানে গন্ধে। মিশ্র টোড়ী। স্ব ২৬

রূপকড়া তাল : ওই যে তরী দিল খুলে। ভৈরবী। স্ব ৩৭

কত অজানারে জানাইলে তুমি। মিশ্র হাম্বীর। স্ব ২৬

গভীর রজনী নামিল হৃদয়ে। পরজ-বসন্ত। স্ব ৪ ইত্যাদি

তাল সম্বন্ধে বিচারের অন্য দিকও আছে। রাগসংগীতের ক্ষেত্রে দাদ্‌রা, কাহার্‌বা, একতাল ইত্যাদি তাল অপেক্ষাকৃত হাল্কা তাল হিসাবে গণ্য, যেজন্য ধ্রুপদে এ-সব তালের ব্যবহার হয় না। কিন্তু রবীন্দ্রসংগীতের ক্ষেত্রে তথাকথিত এই হাল্কা তালগুলি এক স্বতন্ত্র মহিমায় ব্যবহৃত হয়েছে। আমাদের বিশ্বাস রবীন্দ্রনাথ এই তালগুলি তাঁর গানবিশেষে ব্যবহার করেও ধ্রুপদের গাম্ভীর্য কৃতিত্বের সহিত রক্ষা করেছেন। তার অনেক দৃষ্টান্তের মধ্যে অন্তত কয়েকটি এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করি :

দাদ্‌রা : নিশা অবসানে কে দিল গোপনে আনি। স্ব ১৩

কাহার্‌বা : রজনীর শেষ তারা। স্ব ১৪

একতাল : নিভৃত প্রাণের দেবতা। স্ব ৩৮

ভুবন হইতে ভুবনবাসী। স্ব ২৩

রাত্রি এসে যেথায় মেশে। স্ব ৩৯ ইত্যাদি

ধ্রুপদাঙ্গ ছাড়া অন্যান্য রবীন্দ্রসংগীত :

রবীন্দ্রসংগীতে ধ্রুপদের প্রভাব সম্পর্কে আর-একটি আলোচনার দিক আছে। সেটি হল গানের অবয়ব অর্থাৎ কলি-সংখ্যা। সাধারণত ধ্রুপদগানে চারটি কলি থাকে—স্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী ও আভোগ। অধিকাংশ রবীন্দ্র-সংগীত এই চার কলি-বিশিষ্ট। বিশেষ লক্ষ্য করবার বিষয়, চার কলি-যুক্ত এই গানগুলির প্রত্যেকটি এক-একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ভাব-রূপ কবিতা হিসাবে যেমন প্রকাশ করছে আবার সুর সহযোগে গান হিসাবেও প্রকাশ করছে।

এ বিষয়টি রবীন্দ্রসংগীত-অনুশীলনকারী প্রত্যেক ব্যক্তির মনে সর্বদা জাগ্রত রাখা প্রয়োজন। কারণ গানের কাব্যাংশের ভাব-রূপটি ঠিক-ঠিক হৃদয়ঙ্গম না করতে পারলে গানের রূপায়ন সর্বাঙ্গসুন্দর হয় না।

ধ্রুপদের জন্য যেরূপ কণ্ঠ-প্রস্তুতি, স্বরক্ষেপণ, অলংকরণ, দম ইত্যাদি আবশ্যক সে-সব পরিপ্রেক্ষিতে বিচার-বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, অধিকাংশ রবীন্দ্রসংগীতে ধ্রুপদের প্রভাব অল্পবিস্তর আছেই—সে-প্রভাব মধ্যযুগীয় শুদ্ধ বাণীর ধ্রুপদের প্রভাব যা প্রাচীন যুগের 'শুদ্ধা' গীতির প্রভাবে প্রভাবিত।

প্রফুল্লকুমার দাস

রবীন্দ্র-কণ্ঠের রেকর্ড

গান-রচনা ও সুর-যোজনা এই দুটি গুণের সু-সমন্বয়ে একই ব্যক্তির মধ্যে কমই ঘটতে দেখা যায়। রবীন্দ্রনাথ এই দুই গুণেরই প্রতিভাবান্ অধিকারী ছিলেন। বাণী ও সুরের মিলিত এই 'অর্ধনারীশ্বর' সৃষ্টির প্রতি যে তাঁর বিশেষ মমতা-বোধ ছিল তার অনেক প্রমাণ আছে। সৃষ্টির পরিচয় সৃষ্টিকর্তার নিজের কাছ থেকে পাওয়া সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা সন্দেহ নেই। রবীন্দ্রনাথের নিকটে যারা রবীন্দ্রসংগীত শেখার সুযোগ পেয়েছিলেন, তাঁরা সৌভাগ্যবান্। এই সুযোগ পাওয়া সম্বন্ধে চিন্তা করলে, রবীন্দ্রনাথের অবর্তমানে যে-বিষয়টি মনে আসে তা হল রবীন্দ্র-কণ্ঠের রেকর্ড। শোনা যায়, disc-recording প্রবর্তনের পূর্বে কবি-কণ্ঠে গীত অনেকগুলি রবীন্দ্রসংগীতের রেকর্ড (tube-recording?) হয়েছিল। কিন্তু সে-সব রেকর্ড যে কোন্ দেশে কালের অতলে তলিয়ে গেল তার কোনো সন্ধান আজ পর্যন্ত মিলল না। যা হোক, তবুও ভালো রবীন্দ্র-কণ্ঠে গীত রবীন্দ্রসংগীতের কয়েকখানি রেকর্ড আজও পাওয়া যায়। তালিকা নিম্নে সংকলন করা করা হল। এই রেকর্ডগুলি শুনে রবীন্দ্র সংগীতের যথার্থ ভাব ও রূপ সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা করে নেওয়া সমঝদার শ্রোতার পক্ষে সম্ভব। প্রসঙ্গক্রমে রবীন্দ্র-কণ্ঠে আবৃত্তির রেকর্ডগুলির উল্লেখ করা হল :

হিজ মাস্টার্স ভয়েস

গান ॥ আমি সংসারে মন দিয়েছিনু
অন্ধজনে দেহো আলো পি ৮৩৬৭

গান ॥ শেষ পারানির কড়ি
আমারে কে নিবি ভাই পি ১১৮৫৫

আবৃত্তি ॥ কর্ণ-কুন্তী সংবাদ পি ১১৮৫৭ ও পি ১১৮৫৮

আবৃত্তি ॥ কৃষ্ণকলি
ভ্রষ্টলগ্ন পি ১১৮৫৯

আবৃত্তি ॥ আজি হতে শত বর্ষ পরে
আবির্ভাব পি ৮৩৬৬

আবৃত্তি ॥ Readings from Gitanjali
Readings from Crescent Moon পি ১১৮৫৬

কলম্বিয়া

আবৃত্তি ॥ ভারততীর্থ
ভগবান তুমি যুগে যুগে ভি ই ২৫৪৫

আবৃত্তি ॥ আজি হতে শতবর্ষ পরে
এই তীর্থ দেবতার
হে মোর সন্ধ্যা ভি ই ২৫৫১

একটি অপ্রকাশিত স্বরলিপি

মনে কী দ্বিধা রেখে গেলে চলে সে দিন ভরা সাঁঝে,
যেতে যেতে দুয়ার হতে কী ভেবে ফিরালে মুখখানি—
কী কথা ছিল যে মনে।
তুমি সে কি হেসে গেলে আঁখিকোণে—
আমি বসে বসে ভাবি নিয়ে কম্পিত হৃদয়খানি,
তুমি আছ দূর ভুবনে।
আকাশে উড়িছে বকপাঁতি,
বেদনা আমার তারি সাথি।
বারেক তোমায় শুধাবারে চাই বিদায়কালে কী বল নাই
সে কি রয়ে গেল সিক্ত যূথীর গন্ধবেদনে।

কথা ও সুর : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বরলিপি : শ্রীশৈলজারঞ্জন মজুমদার

I1 সা -রা । গা -া I গা গা । গা -া I গা গা । গা -রা I রা -া । সন্‌া -রা I
ম ০ নে ০ কি ছি ধা ০ রে খে গে ০ লে ০ চ০ ০

I সা -া । -া -া I ন্‌া -সা । রা -া I -া -া । গা রা I সা -রা । গা -া I
লে ০ ০ ০ সে ০ দি ০ ০ ন্‌ ভ রা সাঁ ০ ঝে ০

I -া -া । -া -া I গা হ্মা । গা হ্মা I পা পা । -া পা I পহ্মা -হ্মা । গা -া I
০ ০ ০ ০ যে তে যে তে দু যা ০ র হ০ ০ তে ০

I রা গা । মা -া I মা মগা । গা -রা I রা রা । সন্‌া -রা I সা -া । -া -া I
কী ভে বে ০ কি বা০ লে ০ মু খ খা০ ০ নি ০ ০ ০

I ন্‌া সা । রা -া I সা রা । গা -া I রা -গা । হ্মা -া I গা -হ্মা । পা -া I
কি ক থা ০ ছি ল যে ০ ম ০ নে ০ ম ০ নে ০

I পা -র্সা । না -ধা I পা হ্মা । গা -া I গা গা । গা -রা I রা -া । সন্‌া -রা I
ম ০ নে ০ কি ছি ধা ০ রে খে গে ০ লে ০ চ০ ০

I সা -া । -া -া I {পা গা । পা ধা I ধা -র্সা । র্সা -া I র্সাঃ -নঃ । র্সা -া I
লে ০ ০ ০ তু মি সে কি হে ০ সে ০ গে ০ লে ০

I -া -া । র্সা না I ধা -র্সা । না -া I -া -া । -া -পা I পা পনা । না নধা I
০ ০ আঁ খি কো ০ ণে ০ ০ ০ ০ ০ আ মি০ ব সে০

I ধা -পা । পা -হ্মা I গা -মা । গা -া I -া -া । গা গা I গা -া । গা গা I
ব ০ সে ০ ভা ০ বি ০ ০ ০ নি রে ক ম্‌ পি ত

I গা পা । গরা রা I সা -া । -া -া I পা গা । পা -হ্মা I ধা -া । -া -পা I
হৃ দ য়০ খা নি ০ ০ ০ তু মি আ ০ ছ ০ ০ ০

I ধা -র্রা । র্সা না I ধা -পা । -হ্মা -গা I সা -রা । গা -া I গা গা । গা -া I
দূ র্‌ ভু ব নে ০ ০ ০ ম ০ নে ০ কি ছি ধা ০

[গা গন্না। সবা-পা]

I গা গা। গা -বা I রা -া। সন্‌া -রা I সা -া। -া -া I{ গা গা। গা -া I
বে খে গে ০ লে ০ চ০ ০ লে ০ ০ ০ আ কা শে ০

I গা গা। গা -া I (গা মা। পা -মা I গা -া। -া -বসা I সা রা। রা -া I
উ ড়ি ছে ০ ব ক পাঁ ০ তি ০ ০ ০০ বে দ না ০

I বা -গা। বা -গমা I গা -া। -া -পা I পা পনা। ধা -না I পা ধা। -পা -মা)} I
আ ০ ০ ০০ মা ০ ০ র্ তা রি০ সা ০ থি ০ ০ ০

I {পা পা। গা গা I পা -ক্ষা। -ধা পা I ধর্সা র্সা। র্সা র্সা I র্সা -া। -া -া I
বা রে ক তো মা ০ ০ য্ শু০ ধা বা বে চা ০ ০ ই

I র্সা র্সা। -র্গা র্বা I র্সা -া। -া না I ধা -না। নর্সা না I ধপা -া।(-া -া)} I পা ক্ষা I
বি দা য়্ কা লে ০ ০ ০ কি ০ ব০ ল না০ ০ ০ ই সে কি

I গা ক্ষা। পা ক্ষা I গা -া। -া -া I গা -না। না নধা I ধা ধপা। পা -ক্ষা I
ব যে গে ল গো ০ ০ ০ সি ক্ ত য্০ থী ব০ গ ন্

I গা -মা। মা মা I গা -া। গা -মা I গা -বা। সা -বা I গা -া। গা গা I
ধ ০ বে দ নে ০ ম ০ নে ০ ম ০ নে ০ কি ছি

I গা -া। গা গা I গা -বা। বা -া I সন্‌া -বা। সা -া I -া -া। -া -া II II
ধা ০ বে খে গে ০ লে ০ চ০ ০ লে ০ ০ ০ ০ ০

বিশ্বভারতীর সৌজন্যে মুদ্রিত

"ঘূর্ণচক্র জনতাসংঘ"

(রবীন্দ্রনাথের একটি বাক্‌প্রতিমাগুচ্ছ)

অমলেন্দু বসু

রবীন্দ্রনাথের অনেক বাক্‌প্রতিমার মধ্যে একটি উৎসুক প্রতিমাগুচ্ছ গঠিত হয়েছে জনমণ্ডলীর ধারণা নিয়ে, কবির ঐকান্তিক নির্জন ব্যক্তি-সীমানার বাহিরে যে-কলমুখর বিস্তৃত জনসমাবেশ তার চেতনার ভিত্তিতে। এই প্রতিমাগুচ্ছের আলোচনায় তাঁর কাব্যবস্তুর এবং সম্ভবত তাঁর ব্যক্তিস্বরূপের কিছু উজ্জ্বল আভাস পাওয়া যায়।

জনমণ্ডলী সম্বন্ধে মোটামুটি দুই ধরণের মনোভঙ্গী লক্ষ্য কবি রবীন্দ্রনাথের কাব্যে—আকর্ষণ ও বিপ্রকর্ষণ। কোলাহল-উচ্চকিত জনতা কবিচিত্তকে টানে আবার ঠেলে দূরেও সরায়, জনতার সঙ্গে আপন সত্তা ও কর্ম মেলাবার জন্য তাঁর আকুলতা প্রবল আবার অন্যদিকে জনসমাবেশে তাঁর চিত্ত বিভ্রান্ত পরিশ্রান্ত হ'য়ে আত্মসম্পূর্ণ একাকীত্বের জন্য ব্যাকুল। দু'রকমের মনোভঙ্গীতেই উৎপন্ন হয়েছে জনতার প্রতিমা যদিও তাঁর কাব্যে সর্বাধিক পুনরাবৃত্তি যেসব ভাবনায়, যে সব প্রতিমায় ও উল্লেখে—আলোক, সূর্য, আকাশ, নদী, ঝরণা, নৌকা, পাড়ি, পথ, পথিক, পাখী—তাদের অন্যতম নয় জনতা-প্রতিমা, তবুও অর্থবহতায় এ-প্রতিমা অতীব মূল্যবান, বস্তুত রবীন্দ্রনাথের কাব্যবস্তুর একটি মূলসূত্র এ-প্রতিমায় বিধৃত। জনতা-প্রতিমাগুলি ক্ষণিকের উৎসার নয়, কয়েকটি ধ্রুব চিন্তার বিগ্রহ। কোন্ বিগ্রহ জনতার প্রতিমায় ও উল্লেখে?

সাহিত্যের ইতিহাসে বারবার একটি বিষয়ের প্রমাণ পাই যে প্রতিভাশালী নবীন কবির প্রথম রচনাগুলি তীব্রভাবে আত্মনিবিষ্ট। আপন ক্ষমতার, আপন উচ্ছলিত ব্যক্তিস্বরূপের আবিষ্কারে এই আত্মময়তার জন্ম। নবীন কবি আপনাতে আপনি মগ্ন ও মত্ত। যে কোনো আবিষ্কারেই মাদক নেশা, সে-নেশায় বহির্জগৎ সম্বন্ধে চেতনা অবলুপ্ত অথবা গৌণ হ'য়ে পড়ে। সে-নেশায় স্নানরত আর্কিমিডিস্ আপন নগ্নতা বিস্মৃত হ'য়ে ছুটে গিয়েছিলেন রাজপথে আর সে-অবশ বিস্ময়াবিষ্ট মোহের উল্লেখ করেছেন কীট্‌স্:

Then felt I like some watcher of the skies
    When a new planet swims into his ken;
Or like stout Cortez when with eagle eyes
    He stared at the Pacific—and all his men
Look'd at each other with a wild surmise—
    Silent, upon a peak in Darien

তারুণ্যের ধর্মে নিজেকে আবিষ্কার করার উন্মাদনা যেমন গভীর তেমনি তীব্র আর যদিও সাধারণ মানুষ এ অবস্থাটাকে জীবযাত্রার অবশ্যম্ভাবী চক্রবৃত্ত অভিজ্ঞতা জ্ঞানে কৌতূহল সম্বরণ করে, কবির সূক্ষ্ম সংবেদনশীল চিত্তে এ-আবিষ্কার এমন উত্তাল অস্থির আবেগ এনে দেয় যার জন্য "মিড্‌সামার্‌ নাইট্‌স্‌ ড্রীম্‌"-এর থিসিউস্‌ বলেছিলেন যে প্রেমিক পাগল ও কবি সমগোত্র। রবীন্দ্রনাথের প্রথম জীবনের কাব্য সম্বন্ধে কবি স্বয়ং মন্তব্য করেছেন "রবীন্দ্র-রচনাবলী"র প্রথম ভাগে "কড়ি ও কোমল" উপলক্ষে:

> যৌবন হচ্ছে জীবনে সেই ঋতুপরিবর্তনের সময় যখন ফুল ও ফসলের প্রচ্ছন্ন প্রেরণা নানাবর্ণে ও রূপে অকস্মাৎ বাহিরে প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে। কড়ি ও কোমল আমার সেই নবযৌবনের রচনা। আত্মপ্রকাশের একটা প্রবল আবেগ তখন যেন প্রথম উপলব্ধি করেছিলুম। মনে পড়ে তখনকার দিনে নিজের মনের একটা উদ্বেল অবস্থা ... এই আমার প্রথম কবিতার বই যার মধ্যে বিষয়ের বৈচিত্র্য এবং বহির্দৃষ্টি প্রবণতা দেখা দিয়েছে।

এ হেন উদ্বেল অবস্থার কাব্য স্বভাবতই আত্মমগ্ন, সব্‌জেকৃটিভ। রবীন্দ্রনাথের পরিণত কাব্যে আত্মমগ্নতার সুর উত্তাল ও প্রগল্‌ভ না হ'য়ে ধারণ করেছে আত্মস্থ প্রশান্ত রূপ। বিশেষত একেবারে শেষের কয়েকটি কাব্যগ্রন্থে তিনি বলেছেন নিজ স্মৃতির ও চিৎপ্রকৃতির কথা কিন্তু কী অপূর্ব ধ্যানসৌম্যতায় মণ্ডিত সে কথা। রবীন্দ্রনাথের সব্‌জেকৃটিভ কাব্যের ধারা যৌবনোদ্বেল অস্থিরতা থেকে সংহত প্রশান্তির দিকে আর এ-সংযমের মূলে তাঁর ক্রমবর্ধমান বহির্দৃষ্টিপ্রবণতা। মহৎ ব্যক্তিত্ব যেমন আপনাকে নিয়েই বিব্রত থাকে না, মহৎ কবিত্বও তেমন আপন চিদাকাশের বাহিরে যে-আকাশ, যে-বৃহত্তর জটিলতর বিচিত্রতর আকাশ, তার অপরিসীম সম্ভাবনায় কৌতূহলী। মহৎ কবি আত্মমগ্নতার গণ্ডী পেরিয়ে পৌঁছন জনময় জগতের চেতনায়, আপন কবিত্বশক্তির পূর্ণতর প্রস্ফুটনের জন্য, প্রশস্ততর ও বলিষ্ঠতর পরিবেশ খোঁজার প্রয়োজনে। আর তা' ছাড়া যেহেতু কোনো মানুষ একা জীবনযাপন করে

না, যেহেতু অপরাপর আরো মানুষের সঙ্গে, মনুষ্যসমাজের সঙ্গে আপন আচরণ ও ধ্যানধারণার সঙ্গতিস্থাপন করতেই হয়, সেজন্য প্রত্যেক সৎ কবির চিন্তায় ও রচনায় জনজগতের প্রভাব বিদ্যমান। জনজগতের চেতনায় প্রধান হয় বহির্দৃষ্টিপ্রবণতার। কবি যেন আপন ব্যক্তিত্বের ও আবেগের নিভৃত খোলশ ছেড়ে বাইরে এলেন, যেন ডাঁশা ফল উঠল পেকে, যেন আঁকাবাঁকা কোণওয়ালা একটা চৌহদ্দি সুঠাম বৃত্তরূপ পেল। আপন ও বাহিরের সঙ্গতিসাধনে ব্যক্তির ও শিল্পীর পরিণতি।

২

জনতা-চেতনা ও নির্জনতা-চেতনা, দু'টি মনোভঙ্গী যে রবীন্দ্রনাথের কাব্যে জড়িয়ে আছে তার নিদর্শন স্বরূপ কয়েকটি ছত্র তুলে' ধরছি :

ক। মানসী, 'বর্ষার দিনে' : সমাজ সংসার মিছে সব,
মিছে এ জীবনের কলরব।

গীতবিতান, ৫৫২ পৃঃ : হাটের ধুলা সয় না যে আর, কাতর করে প্রাণ।
তোমার সুর-সুরধুনীর ধারায় করাও আমায় স্নান॥

„ ৫৫২ পৃঃ : তোর গোপন প্রাণের একলা মানুষ যে
তারে কাজের পাকে জড়িয়ে রাখিস্ নে।
তার একলা ঘরের যেখান হ'তে
উঠুক-না গান নানা স্রোতে,
তার আপন সুরের ভুবন-মাঝে তারে থাকতে দে॥

খ। গীতবিতান, ১৪৮ পৃঃ : আপন হ'তে বাহির হ'য়ে বাইরে দাঁড়া,
বুকের মাঝে বিশ্বলোকের পাবি সাড়া।

„ ১৫৩ পৃঃ : কেবলি তোমার স্তবে নয়, শুধু সংগীতরবে নয়
শুধু নির্জনে ধ্যানের আসনে নহে,
তব সংসার যেথা জাগ্রত রহে,
কর্মে যেথায় তোমারে স্বীকার করিব হে।

„ ৫১ পৃঃ : যুক্ত করো হে সবার সঙ্গে, মুক্ত করো হে বন্ধ।

জনবহুল কলরব, ধূলি-ধূসরিত হট্টগোল থেকে দূরে সরে' গিয়ে নিভৃতে সুরলোক সৃষ্টির জন্য কবিপ্রাণ একদিকে ব্যাকুল, অন্যদিকে জনসঙ্গমে যুক্ত

হওয়ার, জাগ্রত চঞ্চল বিশ্বসমাজের সঙ্গে একাত্ম হওয়ার প্রয়াসী। সহসা মনে হয় এই দুই মনোভঙ্গী পরস্পর-বিরোধী আর এহেন স্বতন্ত্র মনোভঙ্গী কাব্যের ইতিহাসে আদৌ বিরল নয়, কিন্তু রবীন্দ্রনাথে বস্তুত দুই মনোভঙ্গীতে মিলে গঠিত হয়েছে এক অখণ্ড কবিসত্তা। পরস্পর-বিরোধী নয় দুই মনোভঙ্গী, একে অন্যের সম্পূরক, যে অবস্থাকে কবি নিজেই বলেছেন "নির্জন সজনের নিত্য সঙ্গম" (রবীন্দ্র রচনাবলী, তৃতীয় খণ্ডের সূচনা)। রবীন্দ্রনাথ তো শুধু নির্জনতার কবি নন, শুধু জনতামুগ্ধ কবিও নন। জীবনস্মৃতিতে তিনি "মানসী" পর্বে নিজ কবিচিত্তের অভিব্যক্তি সম্বন্ধে লিখেছেন : "জীবনে এখন ঘরের ও পরের, অন্তরের ও বাহিরের মেলামেশির দিন ক্রমে ঘনিষ্ঠ হইয়া আসিতেছে। এখন হইতে জীবনের যাত্রা ক্রমশই ডাঙ্গার পথ বাহিয়া লোকালয়ের ভিতর দিয়া যে সমস্ত ভালোমন্দ সুখদুঃখের বন্ধুরতার মধ্যে গিয়া উত্তীর্ণ হইবে তাহাকে কেবলমাত্র ছবির মতো করিয়া হাল্কা করিয়া দেখা আর চলে না। এখানে কত ভাঙ্গাগড়া, কত জয়পরাজয়, কত সংঘাত ও সম্মিলন।" এই ঘনিষ্ঠ অবিভক্ত কবিসত্তার নিদর্শন হিসাবেই জনতা-প্রতিমাগুলির মূল্য অপরিসীম।

৩

জনতার উল্লেখ রবীন্দ্রনাথে সর্বত্র যে একই ধরণের অর্থ বহন করেছে অথবা তাঁর কাব্যের প্রথম থেকে শেষ অবধি একই আবেগ থেকে উৎসারিত হয়েছে এমন নয়। আবেগ বা মনোভঙ্গীর প্রকারভেদ অনুসারে উল্লেখগুলিকে কয়েকটি শ্রেণীতে পর্যায়িত করা বোধহয় অসঙ্গত হবে না।

কতকগুলি উল্লেখ ও প্রতিমা পাচ্ছি তাতে আত্মস্বরূপের বাহিরকার মানব সমাজ সম্বন্ধে চেতনা সূচিত হয়েছে। দৃষ্টান্ত লক্ষ্য করুন :—

কড়ি ও কোমল "যোগিয়া" : এমন কত না প্রাতে চাহিয়া আকাশ পাতে
কত লোক ফেলেছে নিশ্বাস।

" "ভবিষ্যতের রঙ্গভূমি" : দূর হ'তে আসিতেছে, শুন কান পেতে—
কত গান, সেই মহা-রঙ্গভূমি হ'তে।

" "মানব হৃদয়ের বাসনা" : নিশীথে রয়েছি জেগে, দেখি অনিমিখে,
লক্ষ হৃদয়ের সাধ শূন্যে উড়ে যায়।

মানসী, "নিষ্ফল কামনা" : এ অসীম জগৎ-জনতা,

এ নিবিড় আলো অন্ধকার,
কোটি ছায়াপথ, মায়াপথ,
দুর্গম উদয় অস্তাচল।

সোনার তরী, "পুরস্কার" : বহু মানবের প্রেম দিয়ে ঢাকা,
বহু দিবসের সুখে দুখে আঁকা,
লক্ষ যুগের সংগীতে মাখা
সুন্দর ধরাতল।

শেষ সপ্তক, "পঁচিশে বৈশাখ" : সেদিন পঁচিশে বৈশাখ
আমাকে আনল ডেকে
বন্ধুর পথ দিয়ে
তরঙ্গমন্দ্রিত জনসমুদ্রতীরে।

সেঁজুতি, "ঘরছাড়া" : পথিক চলিল একা
অচেতন অসংখ্যের মাঝে।

" "স্মরণ" : বাসা যার ছিল ঢাকা জনতার পারে,
ভাষাহারাদের সাথে মিল যার।

বহু দৃষ্টান্ত অনাবশ্যক কেননা এই কয়টিতেই প্রমাণ পাওয়া যায় যে অপরিণত কাব্য থেকে শুরু ক'রে শিল্পঘন কাব্য অবধি বারংবার একটি চেতনা প্রকাশ পেয়েছে—অসংখ্য জনপূর্ণ বিশাল স্তনিত বহির্জগতের চেতনা। সে জগৎ সম্বন্ধে কবির চির অক্ষুণ্ণ বিস্ময় বস্তুত আবিষ্কারের বিস্ময়। ইংরেজিতে যাকে বলা হয় macrocosm এবং microcosm এর চেতনা, যে চেতনা থেকে অনেক এলিজাবেথীয় ও সতেরো শতকী সুন্দর কবিতার উদ্ভব হয়েছিল, ঐকান্তিক নিভৃত সত্তার ও বহিঃস্থিত ভূমার চেতনা, সেই দ্বিরূপ অথচ আসলে অদ্বৈত চেতনার অখণ্ড রূপ প্রতিভাত হয়েছে জনতা-প্রতিমায়। এ চেতনায় বিস্ময় যে পরিমাণে, বিভ্রান্তি তার চেয়ে কম নয় কেন না কবির সহজাত স্পর্শভীরুতা যেন জনতার পরুষ রূঢ়তার সম্মুখে সন্ত্রস্ত।

বলাকা, "দান" : এ দীপের আলো, এ যে নিরালা কোণের—
স্তব্ধ ভবনের।

তোমার চলার পথে এরে নিতে চাও জনতায়?

হয়তো এই জনতা ভীরু আত্মসঙ্কুচিত চিত্তের বেদনাকেই কবি বিবরাশ্রয়ী

কল্পনায় রূপায়িত করেছেন তাঁর অনেক কবিতার প্রকাশ-পরাঙ্মুখ নারীর উক্তিতে। স্পর্শকাতরতার দরুন কবি বলেন,

কড়ি ও কোমল, "স্বপ্নরুদ্ধ" : আমি গাঁথি আপনার চরিদিক ঘিরে
সূক্ষ্ম রেশমের জাল কীটের মতন।
মগ্ন থাকি আপনার মধুর তিমিরে,
দেখিনা এ জগতের প্রকাণ্ড জীবন।

আর যদিও বা জগতের প্রকাণ্ড জীবনের সঙ্গে তিনি আপনাকে মেলাবার চেষ্টা করেন, ফল অনেক সময় বিভ্রম, অশান্তি, সাম্যচ্যুতি। বহির্জগতের বিশালতায় বিভ্রম ও অস্থিরতার কয়েকটি দৃষ্টান্ত পেশ করছি :—

কড়ি ও কোমল, "পত্র" এই শস্তি-সলিলেতে দিয়েছিলেম ডুব
হট্টগোলটা ভুলেছিলেম সুখে ছিলেম খুব।

" "বিরহীর পত্র" : এত লোক, এত জন, এত পথ গলি,
এমন বিপুল এ সংসার
ভয়ে ভয়ে হাতে হাতে বেঁধে বেঁধে চলি,
ছাড়া পেলে কে আর কাহার।

" "মঙ্গল-গীত" : শুনো না কাহারা ওই করে কানাকানি
অতি তুচ্ছ ছোটো ছোটো কথা
পরের হৃদয় ল'য়ে করে টানাটানি
শকুনির মতো নির্মমতা।
শুনো না করিছে কারা কথা কাটাকাটি
মাতিয়া জ্ঞানের অভিমানে,
রসনায় রসনায় ঘোর লাঠালাঠি,
আপনার বুদ্ধিরে বাখানে।

" "মঙ্গল-গীত (২)" : চারিদিকে তর্ক উঠে সাঙ্গ নাহি হয়,
কথায় কথায় বাড়ে কথা।
সংশয়ের উপরেতে চাপিছে সংশয়
কেবলি বাড়িছে ব্যাকুলতা।

" "বিজনে" : মানবের মাঝে গেলে এ যে ছাড়া পায়,
সহস্রের কোলাহলে হয় পথহারা।

কণিকা, "কবির বয়স" : ওই রে নগরী, জনতারণ্য—শত রাজপথ, গৃহ অগণ্য,
কতই বিপণি কতই পণ্য, কত কোলাহল কাকলি।
কত-না অর্থ কত অনর্থ আবিল করেছে স্বর্গমর্ত,
তপনতপ্ত ধূলি-আবর্ত উঠিছে শূন্য আকুলি।

জনতা তাহ'লে অনেক সময় বিভ্রম ও বিমোহের দিকে। জনতা-চেতনা কখন কী ভাবে প্রকাশ পেয়েছে, রবীন্দ্রনাথের আদ্যোপান্ত সমস্ত কবিতা পড়ে' তেমন গবেষণা-সম্মত তালিকা আমি প্রস্তুত করিনি তবুও সতর্ক দৃষ্টিতে দেখতে পাই যে জনতা-চিন্তনের দরুন বিভ্রম ও সংশয় তাঁর শেষদিককার কাব্যে নিতান্ত বিরল। 'কড়ি ও কোমল' থেকে 'খেয়া' অবধি যেন কবি দোটানায় থেকেছেন, নির্জন ও সজনের নিত্যসঙ্গম তখনো সাধিত হয়নি এবং দুটি বিপরীত মনোভঙ্গী প্রবল থেকেছে। আমার বিবেচনায় যে নিত্যসঙ্গম সাধিত হয়েছিল 'গোরা' রচনাকালে, সে কালেই ব্যপ্তি ও ভূমার যথার্থ সমন্বয় ঘটেছিল কবিচিত্তে। জনতা-চিন্তনের ফলে শিল্পসাধ্য আবেগে বিপরীত মনোভঙ্গীর সৃষ্টি হয়েছে এমন দৃষ্টান্ত পরবর্তী কাব্যে বড় একটা পাচ্ছিনা যদিও পাশবিক শক্তির প্রতিমা-হিসাবে জনতার উল্লেখ সেঁজুতির "জন্মদিনে" কবিতায় অবিস্মরণীয় :

ক্ষুব্ধ যারা, লুব্ধ যারা,
মাংসগন্ধে মুগ্ধ যারা, একান্ত আত্মার দৃষ্টিহারা
শ্মশানের প্রান্তচর, আবর্জনাকুণ্ড তব ঘেরি
বীভৎস চীৎকারে তারা রাত্রিদিন করে ফেরাফেরি—
নির্লজ্জ হিংসায় করে হানাহানি।
শুধু তাই আজি
মানুষ-জন্তুর হুহুংকার দিকে দিকে উঠে বাজি।

জনতার কোলাহল ও রূঢ়তার আঘাত আসলে কবির আদর্শপরায়ণ চিত্তে আঘাত। কবি তাঁর "আলোচনা" নামক গদ্যপ্রবন্ধগুলিতে অন্তর্বিষয়ী সাধনা ও বহির্বিষয়ী কর্মসাধনা, এই যে দু'রকম সাধনার সম্পৃক্ত অখণ্ড আইডিয়ার উল্লেখ করেছেন, সে-সাধনার অন্তরের উপলব্ধি কর্মান্বিত হয়। সংসারের স্থূল কর্কশ অনমনীয়তায় আদর্শবাদীর পরিচ্ছন্ন সূক্ষ্ম কর্মপ্রয়াস যে ক্লিষ্ট ও ব্যথিত হয় সেকথার বহু উদাহরণ মেলে ইতিহাসে। আদর্শ ও বাস্তবের চিরন্তন

বিরোধের বেদনাই মূর্ত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের অনেক জনতা-প্রতিমায়। ইংরেজ কবি শেলির রচনায় এহেন দোটানার অনেক দৃষ্টান্ত মেলে। একদিকে শেলির চিত্ত জনজীবনে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য ব্যাকুল, সমাজ উন্নয়নের জন্য উন্মুখ ও কৃতসঙ্কল্প, অন্যদিকে তাঁর আহত চিত্ত নিঃসঙ্গ অসহায় বেদনাবিহ্বল। রবীন্দ্রনাথে আদর্শবাদের নিষ্ঠা আছে, নিছক ভাববিলাস নেই। উত্তুঙ্গ ভাবপ্রত্যয়ী শিল্পের সঙ্গে নিরলস সংগঠনী কর্মশক্তির সমান্তরাল বিকাশে তাঁর ব্যক্তিত্বের অনন্য ঐশ্বর্য। জনতায় তাঁর ব্যথিত চিত্তের প্রতিমা, আবার তাঁর বলিষ্ঠ কর্মাদর্শের প্রতিমাও। নিচের দৃষ্টান্ত কয়টিতে নিভৃত আত্মস্বরূপকে জনজগতের সঙ্গে মিলিয়ে কর্মেচ্ছা সার্থক করার ব্যগ্রতা :

সোনার তরী, "বসুন্ধরা" : ডাকে যেন মোরে
অব্যক্ত আহ্বানরবে শতবার ক'রে
সমস্ত ভুবন। সে বিচিত্র সে বৃহৎ
খেলাঘর হতে মিশ্রিত মর্মররৎ
শুনিবারে পাই যেন চিরদিনকার
সঙ্গীদের লক্ষবিধ আনন্দ খেলার
পরিচিত রব।

চিত্রা, "এবার ফিরাও মোরে" :

কী গাহিবে, কী শুনাবে। বলো, মিথ্যা আপনার সুখ,
মিথ্যা আপনার দুঃখ। স্বার্থমগ্ন যে জন বিমুখ
বৃহৎ জগৎ হতে সে কখনো শেখেনি বাঁচিতে।
মহাবিশ্বজীবনের তরঙ্গেতে নাচিতে নাচিতে
নির্ভয়ে ছুটিতে হবে সত্যেরে করিয়া ধ্রুবতারা।

গীতবিতান, ১৪১ পৃঃ : আমার মুক্তি সর্বজনের মনের মাঝে,
দুঃখবিপদ-তুচ্ছ-করা কঠিন কাজে।

" ২৫৩ পৃঃ : লউক বিশ্বকর্মভার মিলি সবার সাথে।

" ৫৮৯ পৃঃ : আর্তের ক্রন্দনে হেরো ব্যথিত বসুন্ধরা,
অন্যায়ের আক্রমণে বিষবাণে জর্জরা,
প্রবলের উৎপীড়নে ॥

কড়ি ও কোমল, "মঙ্গল-গীত" (১) : যাত্রা করি মানবের হৃদয়ের মাঝে

প্রাণে লয়ে প্রেমের আলোক,
আয় মা গো যাত্রা করি জগতের কাজে
তুচ্ছ করি নিজ দুঃখ-শোক।

"মরীচিকা" : চলো গিয়ে থাকি দোঁহে মানবের সাথে,
সুখ-দুঃখ লয়ে সবে গাঁথিছে আলয়,
হাসি-কান্না ভাগ করি ধরি হাতে হাত
সংসার-সংশয়রাত্রি রহিব নির্ভয়।

সমাজের দুঃখী, উৎপীড়িত ও অপমানিত লোকদের সঙ্গে সমব্যথী হওয়ার এই সদিচ্ছায় ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথের মহানুভবত্ব অবশ্য প্রকাশ পেয়েছে কিন্তু শিল্পকর্মের প্রেরণা হিসাবে এ-আবেগের ততখানিই মূল্য যতটা অন্য অনেক আবেগের, বিশেষত এর বিপরীত আবেগের অর্থাৎ কর্মব্যাহত কর্মক্লান্ত চিত্তের পলায়নী আবেগের। সুন্দর কাব্য উৎসারিত হয়েছে দু'রকম আবেগ থেকেই, অতএব দু'রকম আবেগই সার্থক শিল্পবস্তু। এ-প্রবন্ধে আমরা লক্ষ্য করছি যে সমাজের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার অথবা সমাজ থেকে বিযুক্ত হওয়ার ইচ্ছা, কর্মৈষণা অথবা পলায়নী স্পৃহা, চিত্তের প্রসারণ অথবা সঙ্কোচন, এসব বিপরীত আবেগ এবং তাদের সূক্ষ্ম বিভূতিগুলি কবির কল্পনায় একই নাভিকেন্দ্রস্থ বাক্‌প্রতিমায় বিধৃত হয়েছে, জনতার প্রতিমায়। এ কারণেই রবীন্দ্রনাথের কাব্য আলোচনায় জনতা-প্রতিমার বিচার একান্ত আবশ্যক। লক্ষ্য করা দরকার যে জনতার ভাবনা সব সময় কবিচিত্তে মাত্র একটি প্রতিমারই রূপ নেয়নি, তার ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপ অনেক রকম। "বসুন্ধরা"তে বৃহত্তর জীবনের সঙ্গে আপনাকে মিলিয়ে দেবার প্রেরণা রূপ গ্রহণ করেছে আহ্বানের, তার রূপ ধ্বনি-সংবেদী। জনতা তাঁকে ডাকে, সে-ডাকে তাঁকে সাড়া দিতে হয়। আবার "এবার ফিরাও মোরে" কবিতায় দৃশ্যেন্দ্রিয় ও স্পর্শেন্দ্রিয় উদ্বুদ্ধ হয়েছে জনতার ভাবনায়—আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে ধ্রুবতারার দিকে ধাবমান তরঙ্গোৎক্ষিপ্ত তরণীর দৃশ্য, আমরা যেন নৃত্যের স্পর্শবোধ অনুভব করি।

জনতা-চেতনা যেমন অনেক সময় কর্মসঙ্কল্পে রূপায়িত হয়েছে তেমন উদ্রিক্ত হয়েছে অন্য মনোভঙ্গীতে, একটা আকস্মিক প্রসারবোধে। বলা যায় এ-মনোভঙ্গী সঙ্কল্পের পূর্ববর্তী প্রকাশ, কবি শুধু আপন সংবেদনায় ব্যাপ্তি ও

বিস্তার অনুভব করেছেন কিন্তু তাঁর সংবেদনা এখনো কোনো সুষ্ঠু সঙ্কল্পে পরিণত হয়নি। জনতার চেতনা যেন কবিকে নিয়ে যাচ্ছে প্রশস্ততর উজ্জ্বলতর জীবনবীক্ষায়। কবি যেই জানলেন যে নিভৃত আত্মস্বরূপের বাইরে বিরাজ করছে প্রকাণ্ড জনজীবন আর সেই প্রকাণ্ড জনজীবনের সঙ্গে আপনাকে মেলাতে পারলে তাঁর আত্মস্বরূপও হবে বিশাল ও মহৎ, তখন অপূর্ব উন্মাদনা জাগল তাঁর চিত্তে। আত্মার ও আবেগের এই যে-প্রসারণ তিনি বোধ করেছেন তার অনেক উদাহরণ পাওয়া যায় কবিতায় ও গানে।

কড়ি ও কোমল, "আহ্বান-গীত" : কেন আছি শুয়ে, কেন আছি চেয়ে,
পড়ে আছি মুখোমুখী,
মানবের স্রোত চলে গান গেয়ে,
জগতের সুখে সুখী।
চলো দিবালোকে, চলো লোকালয়ে,
চলো জনকোলাহলে—
মিশাব হৃদয় মানব-হৃদয়ে
অসীম আকাশ তলে।

উৎসর্গ, "প্রবাসী" : বিশাল বিশ্বে চারিদিক হ'তে প্রতি কণা মোরে টানিছে।
আমার দুয়ারে নিখিল জগৎ শতকোটি কর হানিছে।

চিত্রা, "নগরসংগীত" : ঘূর্ণচক্র জনতাসংঘ, বন্ধনহীন মহা-আসঙ্গ,
তারি মাঝে আমি করিব ভঙ্গ আপন গোপন স্বপনে।

গীতবিতান, ১২৭ পৃঃ : বিশ্বজনের পায়ের তলায় ধূলিময় যে-ভূমি
সেই তো স্বর্গভূমি।
সবায় নিয়ে সবার মাঝে লুকিয়ে আছ তুমি
সেই তো আমার তুমি।

" ১৫৩ পৃঃ : মোরে ডাকি লয়ে যাও মুক্তদ্বারে তোমার বিশ্বের সভাতে
আজি এ মঙ্গলপ্রভাতে।

" ৫৬৭ পৃঃ : ভাঙো বাঁধ ভেঙে দাও বাঁধ ভেঙে দাও, বাঁধ ভেঙে দাও।
বন্দী প্রাণমন হোক উধাও॥
শুকনো গাঙে আসুক
জীবনের বন্যার উদ্দাম কৌতুক।

,, ৭৮২ পৃঃ : বিশ্বজগৎ আমারে মাগিলে কে মোর আত্মপর।
আমার বিধাতা আমাতে জাগিলে কোথায় আমার ঘর।
কিসেরই বা সুখ, ক'দিনের প্রাণ।
ওই উঠিয়াছে সংগ্রামগান,
অমর মরণ রক্তচরণ নাচিছে সগৌরবে।
সময় হয়েছে নিকট এখন বাঁধন ছিঁড়িতে হবে।

এসব উদ্ধৃতিতে ও ঠিক এদেরই পূর্বের উদ্ধৃতিগুলিতে সংবেদনার প্রভেদ খুব প্রকট নয় বরং সূক্ষ্ম। এখনকার উদ্ধৃতিগুলিতে কবিচিত্ত আত্মকেন্দ্রের বাইরে আসার প্রয়াসী, বহির্জগৎ যেন একটা মুক্তির উল্লাসের প্রতীক, একটা অ-স্থিত নিয়ত-চলমান অবোধ্য প্রাণপ্রাচুর্যের প্রতীক। ইতিপূর্বে "বসুন্ধরা" ইত্যাদি কবিতা ও গান থেকে যেসব ছত্রের উল্লেখ করেছি সেসবে এই মুক্তির অনাত্মকেন্দ্র উল্লাস আরো এগিয়েছে, শুধু উল্লাসেই কবিচিত্ত সীমায়িত থাকে নি, উল্লাস সংস্থিত হয়েছে একটি আধারে—সামাজিক কর্মৈষণার আধারে। সেই সংস্থিত শক্তির পূর্বের স্তর এখনকার উদ্ধৃতিগুলিতে। এখন কবির সংবেদনা প্রসারিত হচ্ছে, বিশ্বগ্রাহী বিস্তার লাভ করছে, সে-বিস্তারের বোধ জন্মেছে জনতা-চেতনা থেকে। আর এই বিস্তারবোধ মানে বন্ধন থেকে মুক্তি, সঙ্কীর্ণায়তন আত্মস্বরূপ থেকে বিশ্বস্বরূপে মুক্তি। লক্ষ্য করি যে যেসব ক্রিয়াপদ অথবা বাক্প্রতিমা এখানে প্রযুক্ত হয়েছে সেগুলিতে প্রবল প্রাণের সূচনা। ক্রিয়াপদ মাত্রেই কোনো না কোনো রকম ক্রিয়া বোঝায় এ-তো মামুলি কথা কিন্তু সব ক্রিয়াপদেই সমমূল্যের ক্রিয়া বোঝায় না। বলা যায় কতকগুলি ক্রিয়া যেন নিষ্ক্রিয় ক্রিয়া, কতকগুলি সক্রিয়। এ-তারতম্য অবশ্য আপেক্ষিক, কোনো একটি ক্রিয়ার তুলনায় আরেকটি ক্রিয়া নিষ্ক্রিয় অথবা সক্রিয়। "আমি তাকাই, আমি ঘুমাই," এসব ক্রিয়ায় যে-কাজ সূচিত হয় সে-কাজের চেয়ে বেশি এনার্জি, বেশি উদ্যম সূচিত হয় "আমি হাসি, আমি দৌড়ই" এসব ক্রিয়াপদে। (এ-প্রসঙ্গে বলতে পারি যে কবিদের ব্যবহৃত ক্রিয়াপদ ও বিশেষণ পদের অধ্যয়নে ও বিশ্লেষণে কবিকর্মের কয়েকটি উৎসুক বৈশিষ্ট্য লক্ষ্যসাধ্য হয়।) উপরে উদ্ধৃত কাব্যাংশগুলিতে ব্যবহৃত ক্রিয়াপদ লক্ষ্য করুন :—মানবের স্রোত চলে, চলো দিবালোকে, মিশার হৃদয়; টানিছে, হানিছে, করিব জয়, ডাকি লয়ে যাও, বাঁধ ভেঙে দাও, শুকনো গাঙে আসুক জীবনের

বন্যা, ওই উঠিয়াছে সংগ্রামগান, রক্তচরণ নাচিছে, বাঁধন ছিঁড়িতে হবে।

জনতার ভাবনায় কবিচিত্তে মুক্তি, বীর্য, উল্লাস।

৪

জনতা-চেতনায় কবিচিত্তে যেসব বিভিন্ন আবেগের উদ্রেক হয়েছে তার অধিকাংশই "শিশুতীর্থ" নামক কবিতায় স্থান পেয়েছে যেন বহুবর্ণ উপলখণ্ডের সমাবেশে। বহির্দৃষ্টি-প্রবণতা, জগতের বিশালতাবোধ, গণপ্রকৃতির বিক্ষুব্ধ সংশয়, মুক্তির প্রয়াস, অনেক রূপক প্রতীকের মধ্য দিয়ে এ-কবিতায় উপস্থিত।

কবিতাটিতে একদল যাত্রীর কথা। কবি-কল্পনায় জনতার উচ্চণ্ড কলরব যেন বন্দী বন্যা-বারির গুহা-বিদারণের কলরোল, প্রাণপ্রবল শক্তির বিস্ফোরণ, কেননা এই কলরবের তুলনা দেওয়া হয়েছে ঘূর্ণ্যতাণ্ডবী উন্মাদ সাধকের মন্ত্রোচ্চারণ আর দাবাগ্নিবেষ্টিত মহারণ্যের প্রলয়-নিনাদের সঙ্গে। এই জনতায় আবার প্রতিফলিত হয়েছে জনপ্রকৃতির কুৎসিত অঙ্গগুলি :

> যেন অগ্নিগিরিনিঃসৃত গদগদ-কলমুখর পঙ্কস্রোত,
>
> তাতে একত্রে মিলেচে পরশ্রীকাতরের কানাকানি, কুৎসিত জনশ্রুতি,
>
> অবজ্ঞার কর্কশ হাস্য।

জনতা এখানে যেন স্রোত—প্রাণশক্তির প্রতীক—আর সে-স্রোত ধ্বনিমুখর কিন্তু পঙ্কেরই স্রোত। জনতার এই ভাবনায় সূচিত হয়েছে mobile vulgus অর্থাৎ mob নামধেয় পশুবৃত্তিসম্পন্ন সহজে-উত্তেজিত মত্ত জনগণেশের কল্পনা। ভাবানুষঙ্গে এর পরেই পাই আরেকটি উপমা :

> সেখানে মানুষগুলো সব ইতিহাসের ছেঁড়া পাতার মতো
>
> ইতস্তত ঘুরে বেড়াচ্চে।

অর্থাৎ জনতা-প্রাণের এই আপাত প্রাবল্য বস্তুত নিরর্থক নির্বিচার বেগপিণ্ড মাত্র। তাই ভক্ত যখন ঘোষণা করেন "মানবকে মহান বলে জেনো", জনগণেশ শোনেনা, বলে, "পশুশক্তিই আদ্যাশক্তি, বলে পশুই শাশ্বত।" এই পশুশক্তিরই রূপক অবলম্বনে কবি "জন্মদিনে" কবিতায় লিখেছেন 'মানুষ-জন্তুর হুহুংকার দিকে দিকে উঠে বাজি।'

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের জনতা তো কেবল পশুশক্তির প্রতীক নয়, তার সংজ্ঞায় আরো অর্থ বিধৃত। জনতা শ্রদ্ধাশীল, প্রগতিশীল, জনতার শক্তি মিলিত শক্তি, ভ্রাতৃশক্তি। তাই কানে কানে-বলা মৃদু ডাক যখন এলো, "চলো

সার্থকতার তীর্থে”,

এই বাণী জনতার কণ্ঠে কণ্ঠে মিলিত হয়ে
একটি মহৎ প্রেরণায় বেগবান হয়ে উঠ্‌ল।

* * *

সবাই বলে উঠ্‌ল, “ভাই, আমরা তোমার বন্দনা করি।”

ভ্রাতৃত্ববোধের বন্ধনে মিলবে তাদের মুক্তি, পশুশক্তির ঊর্দ্ধে উঠে তারা হবে সার্থকতার তীর্থযাত্রী। কবিতাটির চতুর্থ অনুচ্ছেদে জনতার অন্য বৈশিষ্ট্যের অবতারণা হয়েছে—তার বিস্তার ও বৈচিত্র্য। এ-অনুচ্ছেদে যাত্রী-জনতার বর্ণনা। কত দেশ থেকে এসেছে যাত্রীরা, “সমুদ্র পেরিয়ে, পর্বত ডিঙিয়ে, পথহীন প্রান্তর উত্তীর্ণ হয়ে”, শুধু দূর থেকে তারা আসেনি, এসেছে দুর্গম পথ বেয়ে। দুর্বার প্রগতির প্রতীক তারা, দৃঢ়কাম সার্থকতার অভিযাত্রী। তারা বিচিত্র তাদের বাহনে ও চলনে—কেউ এসেছে পায়ে হেঁটে, কেউ বা উটে বা ঘোড়ায় বা হাতীতে চড়ে’। তারা বিচিত্র তাদের বেশে ও প্রসাধনে—ভিক্ষু এসেছে ছেঁড়া কাঁথা জড়িয়ে, রাজ-অমাত্যের বেশ স্বর্ণ-লাঞ্ছণ-খচিত। চলেছে কত মাতা, কুমারী, কত বধূ, আবার অতি-প্রকট প্রসাধনশোভিনী বেশ্যাও চলেছে সেই সঙ্গে। চলেছে পঙ্গু-খঞ্জ ও অন্ধ আতুর, আর চলেছে সাধুবেশী ধর্মব্যবসায়ী। (মনে পড়ে ইংরেজ কবি চসর্‌-বর্ণিত তীর্থযাত্রীদের কথা।) এই বিচিত্র মিছিলের বৈচিত্র্য আরো বেড়েছে বিপরীতের সমাবেশে :—নারীর কল্যাণী মূর্তি, নারীর স্বৈরিণী মূর্তি, অসহায় দরিদ্র ও ধনমত্ত রাজপুরুষ, দৈবকৃপাকামী বিশ্বাসমুগ্ধ আতুর ও ধর্মব্যবসায়ী শঠ, তরুণ এবং জরা-জর্জর, পৃথিবী শাসন করে যারা আর যারা অর্দ্ধাশনের মূল্যে মাটি চাষ করে।

জনতার গতি লক্ষণীয়। একাকী মানুষ যখন খুশি চলতে পারে, থামতেও পারে যখন খুশি। কিন্তু জনতার চলায় যে সার্বিক বেগভার, যে-সম্মিলিত মোমেণ্টাম্, ব্যক্তিবিশেষের ইচ্ছা বা অনিচ্ছার চেয়ে তা’ অনেক বড়, মিছিলে চলা প্রতিটি ব্যক্তিবিশেষকে চলতে হয় জনতার পদক্ষেপ-ছন্দে।

তাদের ভ্রূ কুটিল হয়, কিন্তু ফিরতে পারেনা,
চলমান জনপিণ্ডের বেগ এবং অনতিব্যক্ত আশার তাড়না
তাদের ঠেলে নিয়ে যায়।

জনতার আরেক বৈশিষ্ট্য তার সংক্রামক আবেগ আর তার আকস্মিক বিস্ফোরণ।

জনতার মধ্যে কে একজন হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠে
অধিনেতার দিকে আঙুল তুলে বল্‌লে,
"মিথ্যাবাদী, আমাদের প্রবঞ্চণা করেচ।"
ভর্ৎসনা এক কণ্ঠ থেকে আরেক কণ্ঠে উদগ্র হতে থাকল।
তীব্র হল মেয়েদের বিদ্বেষ, প্রবল হল পুরুষদের তর্জন।
অবশেষে একজন সাহসিক উঠে দাঁড়িয়ে
হঠাৎ তাকে মারলে প্রচণ্ড বেগে।
অন্ধকারে তার মুখ দেখা গেল না।
একজনের পর একজন উঠ্‌ল, আঘাতের পর আঘাত করলে,
তার প্রাণহীন দেহ মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

একটা অতুলন নাটকীয় দ্রুততায় আমরা পৌঁছলাম ঘটনা-শীর্ষে। মুহূর্তের স্তিমিতদৃষ্টি সম্পন্ন, বিচারহীন, চণ্ডস্বভাব জনতার প্রতিমা কবিতাটির এই ষষ্ঠ অনুচ্ছেদে। যে মহৎ মিলন-সম্ভাবনা গণশক্তিতে বিদ্যমান, যে-মিলিত অনুশীলিত প্রযাসে আদর্শের সার্থকতা তাদের সাধ্যায়ত্ত, একটা আদিম সংশয়-ক্ষিপ্ত পশুশক্তির আকস্মিক উত্তেজনায় সে-সম্ভাবনা অনর্থে পরিণত হয়।

সপ্তম অনুচ্ছেদে জনতাচিত্তের আরো যে একটি দিক দেখানো হয়েছে তার সঙ্গে তুলনীয় বর্ণনা সাহিত্যে নিতান্তই দুর্লভ। জনতা-প্রকৃতিতে যে বিপরীত সমাবেশের কথা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি তারই অপূর্ব দৃষ্টান্ত এখানে। তাদের অধিনেতাকে তারা খুন করেছে, খুনের দায়িত্ব কারুর একার নয়, সকলের। সেই চণ্ডকর্মের অবসানে এখন তারা অভিভূত। দৃঢ়প্রত্যয়হীন তাদের চিত্ত এখন পাপের প্রতিক্রিয়ায় শঙ্কাবিকল। পাপের দায়িত্ব নিজ তরফ থেকে অন্য তরফে ঠেলে দেওয়ার চেষ্টায় ব্যস্ত প্রত্যেকেই আর সে চেষ্টার ফল তর্জন, গর্জন, বদমেজাজ। এর পরেই ঘটনার পটভূমি বদলে গেল চকিতে :

সূর্যরশ্মির তর্জনী এসে স্পর্শ করল
রক্তাক্ত মৃত মানুষের শান্ত ললাট।
মেয়েরা ডাক ছেড়ে কেঁদে উঠল, পুরুষেরা মুখ ঢাকল দুই হাতে।
কেউ বা অলক্ষিতে পালিয়ে যেতে চায়, পারে না;
অপরাধের শৃঙ্খলে আপন বলির কাছে তারা বাঁধা।

আপন বলির কাছে তারা বাঁধা কিন্তু সবাই একই বলির কাছে বাঁধা। সেই বলির রাখীবন্ধনে তারা সবাই মিলে এক জনতা, তাদের চিত্ত এক, কর্ম এক, লক্ষ্য এক, তারা কেউ ব্যক্তি নয়, তারা সমষ্টি, আর এই সমষ্টির সংহতিতেই তাদের শক্তি, তাদের আশা প্রগতি, সার্থকতা।

সকলে দাঁড়িয়ে উঠল, কণ্ঠ মিলিয়ে গান করলে,

"জয় মৃত্যুঞ্জয়ের জয়।"

সাবয়ব ও প্রত্যক্ষ সম্বন্ধে জনতার প্রত্যয় কম, সংশয় বেশি। অধিনেতা যতক্ষণ নররূপে ছিলেন তাদের মধ্যে, তাঁর অবাধ্য হয়েছে তারা, তাঁকে আঘাত করতে পেরেছে। পক্ষান্তরে নিরবয়ব ভাবাদর্শে দোল লাগে জনতাচিত্তে, অতএব যে-অধিনেতাকে তারা হত্যা করেছে স্বহস্তে, এখন তাঁরই স্মৃতিকে তারা রূপায়িত করল এক উদ্দীপনাময় legend-এ, এক ধ্রুব পুরাণ-প্রত্যয়ে। নিহত অধিনেতা হ'লেন মৃত্যুঞ্জয়। তাঁকে তারা দেখতে পায়না কিন্তু তাঁর বাণী ভেসে আসে তাদের কানে আকাশপথে। প্রত্যক্ষের চেয়ে অধিকতর বলীয়ান এক কল্পাদর্শে যখন তাদের প্রত্যয় স্থিতবেগ হল, তখন

হাজার কণ্ঠের ধ্বনি-নির্ঝরে ঘোষিত হ'ল—

"আমরা ইহলোক জয় করব এবং লোকান্তর।"

অদৃশ্য মৃত্যুঞ্জয়ী নেতার বিশ্বাসের ফলে তাদের সংশয় ঘুচল আর যদিও "উদ্দেশ্য সকলের কাছে স্পষ্ট নয়, কেবল আগ্রহে সকলে এক", বহুর মধ্যে অবিভাজ্য একের পক্তিতে এখন জনতা লাভ করল তার প্রকৃতির ও ধর্মের পরম মহত্ত্ব।

মৃত্যুবিপদকে তুচ্ছ করেচে

সকলের সম্মিলিত সঞ্চলমান ইচ্ছার বেগ।

তারা আর পথ শুধায় না, তাদের মনে নেই সংশয়,

চরণে নেই ক্লান্তি।

তারা কেবল এক পথের পথিক নয়, তারা সাথী, তারা শুনতে পায় নক্ষত্রের আহ্বান, "সাথী, অগ্রসর হও" আর ক্রমে সেই সম্মিলিত কৃচ্ছ্র সংযত জনসংঘ আপন নাড়ীতে নাড়ীতে শুনতে পেল সৃষ্টির প্রথম পরম বাণী, "মাতা, দ্বার খোলো।" দ্বার খুলল, তারা দর্শন পেল নবজাতকের, জনতার দীর্ঘ বহুবঙ্কিম যাত্রা অবশেষে সার্থকতায় মণ্ডিত হল।

জনতা সম্বন্ধে যে সব বহুমুখী ধারণা তাঁর নানা কবিতায় ছড়িয়ে আছে

সেগুলিকে রবীন্দ্রনাথ এই কবিতায় সমন্বিত করেছেন প্রতিমার পরে প্রতিমায়, সব প্রতিমা জড়িয়ে একটা সমগ্র রূপ ধারণ করেছে তাঁর মনোভঙ্গী।

৫

এ-প্রবন্ধের গোড়ায় বলেছি যে রবীন্দ্রনাথে জনতার ধারণায় আকর্ষণ ও বিপ্রকর্ষণ, দুই রকমের মনোভঙ্গী পাশাপাশি ক্রিয়াশীল। জনতা কখনো মহত্বমণ্ডিত স্বার্থবর্জিত কর্মপ্রেরণার উৎস, আবার কখনো বা দুর্বিচারী সংশয়ক্লিন্ন চণ্ডপ্রকৃতির প্রতীক। কিন্তু এই দুই মনোভঙ্গী যে এক সমন্বিত অখণ্ড প্রত্যয়ে রূপায়িত হয়েছিল তার প্রমাণ স্বরূপ নৈবেদ্য গ্রন্থটির "জনারণ্য" শীর্ষক সনেটের উল্লেখ করতে পারি :

মধ্যাহ্নে নগর-মাঝে পথ হতে পথে
কর্মবন্যা ধায় যবে উচ্ছলিত স্রোতে
শত শাখা-প্রশাখায়—নগরের নাড়ী
উঠে স্ফীত তপ্ত হয়ে, নাচে সে আছাড়ি
পাষাণভিত্তির 'পরে—চৌদিকে আকুলি
ধায় পান্থ, ছুটে রথ, উড়ে শুষ্ক ধূলি—

তখন সহসা হেরি মুদিয়া নয়ন
মহাজনারণ্য-মাঝে অনন্ত নির্জন
তোমার আসনখানি, কোলাহল-মাঝে
তোমার নিঃশব্দ সভা নিস্তব্ধে বিরাজে।
সব দুঃখে, সব সুখে, সব ঘরে ঘরে,
সব চিত্তে সব চিন্তা সব চেষ্টা -'পরে
যত দূর দৃষ্টি যায় শুধু যায় দেখা,
হে সঙ্গবিহীন দেব, তুমি বসি একা॥

এগারো বারো তেরো ছত্রে বাক্‌বিন্যাসের সামান্য শিথিলতা সত্ত্বেও এখানে মহৎ একটি কবিতা—উদাত্ত গভীরগামী সুরে ও প্রতিমাসৌষ্ঠবে বিধৃত হয়েছে কবির ভাবনা। বহু ও একের অদ্বৈত রূপের ভাবনা। সেই সনাতন বাণী "একোঽহম্ বহুস্যাং", "একম্ সদ্‌বিপ্রাঃ বহুধা বদন্তি" প্রযুক্ত হয়েছে বিশাল

নগরীর জনতা-জীবনে—তার রুক্ষ আতপ্ত রূপ, তার বিস্তার ও বৈচিত্র্য, তার ক্লান্তিহীন চাঞ্চল্য, আবার তার নিবিড় অন্তস্তলে পরম শান্তির নিঃশব্দ একাকীত্ব। জীবনের লীলায় নির্জন ও সজনের নিত্যসংগম।

রবীন্দ্রনাথের জনতা-চিন্তার পূর্ণ বিকাশ, আমার সামান্য বিবেচনায়, এই সনেটটিতে ও "শিশুতীর্থ" কবিতাটিতে। এ-প্রবন্ধে অনেক কবিতার উল্লেখ করেছি, সেগুলিতে এবং অনুল্লিখিত অন্যান্য কবিতায় জনতা-চিন্তনে কবি-চিত্তে যে সব বাক্‌প্রতিমার উদয় হয়েছে তার সবচেয়ে বেশি উজ্জ্বল ও পুনরাবৃত্ত প্রতিমা কয়টি এই চতুর্দশপদীতে বর্তমান—কর্মের বন্যাস্রোত, প্রাণের নর্তন, জনতার অরণ্য, নিস্তব্ধ সভার পীঠে নিঃসঙ্গ অধিষ্ঠাতা। সন তারিখের হিসাবে রবীন্দ্রনাথের জনতা-চিন্তনে পারম্পরিক বিকাশ লক্ষ্য করা সম্ভব নয়। বড়জোর বলতে পারি যে কৈশোরে ও প্রথম যৌবনে লেখা কবিতাগুলিতে কবি মত্ত ছিলেন কস্তুরীমৃগের মতো আপনারই ঘ্রাণে, কড়ি ও কোমল থেকে জন্মালো বহির্দৃষ্টিপ্রবণতা, তারপর থেকে তিনি কখনো বহির্জগৎ থেকে নিজকে বিযুক্ত করার চেষ্টায় থেকেছেন কখনো বা সে-জগতের সঙ্গে মিলিয়েছেন নিজকে কিন্তু এই যোগ-বিয়োগের কোনো গাণিতিক ছন্দোস্পন্দ নেই, তারা সমতালে চলছে আবার স্বতন্ত্র তালেও চলেছে। কবিতার বিষয়বস্তু হিসাবে আবেগ আলাদা আলাদা হয়েছে, আকর্ষণের অথবা বিপ্রকর্ষণের আবেগ কিন্তু তাঁর সমগ্র জীবনবীক্ষায় কোনো স্বাতন্ত্র্য থাকেনি, নির্জন ও সজনের সাযুজ্য ঘটেছিল। তা'র প্রমাণ "জনারণ্য" ও "শিশুতীর্থ" কবিতা দুইটিতে।

শীর্ণ আত্মীয়তা

বিমল কর

ব্যক্তিগত জীবনে মানুষের পিতৃপুরুষের সঙ্গে একটি যোগাযোগ থাকে। এই যোগাযোগ কখনও খুব প্রত্যক্ষ কখনও পরোক্ষ। পরিবারগত বন্ধনের দৃঢ়তা, পিতৃপুরুষ ও পরবর্তী সন্তানসন্ততির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের গভীরতার ওপর এই যোগাযোগের মাত্রা নির্ভর করে।

বাঙলা সাহিত্যে বঙ্কিম ও রবীন্দ্রনাথ উভয়েই আমাদের পিতৃপুরুষ। বঙ্কিমের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ বহু পূর্বেই ছিন্ন হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গেও যোগাযোগ ক্ষীণ। পরবর্তী সাহিত্যপরিবারে আমরা অনেকটা বেয়াড়া ছেলের মতন বসবাস করছি।

একদা আমার ধারণা ছিল, এ-সব কথা চাপল্যের নামান্তর। এখন মনে হয়, অনুভবের অনুল্লেখ সততা নয়।

বঙ্কিম আমাদের কাছে অতি অতীত পুরুষ। আজ যাঁরা ত্রিশ বা চল্লিশ কোঠার সাহিত্যিক তাঁরা বঙ্কিমের কোনো ঐশ্বর্য লাভ করেন নি। বঙ্কিমের রচনা পাঠ, তাঁর সাহিত্যের রসভোগ স্বতন্ত্র বস্তু। আমরা—যাঁরা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরবর্তীকালে সাহিত্যসাধনায় মেতেছি—তাঁদের সাহিত্য আর যাই হোক বঙ্কিমের সাহিত্য দ্বারা প্রভাবিত ও পরিপুষ্ট নয়। কেন নয় সে-প্রশ্ন এখানে অবান্তর।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বঙ্কিমের এই ব্যবধান ছিল না। মনোযোগী পাঠকের পক্ষে আদিযুগের রবীন্দ্রনাথকে বঙ্কিমের সুযোগ্য উত্তরাধিকারী হিসেবে চিনে নিতে বেশি কষ্ট হবার কথা নয়। যেখান থেকে রবীন্দ্রনাথ মোড় ঘুরেছেন, সেখানে বঙ্কিম আর তাঁর সহযাত্রী নন, এমন কি পথপ্রদর্শকও নন, গৃহাধিষ্ঠিত আশীর্বাদক পিতার মতন। পরবর্তী যাত্রায় রবীন্দ্রনাথ ক্রমে সাবালক, ক্রমে আত্মবিশ্বাসী ও দায়িত্ববান, অতঃপর প্রবীণ প্রাজ্ঞ এবং বাঙলা সাহিত্যের নবভূখণ্ড পত্তনের কৃতিময় পুরুষ।

বঙ্কিম রবীন্দ্রনাথের মতন এমন পূর্ব ও উত্তর পুরুষ যোগাযোগ পরে আর

ঘটল না। অনেকে মনে করেন, সেই তৃতীয় বিরল প্রতিভা ভূমিষ্ঠ হলে এই যোগসূত্র ছিন্ন হত না।

সাহিত্যের সূতিকাগার যাঁদের কাছে সম্পূর্ণ ভাগ্যের খেলা, তাঁদের মতে আমার সায় নেই। প্রতিভার আবির্ভাব অবশ্যই কিছুটা আমাদের অনধীত রহস্য, তবু প্রতিভা যে নিরন্তর কর্মে বিকশিত হয় এ-সত্য অগ্রাহ্য করা চলে না।

রবীন্দ্রনাথের উত্তরপুরুষদের মধ্যে কবি ঔপন্যাসিক গল্পকার—সবাই যে অযোগ্য ছিলেন এমন ধারণা করার কারণ নেই। জীবনানন্দ, সুধীন্দ্রনাথ, বিষ্ণু দে, বুদ্ধদেব অযোগ্য কবি এ-কথা স্বীকার করতে আমার আপত্তি আছে; মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, অন্নদাশঙ্কর অক্ষম ঔপন্যাসিক এমন কথা ইতরভাষণ। জগদীশ গুপ্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র, সুবোধ ঘোষের গল্প লেখার কলম পলকা ছিল এ-উক্তি অর্বাচীন। এতদসত্ত্বেও এঁরা রবীন্দ্রনাথের উত্তরকালের সুযোগ্য বংশধর হিসেবে স্বীকৃত হবেন না।

কেন হবেন না—এ-প্রশ্ন মাঝে মাঝে আমাদের চিন্তিত করে। একটি বিষয়ে অন্তত আমার ধারণা আপাতত স্পষ্ট হয়ে আসছে। রবীন্দ্রনাথ বাঙলা সাহিত্যের যে বিস্তৃত ভূখণ্ড উদ্ধার করেছিলেন—আমাদের অগ্রজ পুরুষরা তার শরিক হতে পারেন নি।

রবীন্দ্রনাথের পরিশীলন, মানসিক উচ্চমার্গ, প্রশান্তি, কল্যাণবোধ, পরম বিশ্বাস এবং আত্মগত স্থিতি—এর কিছুই পরবর্তীরা গ্রহণযোগ্য গুণ বলে বিবেচনা করেন নি।

কখনও কখনও আমরা একে যুগের অভিশাপ বলে বর্ণনা করে থাকি। কথাটা সত্য। যুগ-সংকটের রুক্ষ পীড়ন রবীন্দ্রনাথের কাছে পরাজিত হয়েছিল। মানুষ যে-বয়স্কতা এবং দুর্লভ মানসিক শক্তি অর্জন করার পর এই নিত্য বহিঃপীড়ন সহ্য ও উপেক্ষা করতে পারে, প্রয়োজনে তাকে সঙ্গতভাবে জীবনে গ্রহণ করে সুষমামণ্ডিত করতে সক্ষম হয়—রবীন্দ্রনাথ সে-বয়স্কতা অর্জনের পর তাঁর কাছে যুগসংকটের পীড়া এবং পীড়ন উপস্থিত হয়েছিল। পরবর্তীদের ক্ষেত্রে নাবালক অবস্থা থেকেই সেই পীড়ন প্রভূতভাবে তাঁদের মানসিকতাকে বিক্ষত করেছে।…জানি না রবীন্দ্রনাথ এদের উৎক্ষিপ্ত অবস্থা কল্পনা করেই বলেছিলেন কিনা,

আপনার সার্থকতা আপনার প্রীতি

আনন্দিত ঔদাসীন্যে, পাও কোন্ সুধা
রিক্ততায়, পরিতাপহীন আত্মক্ষতি
মিটায় জীবনযজ্ঞে মরণের ক্ষুধা।

(১৯২৮ সালে লিখিত)

সুধীন্দ্রনাথ তাঁর একটি লেখায় বলেছেন : "বংশের গুণে এবং তৎকালীন পৃথিবীর শান্তি, শৃঙ্খলা ও সমৃদ্ধি দর্শনে রবীন্দ্রনাথের প্রতীতি জন্মেছিল যে জগৎ আনন্দময় এবং চূর্ণমর্ত্যসীমার উত্তরে দেবতার অপার মহিমা বিদ্যমান। কিন্তু দীর্ঘ জীবনের প্রত্যক্ষ পরীক্ষাতেও তাঁর অপসিদ্ধান্ত একেবারে অপসারিত হয় নি ··।" রবীন্দ্রনাথের আনন্দময় জগৎ এবং ধ্রুব বিধাতা পরবর্তীদের মানসজগতে শূন্য বালুচরের মতন। সেখানে আবাদ করলে সোনা ফলত এ-বিশ্বাস তাঁদের ছিল না।

রবীন্দ্রনাথ যে-অর্থে মনুষ্যধর্মের পুরোহিত সে-অর্থে তাঁর নাবালক উত্তরাধিকারীরা পুরোহিত কি না—এ-বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। মানব-ধর্মের আদি জ্ঞান রবীন্দ্রনাথ যে-আকর থেকে সংগ্রহ করেছিলেন—তার ঐতিহ্য ফরাসী-বিপ্লব থেকে উদ্ভূত নয়। নিজ দীর্ঘ জীবনের ক্রমাগত পরীক্ষার মধ্যেও তাঁকে কোনোদিন অনুশোচনা করতে হয় নি, ভারতীয় ধর্ম ও মানব-চিন্তার সেই আকর যথার্থ নয়।

ব্যক্তিস্বরূপের স্বাধিকার নিয়ে আমরা প্রমত্ত। রবীন্দ্রনাথ এ-স্বরূপের যাবতীয় সুলক্ষণে যে আমাদের অপেক্ষা অধিক ছিলেন তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু, দুর্লক্ষণে তাঁর চিন্তা ছিল, যা আমরা গ্রাহ্য করি নি এবং তাকেও স্বাধিকারের ন্যায় বলে মেনে নিয়েছি।

জীবনের শেষ প্রান্তে এসে তাঁর একটি উক্তি স্মরণীয়। "তোমাদের জানি, তবু তোমরা যে দূরের মানুষ। ··· " চেনা জগতের এই অচেনাদের প্রতি তাঁর স্বগতোক্তি :

সবা হতে আমি দূরে, তোমাদের নাড়ীর যে ভাষা
সে আমার আপন প্রাণের, বিষণ্ণ বিস্ময় লাগে
যবে দেখি স্পর্শ তার সসংকোচ পরিচয় নিয়ে
আসে যেন প্রবাসীর পাণ্ডুবর্ণ শীর্ণ আত্মীয়তা।

(১৯৪১ সালে লিখিত)

২

আমরা আরও পরবর্তী ভাগে সাহিত্যকর্মে নিযুক্ত হয়েছি। আমাদের অগ্রজরা রবীন্দ্রনাথের পাকা ইমারতে যদি মাথা গোঁজার জায়গা না পেয়ে থাকেন—আমাদের পক্ষে সেখানে স্থান পাওয়া আরও দুরূহ। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁদের যতটুকু বা কালের সম্পর্ক ছিল আমাদের তাও নেই। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রথম ভাগে তিনি গত হয়েছেন, যুদ্ধের দাঙ্গাহাঙ্গামা দেশভাগের পর আমাদের সূচনা। অনুভব করলে বোঝা যায়, সভ্যতার সঙ্কটের সেই প্রারম্ভ পর্ব এবং সঙ্কট পর্ব—এর মধ্যে কালের ব্যবধান যদি খুব দীর্ঘ নাও হয়ে থাকে আত্মার ব্যবধান বেশ দীর্ঘ। আমরা 'সেঁজুতি'র প্রসন্নতায় নম্র ও নত হবার মৌল গুণ হারিয়ে ফেলেছি।

যতদূর মনে পড়ছে, কোন বামপন্থী বিখ্যাত ঔপন্যাসিক একবার একটি লেখায় রবীন্দ্রনাথের কাবলীঅলাকে দুষেছিলেন। তাঁর বক্তব্য ছিল, রবীন্দ্রনাথ কাবলীঅলার পিতৃস্নেহটি দেখেছেন, অথচ এই কাবলীঅলা কেমন করে গলায় গামছা বেঁধে অন্য পিতার রক্ত শুষে নেয় তা দেখেন নি। এমন কুযুক্তি সাহিত্যে চলে না, জীবনেও চলে কি না আমার সন্দেহ। কিন্তু উদাহরণটি এই জন্যে দিলাম যে, এ-যুগের আমাদের মনটি বোঝা যাবে। আমরা কাবলীঅলার কাছে টাকা ধার করি, শোধ করতে পারি না, এবং সেই জ্বালায় তার শোষক রূপটিই কেবল দেখতে পাই।

মানুষ, জীবন এবং জগতকে দেখার যে শিক্ষা রবীন্দ্রনাথ অর্জন করেছিলেন আমরা সেই শিক্ষাকে স্পর্শ করি নি, বরং তাকে মেকি বলে গলা কাটিয়েছি। 'ঘরে বাইরে'র বিমলা সন্দীপ আমাদের হাতে পড়লে এত বেশি 'রিয়েল' হত যে তাতে মানুষের সম্ভ্রম থাকত না। অস্বীকার করে লাভ নেই, আমাদের দৃষ্টি আলোচ্য অর্থে বাস্তব জটিল এবং লাশকাটা-চিকিৎসকের হতে পারে—কিন্তু সে-দৃষ্টি বর্তমান শতাব্দীর ইতরদৃষ্টি।

পঁচিশ পাতার শ্বাসরুদ্ধ প্রবন্ধ লিখে এ-কথা বোঝানো যায় যে, রবীন্দ্রনাথের প্রত্যয় আর আমাদের ধারণায় আকাশপাতাল প্রভেদ। কিন্তু অত না লিখেও আমরা যদি নিজেদের মনের দিকে তাকাই, অনুভব করতে পারব, রবীন্দ্রনাথের মানবিক মূল্যবোধগুলির সঙ্গে আমাদের হৃদয়ের সম্পর্ক শিথিল। তাঁর 'নষ্টনীড়ে'র মধ্যেও যে পরিচ্ছন্নতা শুভবেদনা আমাদের নষ্টনীড় তা কল্পনা করতে পারে না।

এ-কথা মনে করা অন্যায় হবে, আমরা ইচ্ছাকৃতভাবেই তাঁকে পরিহার করি। বস্তুত, মানুষ মন এবং মেজাজের দিক থেকে যখন সগোত্র পায় না তখন দূরে সরে যেতে বাধ্য হয়। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আমাদের মনের সম্পর্ক স্থাপিত হল না, এ আমাদের দুর্ভাগ্য।

৩

এ-যাবৎ যা বলেছি তাতে স্বভাবতই প্রশ্ন উঠবে, তবে আমরা রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে কি কিছুই পাই নি? নিতান্ত অকৃতজ্ঞেও স্বীকার করবে, তাঁর কাছ থেকে গ্রহণ করে নি এমন সাবালক বাঙালী সাহিত্যিকদের মধ্যে নেই।

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যের অন্তরস্রোত আমাদের অনায়ত্ত থাকলেও তাঁর সাহিত্যের বহিরঙ্গ আমরা গ্রহণ করেছি। খুব সংক্ষেপে বললে বলতে হয়, লেখার ভাষাটি ঢঙটি রীতিটি তিনি যুগিয়েছেন। আমাদের সাহিত্যের সাজসজ্জা চলন রবীন্দ্রনাথের ঐশ্বর্য থেকে দু' হাতে কুড়িয়ে নেওয়া। এমন ক্ষমতা কারও ছিল না—বাঙলা ভাষায় লিখতে বসে তাঁর ভাষা সরিয়ে রেখে কলম চালাবেন। আমরা তাঁর ভাবলোক পাই নি, ভাষালোক পেয়েছি। এ-পাওয়াও কম নয়।

অবশেষে আরও একটি লাভের কথা বলব, যা রবীন্দ্রনাথের কল্যাণে এমন স্বাভাবিকভাবে পরবর্তী বাঙলা সাহিত্য পেয়ে গেছে যার তুলনা দুর্লভ।

বঙ্কিমচন্দ্রের পর রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব না ঘটলে আমাদের চেতনায় একটি দেশজ সঙ্কীর্ণতা থেকে যেত। নীতি এবং ধর্মের দিক থেকে তার মধ্যে জাতীয়তা ও গোঁড়ামি থাকা সম্ভব ছিল। রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমের কল্যাণ ও মানবতাবোধকে আরও প্রসারিত করে বিশ্বজনীনতায় পৌঁছে দিয়েছেন। গত তিন চার দশকের বাঙলা সাহিত্য শিল্পের বিচারে কতটা টেঁকসই তা নিয়ে মতভেদ থাকতে পারে, কিন্তু একটি বিষয়ে আমরা নিশ্চিন্ত যে গঙ্গাস্তোত্র, কি ভারতমাতার বর্ণনায় আমাদের রুচি নেই, অথবা স্বদেশ স্বজাতের আজ্ঞা শিরোধার্য করে উত্তেজিত পরশুরাম হবার চিন্তাও কেউ করি না।

ঘরের বন্ধ দেওয়ালে চোখ রেখে রেখে যে-মানুষটির ধারণা হয়েছিল পৃথিবীর মাপ হাতে কষে পাওয়া যায় আমরা রবীন্দ্রনাথের কল্যাণে সে-হিসেবে অভ্যস্ত হতে পারি নি—এ মুক্তি কিছু কম মুক্তি নয়।

তাঁর পরেই প্লাবন

অন্নদাশংকর রায়

সম্প্রতি আমি টলস্টয়ের জীবনের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের জীবন মিলিয়ে দেখতে গিয়ে অনেক জায়গায় আশ্চর্য মিল লক্ষ করলুম। যে মিলটি আমাকে বিশেষভাবে দোলা দিল সেটি তাঁদের প্রয়াণের পরেই প্লাবন।

রুশ গুরুর তিরোভাবের পর সাত বছর যেতে না যেতেই ঘটে গেল বিপ্লব। তাঁর নিজের পুত্রকন্যাদেরই পালিয়ে যেতে হলো বিদেশে। যতদূর জানি আজ অবধি তাঁরা স্বদেশে ফেরেননি। আর টলস্টয়ের ভাবধারাও বৌদ্ধধর্মের মতো নিজ বাসভূমে বিলুপ্ত।

তেমনি ভারতীয় ঋষির অন্তর্ধানের সাত বছর পরেই—প্রায় কাঁটায় কাঁটায়—ভারতবর্ষ হয়ে গেল দু'ভাগ। এক ভাগ চলল ভারতবর্ষের বাইরে। বাংলাদেশ হয়ে গেল দু'খানা। একখানার নাম থেকে "বাংলা" শব্দটাই মুছে গেল কিছুদিন পরে। রবীন্দ্রনাথের জমিদারি পড়ল পূর্ব পাকিস্তানে, অন্যান্য জমিদারির সঙ্গে তাও হলো রাষ্ট্রসাৎ। যেখানে তাঁর যৌবনের শ্রেষ্ঠ দিনগুলি কেটেছিল সেখানে তাঁর পুত্রকন্যাও আজ বিদেশী নাগরিক। বেঁচে থাকলে তিনিও হতেন "এলিয়েন"।

আর তাঁর সেইসব বিখ্যাত জাতীয় সঙ্গীত? "আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি।" "আজ বাংলাদেশের হৃদয় হতে কখন আপনি।" "বাংলার মাটি বাংলার জল।" কেউ গায় না এসব গান পাকিস্তানে। গাইলে দেশদ্রোহ হবে। এপারেও কি গায়? গাইবে কোন্ মুখে? কেউ বিশ্বাস করে না যে আবার সেসব দিন ফিরবে। বা আবার বাংলাদেশ এক হবে। আন্তরিকতার সঙ্গে প্রার্থনাও করতে পারে না যে, "এক হউক, এক হউক, এক হউক, হে ভগবান।"

অথচ টলস্টয়ের মতো রবীন্দ্রনাথও সারা জীবন সাধনা করেছিলেন যাতে এ রকমটি পরে না হয়। করেছিলেন তাঁর নিজের সীমাটুকুর মধ্যে। শান্তিনিকেতনের কথা, রবীন্দ্রসাহিত্যের কথা সকলেই জানেন। আমি আজ বলব জমিদারির কথা।

ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসে যোগ দেবার আগে আমি যখন লণ্ডনে প্রোবেশনার আমার এক বাঙালী বন্ধু আমাকে বলেন, "ওহে, তুমি তো দেশে ফিরে গিয়ে শাসক হবে? একটু খোঁজ নিয়ো তো। রবীন্দ্রনাথ কি সত্যি একজন প্রজাপীড়ক জমিদার?"

আমি তো অবাক। জানতে চাই কোথায় তিনি শুনলেন ও কথা।

তিনি একটু মুচকি হেসে বললেন, "কাব্য পড়ে যেমন ভাবো কবি তেমন নয় গো।"

মনে আঘাত লাগল। বন্ধু সান্ত্বনা দিলেন এই বলে যে, "ভাখ, জমিদার-মাত্রেই প্রজাপীড়ক। নইলে জমিদারি রাখা যায় না।"

প্রসঙ্গটা আমি ভুলে যাই। বছর কয়েক পরে আমাকে দেওয়া হয় আমার প্রথম মহকুমা। রাজশাহী জেলার নওগাঁও। বন্ধুরা রসিকতা করে বললেন, "যার যেথা স্থান। সরকার বাহাদুর মানুষ চেনেন। নইলে এত লোক থাকতে তোমাকে কেন পাঠাবেন গাঁজামহলে।"

গাঁজার চাষের জন্যে নওগাঁর সুগন্ধ বহুদূর প্রসারিত। সেখানে গিয়ে সত্যি সত্যি গাঁজার গন্ধে আমার নেশা ধরে গেল। বাতাসে গাঁজার গন্ধ। তা ছাড়া গাঁজাচাষীদের একটা সমবায় প্রতিষ্ঠান ছিল। সেই প্রতিষ্ঠানের অধীনে আরো কয়েকটা উপপ্রতিষ্ঠান ছিল। এইসব নিয়ে থাকাও এক জাতের নেশা। মহকুমা শাসকের জীবনটা এমনিতেই বিচিত্র। যেন একটা ষোল কলা ছুরি।

জমিদারের জন্যে বিখ্যাত উত্তরবঙ্গ। বহু জমিদারের সঙ্গে আলাপ হলো। ঘুরে ঘুরে দেখলুম তাঁদের জমিদারি। খেয়াল ছিল না যে রবীন্দ্রনাথের জমিদারিও আমার মহকুমায়। একদিন পতিসর থেকে আমন্ত্রণ করতে এলেন ঠাকুর এস্টেটের এক প্রতিনিধি।

হাতে অন্য কাজ থাকলেও তৎক্ষণাৎ রাজী হয়ে গেলুম। কিন্তু পতিসরে যাওয়া খুব একটা সহজ ব্যাপার নয়। যেতে হয় নৌকায় করে। কিংবা পালকীতে চড়ে। কিংবা হাতীর পিঠে। এক এক বার এক এক ভাবে সেখানে গেছি। কিন্তু প্রথম বারটা পালকীতে চেপে সে যে কী যন্ত্রণা! আমি ঢুকি তো আমার শরীর ঢোকে না। শরীর ঢোকে তো হাত পা মুড়ে কুণ্ডলী পাকিয়ে জবুথবু হয়ে বসে থাকতে হয়। বেরিয়ে আসাটা আরো শক্ত।

পতিসরে পৌঁছিয়ে মনটা খুশিতে ভরে যায়। রবীন্দ্রনাথের পতিসর তীর্থবিশেষ। আরো কয়েকবার সেখানে যেতে হয়েছে। পরবর্তীকালে রাজশাহী জেলার কালেকটাররূপেও। আমার ব্যবহারের জন্যে কোনো কোনো বার হাউসবোটও পেয়েছি পতিসরের জমিদারি থেকে। হাউসবোটেও রাত কাটিয়েছি কবির মতো। তবে নাগর নদীটা একটা খালের মতো অপ্রশস্ত। তেমন স্রোতও নেই তাতে। আত্রাই তার চেয়ে অনেক চওড়া ও বহতা। আত্রাই ঘাট স্টেশন থেকে যেতে হয় আত্রাই নদী হয়ে। সেইটুকুই আরামের।

জমিদারি দেখার কাজ রবীন্দ্রনাথ অনেক কাল ছেড়ে দিয়েছিলেন। সেই যখন আশ্রম বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে শান্তিনিকেতনে বাস করতে সুরু করেন। মাঝে মাঝে মহালে আসতেন। তাও বহুদিন থেকে বন্ধ। যাকে টানছে চীন থেকে পেরু তাঁকে টানবে পতিসর শিলাইদা! ইতিমধ্যে একসময় তাঁদের জমিদারি ভাগ হয়ে যায়। কবির ভাগে পড়ে পতিসর ও তার নিকটবর্তী অঞ্চল। শিলাইদা তাঁর দাদা সত্যেন্দ্রনাথের ভাগে। আমি যখন কুষ্টিয়ার মহকুমা শাসক হয়ে শিলাইদা দেখতে যাই তার আগে দেনার দায়ে সেখানকার জমিদারি বিকিয়ে গেছে। মালিক তখন ভাগ্যকুলের রায়রা।

পতিসরের যে দশা আমি দেখলুম তা পড়তি দশা। পাটের বাজার মন্দা, তাই চাষীদের হাতে টাকা নেই। জমিদারি কোন রকমে চলছে, কিন্তু প্রজাদের অল্প সুদে কর্জ দেবার জন্যে যে সব ব্যাঙ্ক স্থাপন করেছিলেন দরদী রবীন্দ্রনাথ সেসব প্রায় অচল। বহু টাকা খাতকের ঘরে আটকে রয়েছে। অতি ক্লেশে চলছে কল্যাণবৃত্তি তহবিল। অন্য কারো জমিদারিতে আমি এর মতো কিছু দেখিনি। এটি রবীন্দ্রনাথের কীর্তি। এই তহবিলে প্রজারা দিত অর্ধেক চাঁদা, বাকীটা দিতেন জমিদার। সরকারী সাহায্য না নিয়ে নিজেদেরি অর্থে বিদ্যালয় ও ডাক্তারখানা চালানো প্রজা ও জমিদার উভয়ের পক্ষে গৌরবের বিষয় ছিল। কিন্তু ওই যে বলেছি, পাটের বাজার মন্দা। সেই থেকে বিদ্যালয় ও ডাক্তারখানারও মলিন দশা।

জমিদার ও প্রজার পারস্পরিক সহযোগিতাই ছিল রবীন্দ্রনাথের আদর্শ। তিনি যখন প্রথম যৌবনে মহর্ষির আদেশে জমিদারির কাজ দেখতে বেরন তখন থেকেই এই আদর্শ ছিল তাঁর মানসে। শিলাইদায় গিয়ে তিনি লক্ষ্য করেন তাঁর জন্যে দরবার অনুষ্ঠিত হচ্ছে, কিন্তু দরবারে মুসলমানদের আসন

নিচে ফরাস পেতে আর হিন্দুদের আসন চেয়ারে বা বেঞ্চিতে। লক্ষ করে রবীন্দ্রনাথের পিত্ত জলে যায়। তিনি জানতে চান, এই বৈষম্য কেন? সকলের জন্যে একই প্রকার ব্যবস্থা হয়নি কেন?

এর উত্তরে শুনতে পান, "এই তো বরাবর চলে আসছে, বাবুমশায়। প্রিন্সের আমলেও এই রকম ব্যবস্থা ছিল, মহর্ষির আমলেও। হুজুর কি এই প্রাচীন ব্যবস্থা রদ করতে বলেন? তা হলে যে শাসন করা যাবে না।"

রবীন্দ্রনাথ জানিয়ে দিলেন যে অমন দরবারে তিনি যোগ দেবেন না। সবাইকে সমান শ্রদ্ধা দেখাতে হবে। তাই শেষপর্যন্ত হলো। তাঁর মুসলমান প্রজারা তখন থেকেই তাঁর বিশেষ অনুগত। এ ঘটনাটা শিলাইদার। আমার জন্মের পূর্বের। আমি এটা পড়েছি শিলাইদার এক জমিদারি কর্মচারীর গ্রন্থে। কিন্তু এর পরে যেটার কথা বলছি সেটা আমার চোখে দেখা।

রাজশাহীতে থাকতে হঠাৎ টেলিগ্রাম পেলুম রবীন্দ্রনাথ এসেছেন পতিসরে। আমি যেন তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। তিনি সেইদিনই কলকাতা ফিরবেন। সময় একেবারেই ছিল না। ছুটলুম মোটরে করে নাটোর, তার পরে ট্রেন ধরে। আত্রাই ঘাট। ট্রেন থেকে নেমে দেখি রবীন্দ্রনাথের হাউসবোট ঘাটে বাঁধা। তিনি পতিসর থেকে ফিরেছেন। প্লাটফর্মে বসে আছেন ট্রেনের প্রতীক্ষায়। প্রণাম করে তাঁর পাশে আসন নিলুম।

রবীন্দ্রনাথ বললেন, "ওই লোকগুলিকে দেখছ? ওরা সমস্ত পথ পায়ে হেঁটে আমার সঙ্গে এসেছে। পতিসরে এ সময় আসার কথা ছিল না। ওরাই আমাকে শেষবারের মতো চেয়েছিল। কতকাল দেখেনি।"

তা তো চাইবেই। দুনিয়ার লোক দেখল। আর দেখতে পেলো না ওরাই। কবি বোধ হয় পনেরো বছর ও-মুখো হননি। তাঁর বয়স তখন ছিয়াত্তর। স্বাস্থ্যেও ভাঙন ধরেছে। পতিসরে যাওয়াও তো চারটিখানি কথা নয়। তাঁর সেই হাউসবোটটিরও অন্তিম দশা ঘনিয়ে আসছে। বোধ হয় আদায়পত্র সুবিধের নয়।

"ওরা কী বলছে, শুনবে?" রবীন্দ্রনাথ বলতে থাকলেন। "বলছে, পয়গম্বরকে তো স্বচক্ষে দেখিনি। আপনাকেই দেখছি।"

পয়গম্বরকে আমিও কি স্বচক্ষে দেখেছি? কিন্তু গুরুদেবকে তাঁর সেই পরিপক্ক কেশশ্মশ্রুমণ্ডিত পরিণত বয়সে কোনো এক পয়গম্বরের মতোই দেখতে।

মর্ত্যের বন্ধন ক্ষয় হয়ে এসেছিল। তিনি আমাদের মধ্যে থাকলেও আমাদের একজন নন।

ইয়া ইয়া দাড়িওয়ালা বুড়ো বুড়ো মুসলমান। তাঁকে ঘিরে দাঁড়িয়েছিল, প্রিয়জনের মতো। কলকাতাগামী ট্রেন এলো। এক মিনিট কি দু'মিনিট থামল। গুরুদেবকে তুলে দেওয়া হলো ধরাধরি করে। তাঁর প্রজাদের চোখে জল। শেষবারের মতো তাঁকে তারা সালাম করল। প্রণাম করল। তিনি তো কেবল জমিদার নন। তিনি পয়গম্বরের কাছাকাছি যান।

সেবার আমি তাঁর একমাত্র সহযাত্রী হয়ে নাটোর পর্যন্ত যাই। প্রধানত সাহিত্য নিয়ে আলোচনা। কিন্তু আমাকে সেইজন্য ডেকে পাঠাননি। ছিল একটা বৈষয়িক অনুরোধ। নাটোরে ট্রেন থেকে নেমে তাঁকে বিদায় দিয়ে রাজশাহী ফিরে যেতেই আমার বৃদ্ধ মুসলমান জমাদার আমাকে ছেঁকে ধরল। "হুজুর বাহাদুরের কোথায় যাওয়া হয়েছিল?"

আমি বললুম। জানতুম না যে সে বুঝবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কে।

এই লোকটি কালেক্টারদের কাছে তরুণ বয়স থেকে চাপরাশিগিরি করে এসেছে। সরকারী কানুন এর জন্যে নয়। এর বয়সের আর সবাই কবে অবসর নিয়ে ভূত হয়ে গেছে। একে ছাড়ানোর সাহস কোনো কালেক্টারের হয়নি। আমি তো এর নাতির বয়সী। এ যে দয়া করে বেঁচে আছে এতেই আমার সম্মান।

শফি জমাদার আমাকে বকুনির সুরে বলল, "আহা! ঠাকুরবাবু এসেছিলেন হুজুর! আমি তাঁকে দেখিনি কতকাল। দেখে আসতুম।"

"তুমি তাঁকে দেখেছ?" আমি কৌতূহলী হয়ে জানতে চাইলুম। "কবে?"

"সেই যেবার তিনি এসেছিলেন রাজসাহীতে। পালিত সাহেব তখন এখানকার জজসাহেব। জজসাহেবের কুঠিতে ছিলেন। আহা, ঠাকুরবাবু কী সুন্দর মানুষ। কী সুন্দর গান করেন। আমার এখনো মনে আছে।" তার মন চলে গেল কোন্ অতীতে।

আমি হিসেব করে দেখলুম সে বলছে চুয়াল্লিশ বছর আগেকার কথা, কবির বয়স যখন ত্রিশ। পদ্মার বুকে হাউসবোটে বাস করতেন।

পরে শান্তিনিকেতনে এসে গুরুদেবকে আমি একথা বলেছিলুম। তিনি অকুণ্ঠকণ্ঠে বললেন, "তখন আমার গানের গলা ছিল।"

আর একবার পতিসরে যেতে যেতে পথে এক জায়গায় হাতীর পিঠ থেকে নামি। হাতী জল খেতে যায়। সেই ফাঁকে আলাপ হলো এক প্রাচীন গৃহস্থের সঙ্গে। ঠাকুরবাবুদেরই হিন্দু প্রজা। সে আপনার থেকে শোনাতে আরম্ভ করে তার ছেলেবেলাকার গল্প। বাবুমশায় এসেছিলেন পতিসরে। বোট থেকে নামলেন না। প্রজারা তাঁকে সেইখানে গিয়ে ভেট দিয়ে এলো। তাঁর পিতৃবিয়োগ ঘটেছিল। শ্রাদ্ধের ভেট।

প্রথম দিন তিনি গ্রহণ করলেন। কিছু বললেন না। পরের দিন আবার সবাইকে ডেকে পাঠালেন। বললেন, "আমার বাপের শ্রাদ্ধ! আমি নেব তোদের ভেট! ছি ছি! কী লজ্জার কথা। যা, যা, ফিরিয়ে নিয়ে যা।" এই বলে সব ফিরিয়ে দিলেন। প্রজারা তো হতভম্ব। কোনো জন্মে এমন জমিদার দেখেনি।

পতিসরের চেয়ে শিলাইদা আমার ভালো লেগেছিল। ঠাকুরবাবুদের পরিত্যক্ত কুঠিবাড়ীতে আমি কয়েক রাত ছিলুম। তেতালায় একখানা ঘর দেখিয়ে দিয়ে তারা বলে, "বাবুমশায় এই ঘরে বসে 'গীতাঞ্জলি' লিখেছিলেন।" অনেক গল্প শোনা গেল সেখানে। যদিও তিনি তখন আর সেখানকার জমিদার নন, তবু কেউ তাঁকে ভোলেনি। তাঁর স্থান আর কাউকে দেয় নি। তিনিই তখনো সেখানকার প্রিয়তম প্রভু।

জমিদারি কাছারিতে পুরোনো কাগজপত্র তখনো কিছু কিছু ছিল। দেখতে চাইলুম গুরুদেবের হাতে লেখা জমিদারি হুকুম। খান দুয়েক চিঠি ওরা আমায় দেখায়। পড়ে দেখি রবীন্দ্রনাথের আর এক রূপ। কে বলবে যে তিনি একজন কবি। উপমাবহুল অলঙ্কৃত গদ্য নয়। রাশভারি মেজাজে লেখা নীরস নিরাভরণ বৈষয়িক লিপি।

পুত্র রথীন্দ্রনাথকে তিনি কৃষিবিদ্যা শেখাতে আমেরিকায় পাঠিয়েছিলেন। এবার তাঁর জন্যে শিলাইদার কাছে চর জমি কিনে ফার্ম করে দিতে চান। এটা নোবেল প্রাইজের আগের পর্যায়ের কথা। বিশদ উপদেশ ছিল জমিদারির কর্মচারীটির প্রতি। যে ভাষায় লেখা হয়েছিল সেটাও জমিদারি সেরেস্তার বাংলা। আরম্ভটা সংস্কৃত সম্বোধন দিয়ে। আহা, কেন যে তখন নকল করিয়ে রাখিনি।

না, "কাব্য পড়ে যেমন ভাবো কবি তেমন নয় গো।" সেই শিলাইদাতেই তাঁর পরীক্ষানিরীক্ষার খবর পাওয়া গেল। কবিতার টেকনিক নিয়ে নয়। মণ কয়েক ইলিশ মাছ জোগাড় করে মাটিতে পুঁতেছিলেন। জমি সারবান হবে। গন্ধে মানুষ পাগল হয়ে যায় আর কী!

কুষ্টিয়ায় থাকতে তাঁর সেই পাটের কারবারের একমাত্র স্মরণচিহ্ন নজরে পড়েছিল। একটা বাড়ীর গায়ে লেখা ছিল "টেগোর অ্যাণ্ড কো।" ততদিনে তার হাত বদল হয়েছে। কারবার তো তিনি নিজেই গুটিয়ে নিয়ে শান্তি-নিকেতনে চলে যান। নিজের শক্তির বা বুদ্ধির অভাব ছিল না। বিশ্বাসযোগ্য কর্মচারীরই অভাব। নইলে তাঁকে বিরাট এক দেনার দায়ে জড়িয়ে পড়ে শিলাইদার কর্মস্থল ত্যাগ করে শান্তিনিকেতনে তপোবন বাস করতে হতো না। মাত্র চল্লিশ বছর বয়সে বানপ্রস্থ নিতে হতো না।

তাঁর ইচ্ছা ছিল তাঁর পুত্র তাঁর কর্মস্থলে বসে তাঁর কর্মধারা অনুসরণ করবেন। তাও ঘটে উঠল কই। নোবেল প্রাইজের পর সব ওলট পালট হয়ে যায়। এমন কি জমিদারির সদর কার্যালয় পর্যন্ত স্থানান্তরিত হয় শান্তিনিকেতনে। রবীন্দ্রনাথের জমিদারি আদর্শের প্রথম কথা ছিল জমিদার হবেন না অনুপস্থিত উপস্বত্বভোগী, প্রজাদের ছেড়ে দেবেন না জমিদারি আমলাদের হাতে। শেষ-পর্যন্ত আমলাতন্ত্রেরই জয় হলো।

রাশিয়া বেড়াতে গিয়ে তিনি বলেছিলেন তিনি যে জমিদার এর জন্যে তিনি লজ্জিত। টলস্টয় যেমন স্ত্রীর উপরে, রবীন্দ্রনাথ তেমনি পুত্রের উপরে জমিদারি চালানোর ভার ন্যস্ত করে হাত ধুয়ে ফেলেছিলেন। কিন্তু অমিয় চক্রবর্তী যখন তাঁর কাছে নিবেদন করেন যে যাবার আগে তিনি যেন তাঁর জমিদারি নেশনকে দান করে দিয়ে যান তখন তিনি নারাজ হন। পুত্রকে তিনি বঞ্চিত করবেন না।

কয়েক বছর পরে বঞ্চিত করল ইতিহাস।

রবীন্দ্রচিন্তা

বিনয় ঘোষ

রবীন্দ্রজীবনের অর্ধেক কেটেছে উনিশ শতকে, আর বাকি অর্ধেক বিশ শতকে। ঘটনাটা উনিশ-বিশের মতন সামান্য নয়, চিন্তা কবলে এর অসামান্যতা ধরা পড়ে। রবীন্দ্রজীবনের দুই শতকেব এই বিভাগটাকে আরও ভাল করে তলিয়ে দেখা উচিত। * * *

দুই অর্ধেকের পার্থক্য আছে। একটি শেষের অর্ধেক, আর একটি গোড়ার অর্ধেক। কারও শেষ ভাল, কারও গোড়া ভালো। যেমন উনিশ শতকের শেষ ভাল, বিশ শতকেব গোড়া ভাল। বিশ শতকের শেষ হয়ত আরও অনেক ভাল, কিন্তু আপাতত তা আমাদের বুদ্ধির নাগালেব বাইরে। * * *

উনিশ শতকের শেষ ভাল এইজন্য যে সেটা হল ভাঙা-গড়ার যুগ। ভাঙন ও গড়ন যে-যুগে পাশাপাশি চলতে থাকে তাব প্রথম পর্বে সমাজ-মন্থনের ফলে অমৃত ও গরল দুয়েরই উত্থান হয়। কোন্‌টা অমৃত কোন্‌টা গরল, এবং কেনই বা অমৃত আর কেনই বা গবল, তা স্থিরধীরভাবে বিবেচনা কবে বুঝবার শক্তি সমাজের বেশির ভাগ লোকেব থাকে না। বিচার-বিশ্লেষণ ও সমীকরণেব কাজ আরম্ভ হয় পরে, যখন প্রথম চিন্তালোড়নের ফেনা-বুদ্‌বুদ্‌ মিলিয়ে যেতে থাকে। রামমোহন-ইয়ং বেঙ্গল-বিদ্যাসাগর এই প্রাথমিক আলোড়নের স্রষ্টা। বাংলার নিস্তরঙ্গ কূপমণ্ডুক সমাজে প্রচণ্ড আঘাত করে এঁরা যে তরঙ্গবিক্ষোভ সৃষ্টি করেছিলেন, তার ভিন্নমুখী স্রোতগুলির নির্দিষ্ট খাত বেছে নিয়ে প্রবাহিত হতে সময় লেগেছিল অনেক। নবযুগের ভাববিপ্লবের সময় প্রথমে ভিন্নমুখী চিন্তাধারাগুলি পরস্পর মিলিত হয়ে একটা জটিল আবর্ত রচনা করে। উনিশ শতকের প্রথম অর্ধেকে বাংলার মানসলোকে এই ধরণের চিন্তাবর্ত রচিত হয়েছিল। দ্বিতীয় অর্ধেকের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হল, চিন্তার স্রোতগুলি স্পষ্টরূপ ধরে নির্দিষ্ট খাতে তখন বইতে আরম্ভ করেছিল। কোন্‌টা বলিষ্ঠ অগ্রপন্থী, কোন্‌টা বা দোদুল্যমান মধ্যপন্থী, কোন্‌টা পশ্চাদপন্থী—তা সাধারণ লোকের কাছেও স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। পথ বেছে নেওয়ার মধ্যে তখন কোনরকম গাঁজামিল দেওয়া সম্ভব ছিল না। সমাজে মধ্যে মধ্যে এমন বিচিত্র সব

ঘটনা-সমাবেশ হয় যে দুই পথে দুই পা দিয়ে চলতে বুদ্ধিমান ব্যক্তিদের খুব একটা অসুবিধে হয়না। সে-রকম সুযোগ রবীন্দ্রনাথের জন্মকালে বিশেষ ছিল না। সমাজের দেহে যেমন, সমাজের মনেও তেমনি শ্রেণীভেদ তখন প্রকট হয়ে উঠেছিল। * * *

প্রথমে চিন্তালোড়নটা বাংলাদেশে প্রধানত হিন্দুসমাজের মধ্যে কেন্দ্রীভূত ছিল বলে, উনিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে দেখা যায় যে সমাজচিন্তার সমস্ত ডালপালা যখন দেশের মাটিতে মূল গাড়তে চাইছে, তখন তার সমস্ত প্রাণশক্তির যোগান দিচ্ছে 'হিন্দুত্বের' ঐতিহাসিক চেতনা। নতুন স্বাদেশিকতাবোধের উন্মেষ হচ্ছে বটে, কিন্তু হিন্দুত্বের গাঢ় রঙে তা রঞ্জিত। দেশমাতৃকার ধ্যানমূর্তি গড়ছে তখন দেশের লোক, রবীন্দ্রনাথ সেই মায়ের কোলেই জন্মগ্রহণ করলেন, অথচ গাঢ় বা ফিকে কোন রঙের ছোপ তাঁর মনে একটুও লাগল না। রবীন্দ্রনাথের স্বাদেশিকতাবোধ কোনদিন সাম্প্রদায়িকতার স্পর্শে কলুষিত হয়নি। 'জীবনস্মৃতি'র পাঠকরা জানেন, হিন্দুমেলার সামাজিক কলকোলাহল রবীন্দ্র-পরিবারেই প্রতিধ্বনিত হয়েছে সবচেয়ে বেশি। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি ঠাকুর-পরিবারের যুবকরা এই নব্য-জাতীয়তার উদ্বোধনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন। জাতীয় জাগরণের এই উষাকালে রবির উদয় মনে হয় গভীর তাৎপর্যে পূর্ণ।***

১৮৬০ সালে বাইশ বছরের যুবক কেশবচন্দ্র সেন তাঁর প্রথম রচনা "Young Bengal, This is for you" প্রকাশ করেন। তৎকালের তরুণদের আহ্বান করে তিনি বলেন "Rest assured, my friend, if in our country intellectul progress went hand in hand with religious development, if our educated countrymen had initited themselves in living truths of religion, patriotism would not have been a matter of mere oration and essay, but a reality in practice." নবযুগের শিক্ষার মধ্যে এই 'living truths of religion'-এর অভাবকেই কেশবচন্দ্র 'godless education'-এর ফল বলেছিলেন। তরুণ বাংলাকে নতুন জীবনমন্ত্রে জাগিয়ে তোলার জন্য কেশবচন্দ্রের এই বক্তৃতা, তাঁর ব্রাহ্মধর্মের দীক্ষা, আচার্যপদে অভিষেক, সঙ্গত সভা, ক্যালকাটা কলেজ, 'ইণ্ডিয়ান মিরর' পত্রিকা প্রভৃতি স্থাপন (১৮৬০-৬২), সাহিত্যক্ষেত্রে দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' নাটক

ও মাইকেল মধুসূদনের মেঘনাদ বধ কাব্য প্রকাশ রবীন্দ্রনাথের জন্মকালের ঘটনা। তারপর রবীন্দ্রনাথের ছেলেবেলায় স্বামী বিবেকানন্দের জন্ম (১৮৬৩), আদি ব্রাহ্ম সমাজ ও ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের ভেদ (১৮৬৬), হিন্দুমেলা বা জাতীয় মেলার অধিবেশন আরম্ভ (১৮৬৭), বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশ (১৮৭২), বেলঘরিয়ার তপোবনে কেশবচন্দ্রের সঙ্গে রামকৃষ্ণ পরমহংসের প্রথম সাক্ষাৎ ও আলাপ (১৮৭৫)—এইসব ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটতে থাকে। সমাজচিন্তার বিভিন্ন প্রবাহের যে নির্দিষ্ট খাতের কথা বলেছি, এই সময় থেকে সেগুলি স্পষ্টাকারে রেখান্বিত হতে থাকে। * * *

'সঞ্জীবনী', 'ভারতী', ও 'সাধনা' পত্রিকা মারফৎ রবীন্দ্রনাথ যে সামাজিক আদর্শ-সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছিলেন 'নবজীবন', 'প্রচার', 'বঙ্গবাসী' প্রভৃতি পত্রিকার সঙ্গে, আজও তার সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত রচনা করা হয়নি। উনিশ শতকের শেষ দুই দশকে হিন্দু পুনরভ্যুত্থানবাদীদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ জাতীয় ও সামাজিক প্রগতির জন্য, মানবধর্মের অকৃত্রিম সত্যের জন্য যে লড়াই করেছিলেন, মনে হয় বাকি জীবনে সুসংহত বিপরীতচিন্তার সঙ্গে আর কখনও তাঁকে সেরকম লড়াই করতে হয়নি। চিন্তার এই সংঘাতের ইতিহাস যতদিন না লুপ্ত ও দুষ্প্রাপ্য পত্রিকার পৃষ্ঠা থেকে পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হবে, ততদিন রবীন্দ্রনাথের সমাজ-চিন্তার (Social thoughts) অনুশীলন অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। 'হিং টিং ছট্' কবিতা, 'গোরা' উপন্যাস প্রভৃতি রচনার প্রকৃত মানসিক পশ্চাদভূমি অনুধাবন করাও সম্ভব হবে বলে মনে হয় না। যোগেন্দ্রচন্দ্র ও শশধর তর্কচূড়ামণিদের বক্তব্য কি ছিল তা না জানলে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যও সম্পূর্ণ বোঝা যাবে না। রবীন্দ্রপ্রতিভার অনুশীলনে এটা একটা বড় ফাঁক রয়ে গেছে, ভরাট করা প্রয়োজন।

'গোরা' উপন্যাসটিকেও বিরাট একটি হিং টিং ছট্ কবিতা বলা যায়। অন্তরালবর্তী ভাবগত সাদৃশ্যের দিক দিয়ে বলছি। চরিত্রায়ণের অপূর্ব দক্ষতায় প্রত্যেকটি চরিত্র মনে গভীর দাগ কেটে যায়, কাউকে চেষ্টা করেও ভোলা যায় না। তবু চরিত্রায়ণের চেয়ে জীবন ও জাতির আদর্শের রূপায়ণই গোরার বড় কথা। চরিত্রের চেয়ে বক্তব্য অনেক বড়। কি সেই বক্তব্য? নায়ক গোরার জীবনের বিশাল সৌধ কেনই বা তিনি বৈদেশিক জনকত্বের বালুচরের উপর গড়ে তুললেন? কেনই বা সে রহস্যের আবরণ নায়কের কাছে উন্মোচন করলেন না।

পরিণতির আগে পর্যন্ত ? এ কি হিন্দুধর্মের তর্কচূড়ামণিদের প্রতি নির্মম বিদ্রূপ ? তামাসায় তাসের প্রাসাদ রচনা ? কিন্তু ব্রাহ্মধর্মের প্রতিও নির্মম কটাক্ষ আগাগোড়া গোরার মধ্যে করা হয়েছে। হিন্দুধর্ম ও ব্রাহ্মধর্মের মিলনের ইঙ্গিতও যথেষ্ট রয়েছে গোরার মধ্যে। ব্রাহ্মধর্মের অন্যতম আদিগুরু রাজনারায়ণ বসু 'হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা' সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়েছিলেন অত্যুগ্র ব্রাহ্মদের প্রকৃতিস্থ করার জন্য। 'গোরা'তে রবীন্দ্রনাথ কি তাই করেছেন ? অথবা এই কথা বলতে চেয়েছেন যে সকল ধর্মের বাইরের মেকী খোলসটা পরিত্যাজ্য, বাকি আসল সত্তাটুকু সকলেরই সমান মহৎ ও শ্রেষ্ঠ, এবং সেটা মানবধর্ম তথা বিশ্ব-মানবধর্ম ? এরকম অনেক প্রশ্ন জাগে মনে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সমাজচিন্তার ক্রমবিকাশের ধারাটিকে, সমস্ত ফাঁক ভরাট করে ধরতে না পারলে এ-সব প্রশ্নের সঠিক উত্তর দেওয়া সহজ নয়। * * *

প্রতিভার কাল-নিরপেক্ষতায় যাঁরা বিশ্বাসী তাঁদের সঙ্গে আমার মতের মিল হবে না কোনদিন, হবার প্রয়োজনও নেই। অনাদিকালের এই তর্ক অনন্তকাল ধরে চলবে, এবং তা চলে তো চলুক। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সমাজ চেতনার যুক্তিবাদী বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আদৌ নড়বড়ে বলে মনে হয় না। তিনি নিজে তাই তাঁর প্রতিভার কালসাপেক্ষতায় বিশ্বাসী ছিলেন, এবং কাব্যাকারে তার সুন্দর উত্তর দিয়ে গেছেন "আমি যদি জন্ম নিতেম কালিদাসের কালে" কবিতায়। আরও অনেক রচনায় তার স্পষ্ট ইঙ্গিত আছে। * * *

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের চরিত্রে তাঁর পিতা দ্বারকানাথের প্রভাব উল্লেখ্য বলে মনে হয় না। রবীন্দ্রনাথের জীবনেও পিতা দেবেন্দ্রনাথের প্রভাব যতই প্রত্যক্ষ ও গভীর হোক না কেন, মনে হয় পিতার পুত্রের চেয়ে বিশ্বকবি তাঁর পিতামহের প্রকৃত পৌত্র ছিলেন অনেক বেশি। 'বিদ্যাসাগরচরিতে' রবীন্দ্রনাথ নিজে ঈশ্বরচন্দ্রের পিতামহ রামজয় তর্কভূষণের চরিত্র সবিস্তারে বর্ণনা করে বলেছেন, "এই দরিদ্র ব্রাহ্মণ তাঁহার পৌত্রকে আর কোনো সম্পত্তি দান করিতে পারেন নাই, কেবল যে অক্ষয়সম্পদের উত্তরাধিকারবণ্টন একমাত্র ভগবানের হস্তে, সেই চরিত্র-মাহাত্ম্য অখণ্ডভাবে তাঁহার জ্যেষ্ঠপৌত্রের অংশে রাখিয়া গিয়াছিলেন।" কেবল 'দরিদ্র' কথাটির বদলে 'অতুল ঐশ্বর্যশালী' কথাটি বসিয়ে বলা যায় যে প্রিন্স দ্বারকানাথ তাঁর চরিত্রমাহাত্ম্য অখণ্ড ভাবে তাঁর নবমপৌত্রের অংশে রেখে গিয়েছিলেন। দেবেন্দ্রনাথের

জীবনী ও আত্মজীবনী দুইই আছে, কিন্তু কিশোরীচাঁদ মিত্রের একখানি অসম্পূর্ণ ইংরেজী জীবনী ছাড়া দ্বারকানাথের কিছু নেই। দেবেন্দ্রনাথের চরিত্রের ধ্যানগম্ভীর আত্মমুখী প্রশান্তি রবীন্দ্রচরিত্রে বর্তেছিল বটে, কিন্তু রবীন্দ্রপ্রতিভার শ্রেষ্ঠ বৈশিষ্ট্য যে বলাকার উদ্দাম সচলতা, যে 'হেথা নয়, হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোনখানে'র আবেগ, যে দুর্বার দুরন্ত অভিযানের অনির্বাণ বাসনা, তা একান্তভাবে দ্বারকানাথের 'material'-ঐশ্বর্যমুখী চরিত্রের 'ideological' বা 'intellectual'-ঐশ্বর্যমুখী রূপান্তর। 'Money' এবং 'Talent', 'Wealth' এবং 'Erudition'—এই দুটিই হল শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদনের প্রধান মানদণ্ড। প্রথমটি (Money বা Wealth) দ্বারকানাথ অর্জন করেছিলেন, দ্বিতীয়টি অর্জন করেছিলেন তাঁর পৌত্র রবীন্দ্রনাথ। দু'য়েরই 'common factor is motive energy and a powerful dynamic'—যা পিতামহ ও পৌত্র উভয়েরই প্রচুর পরিমাণে ছিল। নবযুগের 'economic entrepreneur দ্বারকানাথ ঠাকুরের পৌত্র রবীন্দ্রনাথ ছিলেন আদর্শ 'intellectual entrepreneur'—এবং দ্বারকানাথ ও রবীন্দ্রনাথের মিলনেই রেনেসাঁসের অখণ্ড চিত্র চোখের সামনে ভেসে ওঠে। * * *

তাঁর জীবনের 'hero' কে? এ-প্রশ্ন একবার রবীন্দ্রনাথকে করা হয়েছিল। তার উত্তরে তিনি বলেছিলেন—'রামমোহন রায়'। এই প্রশ্ন বা উত্তর কোনটাই আমরা আজও ভাল করে বিচার করিনি। ঠাকুর-পরিবারের (রবীন্দ্র-শাখার) আদর্শের মূল যে রামমোহনের সামাজিক ও আধ্যাত্মিক ভাবধারার মধ্যে কত গভীরভাবে নিহিত ছিল তা দ্বারকানাথ ও দেবেন্দ্রনাথের জীবন থেকেই বোঝা যায়। দ্বারকানাথ ছিলেন তাঁর মানসপুত্র। রামমোহনের আদর্শই রবীন্দ্রনাথের সমগ্র সাহিত্যকর্মে ও চিন্তাধারায় পরিব্যাপ্ত। ভারত-পথিক রামমোহন সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন: "ভারতের চিত্ত সেদিন মনের অন্ন নূতন করে উৎপাদন করতে পারছিল না, তার খেত ভরা ছিল আগাছার জঙ্গলে। সেই অজন্মার দিনে রামমোহন রায় জন্মেছিলেন সত্যের ক্ষুধা নিয়ে। ইতিহাসের প্রাণহীন আবর্জনায়, বাহ্যবিধির কৃত্রিমতায় কিছুতে তাঁকে তৃপ্ত করতে পারলে না। কোথা থেকে তিনি নিয়ে এলেন সেই জ্ঞানের আগ্রহে স্বভাবত উৎসুক মন, যা সম্প্রদায়ের বিচিত্র বেড়া ভেঙে বেরল, চারিদিকের মানুষ যা নিয়ে ভুলে আছে তাতে যার বিতৃষ্ণা হোলো। সে চাইল মোহমুক্ত বুদ্ধির সেই

অবারিত আশ্রয় যেখানে সকল মানুষের মিলনতীর্থ। এই যেড়াভাঙার সাধনাই যথার্থ ভারতবর্ষের মিলনতীর্থকে উদ্‌ঘাটিত করা। এইজন্যেই এ সাধনা বিশেষ-ভাবে ভারতবর্ষের, যেহেতু এর বিরুদ্ধতাই ভারতে এত প্রভূত, এত প্রবল।” রবীন্দ্রনাথের জীবন-সাধনা সম্বন্ধেও তাঁর নিজের এই উক্তি প্রযোজ্য। * * *

অগাধ জলধিতুল্য রবীন্দ্রসাহিত্যের সম্যক পর্যালোচনা করতে হলে তার কালানুক্রমিক পর্বভেদ করা সর্বাগ্রে প্রযোজন। দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য হেতু পর্বভেদে মতভেদ দেখা দিতে পারে। তা দিলেও উপায় নেই, এই পথেই অগ্রসর হতে হবে। দেহের বা বযসের বিকাশের সঙ্গে যেমন মনের বিকাশ হয, তেমনি দেশকালের বা সমাজের বিকাশেব সঙ্গে ব্যক্তিত্বেরও বিকাশ হয। সমান্তরাল পথে সরলগতিতে নয়, সমাজের সঙ্গে ব্যক্তির নিরন্তর ঘাত-প্রতিঘাতে। ১৮৭৫ সালে ‘হিন্দুমেলার উপহার’ কবিতা প্রকাশ থেকে ১৯৪১ সালের ‘শেষ লেখা’ পর্যন্ত রবীন্দ্রসাহিত্যের রচনাকালের একটা চলনসই ভেদ পর্ব এইভাবে করা যেতে পারে :

প্র থ ম প র্ব : ১৮৭৫—১৮৯৯। বযস ১৪ থেকে ৩৯ বছর, প্রায সম্পূর্ণ যৌবনকালটা বলা চলে। রবীন্দ্রনাথের গভীর জাতীযতাবোধ ও আন্তর্জাতিকতাবোধ, বাংলাভাষা, লোকসাহিত্য ও লোকসংস্কৃতির প্রতি নিবিড় অনুরাগ এই সময পাকা বনেদের উপর গড়ে ওঠে। কবি কাহিনী, বাল্মীকি প্রতিভা, সন্ধ্যা সঙ্গীত, বৌঠাকুরাণীব হাট, প্রভাত সঙ্গীত, বিবিধ প্রসঙ্গ, প্রকৃতির প্রতিশোধ, বাজা ও রাণী, বিসর্জন, চিত্রাঙ্গদা, সোনার তরী, চিত্রা, বৈকুণ্ঠের খাতা, পঞ্চভূত, কণিকা পর্যন্ত সাহিত্যকর্মের অগ্রগতি। বাংলার লোকসংস্কৃতির পুনরনুশীলনে প্রায একুশ-বাইশ বছর বযস থেকে তিনি আত্মনিয়োগ করেন। সমাজচিন্তার অগ্রসরগতি যাতে অবরুদ্ধ না হয় তার জন্য প্রতিপক্ষের সঙ্গে এই সময় তাঁকে কঠোর আদর্শসংগ্রামে অবতীর্ণ হতে হয়।

দ্বি তী য় প র্ব : ১৯০০—১৯১৫। বযস প্রায ৪০ থেকে ৫৫ বছর। ক্ষণিকা, নৈবেদ্য, চোখের বালি, আত্মশক্তি, বাউল, স্বদেশ, ভারতবর্ষ, খেয়া, নৌকাডুবি, প্রাচীন সাহিত্য, লোকসাহিত্য, সাহিত্য, আধুনিক সাহিত্য, রাজা প্রজা, সমূহ, সমাজ, শারদোৎসব, শিক্ষা, ধর্ম, প্রায়শ্চিত্ত, গোরা, গীতাঞ্জলি, ডাকঘর, চৈতালি, জীবনস্মৃতি, অচলায়তন, গীতালি পর্যন্ত এই পর্বের সাহিত্যযাত্রা। স্বদেশী-

যুগের মন বহু রচনার মধ্যে সক্রিয়। চিন্তার পরিণতি অগ্রগতি এবং দূর থেকে দূরান্তের অভিযানের উৎকণ্ঠাও লক্ষণীয়।

তৃতীয় পর্ব: ১৯১৬—১৯৩০। বয়স প্রায় ৫৬ থেকে ৭০ বছর। ফাল্গুনী, ঘরে বাইরে, বলাকা, চতুরঙ্গ থেকে লিপিকা, পূরবী, সঙ্কলন, রক্তকরবী, যোগাযোগ, শেষের কবিতা, মহুয়া পর্যন্ত সাহিত্যের অগ্রগতি। দেহের যৌবন উত্তীর্ণ হলেও মনের যৌবন কাণায়-কাণায় ভরা। যৌবনোত্তর কালে রবীন্দ্র-প্রতিভার এই বৈশিষ্ট্যও লক্ষণীয়। সমাজচেতনার প্রাখর্য কমেনি, বরং বেড়েছে এবং তার সঙ্গে জীবন-আস্বাদনের আকাঙ্ক্ষা তীব্রতর হয়েছে।

চতুর্থ পর্ব: ১৯৩১—১৯৩৯। বয়স সত্তরের কোঠায় চলেছে। 'রাশিয়ার চিঠি' থেকে আরম্ভ করে পুনশ্চ, দুই বোন, মানুষের ধর্ম, মালঞ্চ, শ্যামলী, কালান্তর, প্রান্তিক, সেঁজুতি, আকাশ-প্রদীপ পর্যন্ত সাহিত্যযাত্রা। নতুন পৃথিবী নতুন সমাজ, নতুন মানুষ ও নতুন জীবনকে বুঝবার আবেগপূর্ণ আকুতি রবীন্দ্রনাথের সত্তরের সাহিত্যে সুপরিস্ফুট।

পঞ্চম পর্ব: ১৯৪০—১৯৪১। বয়স আশীর কোঠায় পড়ল। জীবনেরও শেষ হল। তবু এও একটা স্বাতন্ত্র্যউজ্জ্বল পর্ব। দ্বিতীয় বিশ্ব-মহাযুদ্ধ এর পটভূমি। দেবাসুর সংগ্রামে মানবসভ্যতার চূড়ান্ত সংকট। 'নবজাতক' থেকে শুরু করে সানাই, তিন সঙ্গী, রোগশয্যায়, আরোগ্য, জন্মদিনে, সভ্যতার সংকট, শেষ লেখা পর্যন্ত সাহিত্যের যাত্রাশেষ। নতুন জীবনের অঙ্গীকারে আস্থা আশীতে আরও আবেগমুখী হচ্ছিল মনে হয়। কালক্রমে রবীন্দ্রমানসের এই বিচিত্র অভিব্যক্তি অত্যাশ্চর্য নয় কি? * * *

কালানুক্রমিক আলোচনায় লাভ এই যে রবীন্দ্রমানসের আঁকাবাঁকা ঊর্ধ্ব-গতির পথরেখাটি তাতে ধরা পড়তে পারে। পূর্বোক্ত পর্বভেদ থেকে এইটাই বোঝা যায় যে রবীন্দ্রনাথের বয়স যত প্রবীণ হয়েছে, তাঁর মন তত নবীন হয়েছে, কিন্তু তাঁর সেই মন কখনও দেশকালের চেতনাভূমি থেকে উৎক্ষিপ্ত হয়নি। অতএব দেশকালের পরিবর্তনশীল আবেষ্টনের সঙ্গে, এবং সমাজচিন্তার সংঘাত-মুখর অগ্রসরগতির সঙ্গে যোগ রেখে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-কীর্তির অনুশীলন করলে তার বিশালতা ও বিশিষ্টতা দুই-ই উপলব্ধি করা সম্ভব হতে পারে।

[লেখকের নোটবই থেকে টুকরো চিন্তাগুলি সংকলিত। উত্তরসূরীর কোন সংখ্যায় তিনি এর কোন একটি চিন্তাকে পূর্ণাঙ্গ প্রবন্ধে রূপ দেবেন। সঃ উত্তরসূরী]

অসম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি

অরুণ ভট্টাচার্য

'সঞ্চয়িতা'র ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছেন, শুধুমাত্র ইতিহাস রক্ষার খাতিরে এই সংকলনে তিনি 'সন্ধ্যাসংগীত', 'প্রভাতসংগীত' এবং 'ছবি ও গান' এই তিনটির কয়েকটি কবিতা সংযোজন করেছেন, নচেৎ তার কবিতার আদর্শ অনুসারে 'মানসী'-পূর্ব কবিতার কোন সারিতেই স্থান হওয়া সম্ভব নয়। বস্তুত সংগৃহীত কয়েকটি কবিতাও তিনি হয়ত, নিজের কবিতার সংকলক নিজে না হলে, বাতিল করতেন। রবীন্দ্রনাথকে, দূর থেকে হলেও, আমরা যতটা জেনেছি তাতে তার উক্ত অভিমতকে নিছক বিনয় মনে করবার কারণ নেই। সত্যই তিনি নিজের অপেক্ষাকৃত কাঁচা লেখার জন্য লজ্জিত ছিলেন এবং সমালোচকের নিপুণ দৃষ্টি থাকবার ফলেই সে সকল কবিতাকে নাকচ করতে তাঁর বিবেক দ্বিধা বোধ করেনি।

কিন্তু আমার প্রশ্ন, যে-কটি কবিতা 'মানসী'-পূর্ব অধ্যায়ে লেখা, সেগুলি কি সত্যই অত্যন্ত কাঁচা কাব্যরসের নামগন্ধ নেই, রবীন্দ্রনাথের পরবর্তীকালের রস-সম্পৃক্ত কবিতার সঙ্গে কোনক্রমেই এক সারিতে বসবার যোগ্য নয়। না কি প্রাচীনকালের পত্ত লেখবার অনুকরণে শুধুই বৃথা সময় ব্যয় করেছেন অথবা কৈশোরক অনুভূতির আকুলিবিকুলি. যথাযথ অনুশীলন ও উপলব্ধির অভাবে যার কাব্যশরীর বাঙ্ময় হয়ে ওঠেনি! রবীন্দ্রনাথ প্রতিভা নামক অলৌকিক বস্তু কতটা সঙ্গে নিয়ে জন্মেছিলেন আমার অজ্ঞাত কিন্তু একথা অতীব সত্য যে তিনি সঙ্গে নিয়ে জন্মেছেন ঠাকুরবাড়ীর ঐতিহ্যমণ্ডিত সংস্কৃতির সংস্কার। তার ভাগ্য তিনি নিজে হাতে তৈরী করেছেন যেমন, কিংবদন্তী শোনা যায়, নেপলিয়ন নিজের ভাগ্যরেখা নিজেই ছুরিকাঘাতে তৈরী করেছিলেন। ভারতের সুপ্রাচীন আদর্শ, বাবার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত. দাদাদের সাহচর্য ও ব্যক্তিগত ইচ্ছাশক্তি এসকলই তার জীবনে অবজেক্টিভ সত্য। সেকারণে তিনি ধীরে ধীরে নিজেকে প্রস্তুত করেছেন, দীর্ঘদিন ধৈর্যসহকারে অপেক্ষা করেছেন, অসম্পূর্ণতা থেকে ক্রমশঃ পূর্ণতার দিকে নিশ্চিত পদক্ষেপে অগ্রসর হয়েছেন, কীটস্ কবিতায় যে রূপ ও সৌন্দর্যের পূর্ণতাকে পঁচিশেই লাভ করেছিলেন, রবীন্দ্রনাথে সে-পরিণতি

আসতে হয়ত মধ্যবয়েস কেটেছে কিন্তু একথা রবীন্দ্রপ্রতিভা সম্পর্কে নিশ্চিত সত্য যে 'প্রতিভা'র প্রত্যাশায় তিনি কড়িকাঠ গোনেননি, কাব্য-দর্শন-সাহিত্য-বিজ্ঞান পাঠে নিজেকে প্রস্তুত করেছেন, জেনেছেন জমি উর্বরা হলেই ফসল ভালো ফলে। রবীন্দ্রনাথ নিজে তার স্বভাবসিদ্ধ প্রত্যয়বোধে আলোচ্য কবিতাগুলিকে কাব্যপদবাচ্য বলে স্বীকার না করলেও আমার ধারণায় এসকল রচনা তাঁর অসম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি, পরবর্তীকালে যা উজ্জ্বল ও ভাস্বর হয়ে উঠেছে। মহৎ কাব্যের মৌলিক গুণাবলী এখানে সকলই উপস্থিত, যদিও কাঁচা হাতের স্বাক্ষর, খুঁটিয়ে না খুঁজলেও, মেলে। এখানে কৈশোরের আনন্দ ও বেদনা আছে, কাব্যেব প্রতি মমত্ব রয়েছে, প্রচেষ্টা ও উৎসাহের অভাব ঘটেনি। জগৎসংসার ও মানবমনের বিস্ময়কে একসূত্রে গ্রথিত করে বৃহৎ ঐক্যে পৌঁছুবার প্রয়াস আছে। এই সময়কার রচনাকে আমি 'অসম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি' নাম দিতে চাই। আমার ব্যক্তিগত ধারণায় এ সকল রচনা, অসম্পূর্ণ হলেও, রবীন্দ্র-প্রতিভার স্বাক্ষর বহন করে।

বাংলা সাহিত্যের দীর্ঘ ইতিহাসের পটভূমিতে রবীন্দ্রনাথের একক প্রচেষ্টায় কি ফল বর্তেছে সেকথা কারু অবিদিত নেই, কিন্তু কবিতার ক্ষেত্রে তার দান যে কি অপরিসীম, সেকথা কবিমাত্রই কাব্যচর্চা করতে গিয়ে প্রতিমুহূর্তে অনুভব করছেন। বাংলা সাহিত্যে গীতি কবিতা যে বিশেষ স্বাদ এনেছে তার ঐতিহ্য বৈষ্ণবকাব্য থেকে সঞ্চারিত হলেও রবীন্দ্রনাথে এসে তার পূর্ণ বিকাশ ঘটেছে, মাইকেলের ব্যক্তিত্ব ও বীররসের অভিব্যক্তি রবীন্দ্রনাথে কিয়দংশে অনুপস্থিত থাকলেও রবীন্দ্রকাব্য পৌরুষবর্জিত নয় এবং সর্বোপরি, বাংলা কবিতাব দেশজ ও লৌকিক ধারার স্নিগ্ধ শ্যামল পটভূমি রবীন্দ্রনাথে এসে একটি নিটোল শিল্পরূপ লাভ করেছে। কিন্তু এ সকলই বাহ্যত বিচার। বস্তুত রবীন্দ্রনাথই প্রথম আমাদের আধুনিক কবিতা লিখতে শেখালেন এবং সর্বপ্রথম বিশ্বজনীন পটভূমিতে, এদেশ ও বিদেশের কাব্যকলা ও শিল্প-কৌশলকে আয়ত্তে এনে প্রমাণ করলেন, বাংলা কাব্য জাতে নিছক বাঙালী নয়, সর্বজনীন তার আবেদন এবং গুণপনায় সে হীন নয় কারো চাইতেই। তার দ্যুতি হয়ত চোখ ধাঁধায় না, কিন্তু মানসগঠনে শ্রেষ্ঠ চিন্তার দ্যোতক এবং শিল্পরূপে নিশ্চিত উত্তরণ। আমরা রবীন্দ্রনাথের প্রত্যক্ষ প্রভাবের বাইরে থেকে তাঁর ব্যক্তিত্বকে সরাসরি উপেক্ষা করতে পারি হয়ত, কিন্তু কাব্যের

পটভূমিতে তিনি যে বিরাট মহীরুহের ভিত একলাই পত্তন করে গেছেন, তারই চারপাশের গুল্মলতায় আমাদের জীবনযৌবন অনায়াসে কাটছে।

রবীন্দ্রকাব্যের বিরাটত্ব, ব্যাপ্তি ও বিপুল গভীরতা সত্ত্বেও এ আমার কাছে অতীব দুঃখের যে তিনি 'গীতাঞ্জলি'র কবি হয়েই এদেশে ও বিদেশে পরিচিত হয়ে রইলেন। এবং তার মধ্যযুগের কবিতা যত আলোচিত হয়েছে, প্রতিভার প্রথম উন্মেষকালে যে কাব্যপ্রেরণায় তিনি অধীর ও উন্মুখ ছিলেন তা নিয়ে সমালোচকরা প্রায় নীরব থেকেছেন। শেষ জীবনে এসে তিনি কবিতার রীতি আঙ্গিক ও বিষয়বস্তু নিয়ে নতুন করে ভাবনা চিন্তা করে গেছেন, যথেষ্ট চর্চা করেছেন, নিজের কবিতার ট্রাডিশন নিজেই ভেঙেছেন—এ সকলই তার জীবনের অপর্যাপ্ত প্রাণশক্তি ও সৃষ্টিশীলতার সাক্ষ্য দেয়, কিন্তু আমার তথাপি মনে হয়েছে যে কৈশোরকালে রবীন্দ্রনাথের কাব্যে যে ইঙ্গিত পাওয়া গিয়েছিল, নানা কারণে তার কাব্য সেদিকে আর ধাবিত হয়নি। 'সন্ধ্যা-সংগীত', 'প্রভাতসংগীত', 'ছবি ও গান' এবং অংশত 'কড়ি ও কোমল' কাব্যগ্রন্থগুলিতে কয়েকটি বিশেষ গুণাবলী বর্তমান ছিল যা পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ ক্রমশ ত্যাজ্য মনে করেছিলেন। হয়ত, নির্লিপ্ত শিল্পীর মত শুধু-মাত্র সৌন্দর্য-অনুভূতিকে সম্বল করে এগুলে তাঁর কবিতার গতি পরিবর্তিত হতে পারত। কিন্তু রবীন্দ্র-সাহিত্যে শুধুমাত্র সৌন্দর্যবোধ একলাটি স্থান নেয়নি, সবসময় শুভবাদ তারি সঙ্গে জড়িত ছিল, সত্য ও শিবের খাতিরে শিল্পের সৌন্দর্য অনেকস্থানে ব্যাহত হয়েছে।

আমার বক্তব্য আরো একটু পরিস্ফুট হবে যদি একথা বলি যে রবীন্দ্রনাথ সেসময়কার কয়েকটি কবিতার নাম দিয়েছিলেন, মাতাল, চুম্বন, স্তন, মোহ ইত্যাদি, আবার তারকার আত্মহত্যা, বাহুর প্রেম, নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ ও বটে। একথা কি আমার বিশ্বাস করবো, 'গীতাঞ্জলি'র কবি তার কৈশোরক কবিতাগুলির নাম রেখেছিলেন 'মাতাল' অথবা 'স্তন'। কিন্তু একথা সত্য, অর্থাৎ সত্য যে রবীন্দ্রনাথও মানবজীবনের একনিষ্ঠ অনুভূতিকে বর্জন করেননি। তাকে কাব্যময়তায় মণ্ডিত করেছেন, শিল্পরূপে উত্তরণের প্রয়াস পেয়েছেন। ঋষি রবীন্দ্রনাথের কল্পনার সঙ্গে হয়ত এমন ভাবনার বিরোধ ঘটতে পারে, কিন্তু একথা অসত্য নয় যে একসময় রবীন্দ্রনাথের কাব্য ইন্দ্রিয়ানুভূতিতে প্রাণবন্ত ছিল। তীব্র অনুভব ও প্রবল কল্পনায় এসকল কবিতাগুলির এক নবীন সৌন্দর্য ছিল।

রবীন্দ্রনাথের নিজের আপত্তি থাকা সত্ত্বেও অথবা সমালোচকদের ঔদাসীন্য থাকলেও আমাকে এসকল কবিতা গভীরভাবে মুগ্ধ করেছে, যদিও জানি, রীতি-প্রকরণ, কবিতার ব্যাখ্যান ইত্যাদি প্রশ্ন তুলে কবিতাগুলিকে নাকচ করে দেওয়া যেতে পারে। অথচ লক্ষ্যনীয় যে নারীর স্তন বর্ণনায় রবীন্দ্রনাথে প্রেমের বিক্ষুব্ধ দিকটির পরিচয় পাইনা, শান্ত স্নিগ্ধ সুষমামণ্ডিত স্মৃতি ফিরে ফিরে আসে। সে 'সৌরভসুধায় পরান পাগল' হলেও নারীহৃদয়ের মন্দির যে পবিত্র এমন কথা কৈশোরেই তিনি বুঝেছিলেন—অর্থাৎ নারী যে শুধু প্রিয়া নয়, মাতার মঙ্গল-মূর্তিও তারই মধ্যে অধিষ্ঠিতা এমন একটি চেতনা তাঁর চিন্তাকে প্রভাবান্বিত করেছিল। নারীর সলাজ হৃদয় বর্ণনাতে

সহসা আলোতে এসে গেছে যেন থেমে

এমন ইঙ্গিত প্রকৃত কাব্যের রসাস্বাদন ঘটায় না কি। 'চুম্বন' কবিতাটি অপেক্ষাকৃত দুর্বল। কিন্তু এ কবিতা সৃষ্টির প্রেরণার ফলে রবীন্দ্রনাথের মনে 'ব্যাকুল বাসনা'র জন্ম হয়েছে, প্রেমের বিচিত্র গতির মতই এসময়কার কাব্য স্থানে স্থানে সলজ্জ, দ্বিধাবিজড়িত আবার কোথাও স্পষ্ট, উচ্চারিত। 'বাহু' কবিতার প্রথম অতিবিখ্যাত পংক্তিটির কথা স্মরণ করলে প্রত্যেক যুবকহৃদয় একটি আশ্চর্য আকর্ষণ অনুভব করে, একটা bizarre অথচ দুরন্ত টান যেন আমাদের মোহগ্রস্ত করে

কাহারে জড়াতে চাহে দুটি বাহুলতা

এমন করুণ অথচ আবেগময় পংক্তি রবীন্দ্রনাথ পরবর্তীকালে কেন যে লেখেননি সেকথা ভেবে আমাদের কালের কবিরা নিশ্চয়ই অতৃপ্তি অনুভব করবেন। শুধু এই কবিতাগুলিই নয়, 'তারকার আত্মহত্যা' বা 'রাহুর প্রেম' হয়ত কবিতা হিসেবে স্থানে স্থানে দুর্বল, কিন্তু কবিতাদুটির ভাব-কল্পনায়, ছবিতে ও ইঙ্গিতময় আলেখ্যে যে প্রচুর সম্ভাবনা বিদ্যমান ছিল একথা স্বীকার করতে দ্বিধা নেই—এ দুটি কবিতায় একটা macabre fantasy কাব্য অবয়বকে জড়িয়ে আছে

দুঃস্বপনের মতো চিরকাল তোমারে রহিব ঘিরে,
দিবসরজনী এ মুখ দেখিব তোমার নয়ননীরে (রাহুর প্রেম)

যে সমালোচকই এ পংক্তিকে নাকচ করুন না কেন আমি মানবোনা যে এখানে বিশুদ্ধ কবিতা নেই। প্রেমের ব্যর্থতার পর হয়তবা সবটাই দুঃস্বপন মনে হবে—অথচ প্রেমের প্রচণ্ড শক্তিকে অবহেলা করবার ক্ষমতা প্রেমিকের

নেই—বৈষ্ণবকাব্যের সঙ্গে প্রি-র‍্যাফেলাইট কবিগোষ্ঠীর চিত্রময়তার মিলন ঘটেছে এখানে, রঙে রসে রূপে এমন বর্ণাঢ্য পংক্তি রবীন্দ্রকাব্যের বিস্তৃত প্রাঙ্গণেও কদাচিৎ চোখে পড়ে না।

রবীন্দ্রনাথ ভবিষ্যৎ কালে ক্রমশ আবেগ নামক বস্তুটিকে বর্জন করবার চেষ্টা করেছেন। অবশ্য একথা ঠিক, কেবলমাত্র আবেগের প্রকাশেই সার্থক কবিতা সম্ভব নয়, কিন্তু যৌবনের আবেগময়তার একটা নিজস্ব সৌন্দর্য আছে, প্রাণশক্তি রয়েছে· যাকে শিল্পচেতনা থেকে বিযুক্ত করা যায় না। কৈশোরক কবিতাগুলিতে যে-পরিমাণ আবেগ বিদ্যমান ছিল, পরবর্তীকালে মনে হয় যেন রবীন্দ্রনাথ নানা স্থানে নিজেকে শাসন করেছেন, পরিচ্ছন্ন বিশুদ্ধ (ভাবের দিক থেকে) কবিতা লেখবার প্রয়োজনে নির্দয়ভাবে তাকে পরিহার করেছেন। প্রথম ও শেষ যৌবনের কবিতায় যে উত্তাপ ছিল, মধ্যযুগে তা যেন আত্মনিবেদনের হিমশীতলতায় কিছুটা নির্জীব হয়ে গেল। তবে কবির জীবনে যৌবন কি নিঃশেষিত? নয়। কেননা শেষ বয়সে তাঁর নবীন তারুণ্য আমাদের আবার বিমূঢ় করেছিল। যৌবনের উত্তাপই তো কাব্যের প্রাণ এবং কবির যৌবন ত' চিরস্থায়ী। রবীন্দ্রকাব্যে এ বড় এক বিস্ময়। হয়ত বা মধ্যবয়সে তিনি অনেক শোকতাপ পেয়েছিলেন, সমাজ ও চারিপাশের নির্দয়তায় বুঝিবা ম্লান হয়েছিল তার গৌরব। কিন্তু এও সত্য, পূর্ণ বিকাশের যুগেই তিনি কাব্যের উচ্ছলিত, আনন্দিত পথ থেকে সরে দাঁড়িয়ে ভক্তের মত শিল্প-প্রেরণাকে কবিতায় নিবেদিত করেছিলেন। এও আমার কাছে আর একটি বড় দুর্ঘটনা। বস্তুত 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' কবিতা থেকে আবেগ ও উত্তাপটুকু বাদ দিলে (ইংরাজীতে যার প্রতিশব্দ 'প্যাশন' বললে সঠিক বোঝা যায়) আর কিই বা থাকে! অবশ্য এ কথাও ঠিক, শুধু মাত্র আবেগ-আশ্রয়ী বলেই কবিতাটি অন্যান্য প্রথম শ্রেণীর কবিতার সারিতে স্থান পায়নি। না পাক্, এখানে তাঁর কাব্যপ্রেরণার উৎসমূল আমরা খুঁজে পাই, বুঝতে পারি, কাব্যের প্রাণময় অস্তিত্ব সম্পর্কে এ কবি সম্পূর্ণ সচেতন।

কী জানি কী হল আজি, জাগিয়া উঠিল প্রাণ

অথবা

থর থর করি কাঁপিছে ভূধর
শিলা রাশি রাশি পড়িছে খসে

ফুলিয়া ফুলিয়া ফেনিল সলিল
গরজি উঠিছে দারুণ রোষে

আবেগ অনুভূতি দৃশ্যমানতা ও বিস্ময় সব কিছুই এখানে বিধৃত হয়েছে। মনে হচ্ছে চোখের সম্মুখে রবীন্দ্রনাথ এই দৃশ্যাবলী যেমনটি দেখছেন তেমনটি শিল্পরূপে উজ্জ্বল করে তুলেছেন। অথবা দৃশ্যমানতার উদাহরণ স্বরূপ নীচের পংক্তি দুটি দেখলেই একথা আরো বিশদ হবে।

কেশ এলাইয়া ফুল কুড়াইয়া
রামধনু-আঁকা পাখা উড়াইয়া ইত্যাদি

এরকম personification বিশুদ্ধ কবিতার ইঙ্গিত নয় কি?

রবীন্দ্রনাথ নিজেই মনে করেছেন যে নানা কথা, নানা অনুভব তার মনে এসময় আকুলিবিকুলি করেছে, একটা ভাবের পর ভাব সকল সময় তার মনকে যেন মাতাল করে রেখেছে। সে জন্যই হয়ত তাঁর সংকোচ, অথচ আমার কাছে মনে হয় সেখানেই কবি রবীন্দ্রনাথের মৌলিক পরিচয়। সংকোচ এ কারণে যে কবিতাগুলি হয়তো উত্তরোয়নি, আমরা লাভবান এজন্য যে কবি রবীন্দ্রনাথের সত্যকার পরিচয় সেসকল কাব্যের মধ্য দিয়েই অস্ফুট আত্মপ্রকাশ করেছে। 'প্রভাতসংগীত' বা 'সন্ধ্যাসংগীত'-এ কবি বিশেষভাবে নির্জন, একাকীত্বের বোঝা তাকে পীড়িত করেছে, বাইরের জগতের সঙ্গে তার পরিচয়ের উন্মুখতা আছে, কিন্তু সে-সুযোগ তাঁর জীবনে তখনো আসেনি। কিন্তু কিছুদিন বাদেই বিশ্বজগতের সঙ্গে মানবমনের প্রথম সংযোগে তিনি অন্ধ, উন্মাদ হয়ে উঠলেন, সে কী আশ্চর্য চেতনা, বিরল অনুভূতি। এ যেন এক অবিস্মরণীয় সংবাদ যা পৃথিবীর সকলকে তার সে মুহূর্তেই জানানো প্রয়োজন, আর দেরি নয়, দেরি নয়।

আকাশের পানে চাই, সেই সুরে গান গাই
একেলা বসিয়া
একে একে সুরগুলি অনন্তে হারায়ে যায়
আঁধারে পশিয়া।

পূর্বে এ-নির্জনতাই তাঁকে দুঃখী করে রেখেছিল। কিন্তু যখন বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে তার পরিচয় হল, প্রাণ জেগে উঠল এক অপরূপ আনন্দে তিনি 'প্রাণের বেদনা, প্রাণের আবেগ' আটকে রাখতে পারলেন না। যে-নির্জনতা এতকাল

লালন করেছিলেন, অকস্মাৎ বিশ্বজগতের মাঝে নিজেকে স্থাপিত দেখে তিনি বিস্মিত ব্যাকুল ও প্রাণবন্ত হয়ে উঠলেন।

রচনারীতিতে সে সময় তিনি বিহারীলালের শিষ্য হলেও, কাব্য অনুভূতিতে তিনি সেকালেই আধুনিকতার স্বাক্ষর রেখেছেন। সে সময়ই বুঝেছিলেন 'বর্ণনা' কবিতার অন্যতম নির্ভরযোগ্য অঙ্গ হলেও, চিত্রসৃষ্টির কৌশল ও পরে চিত্রকল্পনার স্বকীয়তাই কাব্যের প্রাণ। একটা সরল ছবি নেওয়া যাক্ :

সমুখের সরোবরে আলো ঝিকিমিকি করে
ছায়া কাঁপিতেছে থরথর
জলের পানেতে চেয়ে ঘাটে বসে আছে মেয়ে
শুনেছে পাতার মরমর (পুরাতন)

বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গেই ছবি-সৃষ্টির প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। নিছক বিবরণ বা বৃত্তান্ত হলে এ কাব্যে মন ভরতনা, কিন্তু এমন সরলীকৃত পংক্তিগুলির মাঝে মাঝে অপূর্ব চিত্রময়তার সাক্ষাৎ পাই বলে এর আবেদন সঙ্গে সঙ্গে মনের গভীরে প্রবেশ করে। নয়ত ধরা যাক্, অনবদ্য রূপকথার সমগোত্রীয় কবিতাটি 'বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর'—

মেঘের উপর মেঘ করেছে. রঙের উপর রঙ।
মন্দিরেতে কাঁসর ঘণ্টা বাজল ঠং ঠং।

এমন যথাযথ সুন্দর বর্ণনায় মুহূর্তেই মন ভরে ওঠে, কাঁসর ঘণ্টার শব্দে মনের স্মৃতি বহুদূর দিগন্তে তখুনি পৌঁছে যায়, মেঘের বর্ণালীর শোভা মুগ্ধ করে, কিন্তু তার পরের পংক্তি দুটি দেখুন,

ও পারেতে বিষ্টি এল, ঝাপসা গাছপালা
এ পারেতে মেঘের মাথায় একশো মাণিক জ্বালা।

গাছপালা 'ঝাপসা' হয়ে গেছে বৃষ্টির ধারায়, মেঘের মাথায় বিদ্যুতে বিদ্যুতে একশো মানিক জ্বলে উঠেছে,—এখানে বর্ণনা ছবি হয়েছে, ছবি চিত্ররূপকল্পনায় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। যে কবিতাটিকে চিরকাল শিশুপাঠ্য ছড়া বলেই অবহেলা করে এসেছি, তার গৌরবে কিন্তু যৌবনপ্রান্তে এসেও আমার শিহরণ লাগে। দুরু দুরু বুক, ঘরেতে দুরন্ত ছেলের দাপাদাপি, ('ঘরেতে দুরন্ত ছেলে'র ছন্দ লক্ষ্য করুন) অভিমানী কঙ্কাবতী, ছায়ার কালো কালো (কালো শব্দটির দুবার ব্যবহারে কি যেন এক শংকার অবতারণা) বাজ-বিজলি (বজ্র-বিদ্যুতের কি অদ্ভুত সরলীকৃত

কাব্যময় রূপ।) এ সকল মিলে কবিতাটিতে যে যাদু তৈরী হয়েছে তার তুলনা বাংলা কাব্যে বিরল। এমন nostalgic কাব্য রবীন্দ্রনাথও খুব কমই লিখেছেন। সমালোচকরা তো বটেই, এমন কি রবীন্দ্রনাথও হয়ত সচেতন ছিলেন না যে এই সামান্য ছড়াটি কি আশ্চর্যভাবেই না 'pregnant with infinite possibilities'! রবীন্দ্রকাব্যের এই প্রস্তুতি-পর্বটি শুধুমাত্র ভূমিকা নয়, তার কাব্য-এষণার সবচেয়ে সম্ভাবনাময় যুগ বলে আমার মনে হয়েছে। পাণ্ডুলিপি অসম্পূর্ণ এজন্য যে কাব্যশরীর গঠনে আরো অভিজ্ঞতা আরো প্রয়াসের প্রয়োজন ছিল, কিন্তু এই পাণ্ডুলিপিই যে উত্তরকালে সার্থক কবিতার সূত্রপাত তার ইঙ্গিতও যথেষ্টই ছিল। তবে একথা না বললে হয়ত সত্যের অপলাপ হবে যে কাব্যের যে-ধারায় রবীন্দ্রনাথের কৈশোরক কবিতা অগ্রসর হচ্ছিল তার যথাযথ অনুবর্তন ঘটলে হয়ত আমরা 'গীতাঞ্জলি'র কবিকে না পেয়ে অন্য এক নতুন কবিকে পেতাম যিনি তীব্র আকাঙ্ক্ষায়, অশান্ত জীবনধর্মে, তীক্ষ্ণ অনুভূতিময়তায় অস্থির থাকতেন, সত্যশিবসুন্দরের শুভমিলনের জন্য সর্বদা উদ্‌গ্রীব হতেন না, খণ্ড বিক্ষিপ্ত মানবধর্মের মধ্যেও শিল্পরূপের অস্তিত্ব খুঁজে পেতেন।

[পরবর্তী সংখ্যায় এদুটি আলোচনার সম্পূর্ণ বিবরণ আমরা প্রকাশ করব। সঃ উত্তরসূরী]

ভারতবর্ষের ইতিহাস ও রবীন্দ্রনাথ

নিরবধি কালের পটে রবীন্দ্রজীবনের আশি বছর সময়কাল যেন এক পা তুলে আর-এক পা ফেলা। কিন্তু এক পা ফেলেই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ভারতবর্ষের ইতিহাস যে কতগুলি যুগ এগিয়ে গেল তা হয়তো একদিন বিচার করবে ভবিষ্যতের ভারতবর্ষ। হাজার হাজার বছর পরে আসবে যে মানববংশ তার উদ্দেশে তাকে প্রেরণা দেবার জন্যে তাকে প্রবুদ্ধ করবার জন্যই রবীন্দ্রনাথের অদৃশ্য অভিসার। রবীন্দ্রনাথ মানে যা রূপান্তরিত হয়েছে অলৌকিক বাণীপুঞ্জে। মাটির জিনিস মাটিতে ফিরে গেছে, রয়ে গেছে ধ্যানের রূপ। ভবিষ্যতের মানব-বংশের কানে কানে সেই বাণীপুঞ্জ যখন কবির স্বকালের বিশেষ কথাটি জানাবে তখন একই সঙ্গে তার মধ্যে গুঞ্জরিত হতে থাকবে কবির অতীতকাল, স্মৃতিতে আকান্ত বিধুর ও জ্বলন্ত। সেই যে তিনি একবার অতীতের উদ্দেশে বলেছিলেন, "বিস্মৃত যত নীরব কাহিনী স্তম্ভিত হয়ে রও। ভাষা দাও তারে, হে মুনি অতীত কথা কও কথা কও।" সেই ভাষাই তিনি জাগিয়েছেন অতীতের মুখে। তাই আজ ভারতবর্ষে সংস্কৃতি সম্পন্ন এমন ব্যক্তি পাওয়া কঠিন "পিতামহদের কাহিনী" সম্বন্ধে যাঁর কল্পনা রবীন্দ্রনাথের দ্বারা কোন-না-কোনভাবে উদ্বুদ্ধ নয়।

কারণ রবীন্দ্রনাথের জৈব-অস্তিত্ব একটি বিশেষ ও নির্দিষ্ট সময়কালের মধ্যে আবদ্ধ থাকলেও তাঁর চেতনা স্বচ্ছন্দে বিহার করেছে ভারতবর্ষের সুদীর্ঘ ইতিহাস জুড়ে। এই ইতিহাস যতদিনের তাঁর চেতনার বয়সও ততদিন। এবং ব্যাপক অর্থে সে-বয়স আরও অনেক বেশি, তার মানে যেসব স্থানে তিনি বলেছেন "আমার মিলন লাগি তুমি আসছ কবে থেকে" অথবা "কবে আমি বাহির হলেম তোমারি গান গেয়ে" সেসব স্থানে তাঁর চেতনার বয়সের গাছ-পাথর নেই। রবীন্দ্রনাথের শিরা-ধমনীতে যে-রক্তস্রোত প্রবাহিত হতো তা-ই যেন শয়নে স্বপনে দৈনন্দিনকার হাজারো কাজের মধ্যেও সেই অতীতকে বয়ে বেড়াত।

সেই স্রোতের টানে অতীতের কত ঘটনা নতুন তাৎপর্য পেয়েছে, যেমন কচ বা কর্ণ মূল কাহিনীর বাঁধন আলগা করে নতুন রূপ ধরে দেখা দিয়েছে তাঁর কাব্যে, এমন-কি "গান্ধারীর আবেদন"-এ দুর্যোধনও আপন লক্ষ্য নির্ণয়ে অকপট তথা সৎ এবং আকাঙ্ক্ষার প্রচণ্ডতায় পৌরুষে ভরপুর। অবিশ্য একথা এক শ' বার সত্যি যে কাব্য রচনায় যে-স্বাধীনতা স্বতঃসিদ্ধ ইতিহাসের বিচার করবার বেলায় তা অচল। পক্ষান্তরে এ-ও কি সত্যি নয় যে ঐতিহাসিকমাত্রেই আপন বিবেচনার দ্বারা কিছু ঘটনাকে বিপক্ষে ও কতকগুলিকে স্বপক্ষে দাঁড় করান এবং ঘটনা নির্বাচন ব্যাপারটা সেই ঐতিহাসিকের ব্যক্তিত্বের উপরেই নির্ভরশীল ?

রবীন্দ্রনাথ যদি হতেন তথাকথিত ঐতিহাসিকদেরই 'একজন তাহলে তিনি নিশ্চয়ই শুধু ঘটনার পর ঘটনা জড়ো করেই ক্ষান্ত হতেন। কিন্তু তিনি যে একজন দ্রষ্টা। সেই বিশেষ অর্থে তিনি একজন দ্রষ্টা যে-অর্থে সব বড়ো ঐতিহাসিকই দ্রষ্টা। উপরন্তু তিনি অলোকসামান্য আশুচেতন কবি, যাঁর বুকের নিভৃত কেন্দ্রে ধকধক করে জ্বলছে এক মহান দেশের সুদীর্ঘ সাধনা। এই দেশের কোনও ঘটনাই তাঁর সত্তার থেকে সম্পর্কশূন্য নয় কোনটাই তাঁর অস্তিত্বের পক্ষে সম্পূর্ণ অনাবশ্যক নয়, কোনটাই তাঁর চোখে পুঁথির পাতার অনড় নীরক্ত সুদূর তথ্য নয়, বরং সব কিছুকেই প্রশ্বাসের মতো টেনে নিয়েছেন নিজের ভিতর, তারপর তার থেকে তত্ত্বটুকু নির্যাসের মতো গ্রহণ করে, স্বীকার করে, বাকিটুকু ত্যাগ করেছেন নিঃশ্বাসে। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং বলেছেন, "বাহিরের জগৎ আমাদের মনের মধ্যে প্রবেশ করিয়া আর একটা জগৎ হইয়া উঠিতেছে।" ইতিহাসও তাঁর কাছে আর একটা জগৎ হয়ে উঠেছে। বাস্তবের নয়, সাধনার জগৎ। সেজন্যে মানতেই হয় যে রবীন্দ্রনাথের ইতিহাস-চর্চা তত্ত্বপ্রধান। কিন্তু এই স্বীকৃতিটুকুকে অভিযোগরূপে খাড়া করতে গেলে ঐতিহাসিক অন্বেষণকে মাত্র একটি পথে বেঁধে দেওয়া হয়। তাতে রবীন্দ্রনাথের যাই হোক, ইতিহাস-চর্চার পক্ষে সমূহ সর্বনাশ।

অতএব মোদ্দা কথাটা দাঁড়াল এই, যে-প্রক্রিয়া বশে রবীন্দ্রনাথ শিল্প সৃষ্টি করেছেন সেই একই প্রক্রিয়ার বশে তিনি ইতিহাস রচনা করেছেন। তার মধ্যে সত্য যতখানি স্থান পেয়েছে তার চেয়ে আরও বেশি স্থান পেয়েছে সেই জিনিস "গল্পসল্পে" তিনি যা চিহ্নিত করেছেন "আরও-সত্য" বলে।

রবীন্দ্রনাথ যে ভারতের ইতিহাসে কত পতন ও বিরোধ আছে সে-সম্বন্ধে অন্ধকারে ছিলেন এমন কথা মনে করবার কারণ নেই। তিনি নিজেই বলেছেন,

"প্রত্যেক জাতির সমস্যা সেখানেই যেখানে তাহার অসামঞ্জস্য।" আমাদের প্রাচীন ভারতে অসামঞ্জস্য রাজায় প্রজায় ছিল না, সে ছিল এক জাতি-সম্প্রদায়ের সঙ্গে অন্ত জাতি-সম্প্রদায়ের।" "কী করিলে পরস্পরে মিলিয়া এক বৃহৎ সমাজ গড়িয়া ওঠে, অথচ পরস্পরের স্বাতন্ত্র্য একেবারে বিলুপ্ত না হয়, এই দুঃসাধ্য সাধনের প্রয়াস বহুকাল হইতে ভারতে চলিয়া আসিতেছে, আজও তাহার সমাধান হয় নাই।" এই প্রয়াস ও সাধনাকেই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন ভারতবর্ষের ইতিহাসে "ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া"। এই প্রক্রিয়াটিকেই তিনি গুরুত্ব দিয়েছেন, ঐকতান বলেছেন। কালক্রমে আরও নানা সমস্যা এসে প্রক্রিয়াটিকে যে জটিল করে তুলেছে সে-বিষয়েও তিনি সম্পূর্ণ সচেতন।

ঐতিহাসিক হিসেবে রবীন্দ্রনাথকে খাটো করে দেখবার একটা ঝোঁক কোনও কোনও পণ্ডিতদের মধ্যে দেখা যায়। তার কারণ তাঁর প্রধান ঐতিহাসিক প্রবন্ধে নাকি অনেক তথ্যের ভুল আছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তথ্যকে বলেছেন ঘটনামূলক এবং সত্যকে বলেছেন ভাবমূলক। ভারতবর্ষের মহাকাব্য, পুরাণ ইত্যাদিতে পাওয়া যায় সত্যের উদাহরণ। সাংস্কৃতিক নৃতত্ত্বে যেমন জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত নানা সাংকেতিক কাহিনী ও অনুষ্ঠানের মর্মভেদ করে জনসাধারণের পূর্বতর ইতিহাস বের করা হয় তেমনই রবীন্দ্রনাথও মহাকাব্য, পুরাণ, লোককাহিনী, মহাপুরুষদের হেঁয়ালিপূর্ণ বচন ও দোঁহা প্রভৃতির তাৎপর্য অনুধাবন করতে চেয়েছেন এবং তার মধ্য হতেই ভারতবর্ষের ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার অভিব্যক্তিকে অন্বেষণ করেছেন। অর্থাৎ তাঁর চর্চার বিষয় ভারতের বিভিন্ন রাজপুরুষ বা শাসকদের কাহিনী তথা রাষ্ট্রীয় ইতিহাস নয়। সেটা হলো ভারতবাসীর সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অভিব্যক্তির পরিচয়। এই দুটি ক্ষেত্রে যে-বিরোধ তাকে কেন্দ্র করেই ভারতবর্ষের ইতিহাস প্রায় তিন-চার হাজার বছর ধরে আবর্তিত হচ্ছে। হাজার হাজার বছর ধরে ভারতবাসী সমস্ত সংঘর্ষ ও স্খলনের ঊর্ধ্বে ওঠার জন্যে যে-প্রয়াস পাচ্ছে যে-সাধনা করছে রবীন্দ্রনাথের কাছে সেটাই প্রধান, সেটাই লক্ষণীয় এবং তাঁর বিবেচনায় সেই প্রয়াস ও সাধনাকেই সিদ্ধির পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। নিছক অতীতচর্চার কোনও মূল্যই নেই। ইতিহাসের ততক্ষণ সত্যি সত্যি মূল্য নেই যতক্ষণ-না তা বর্তমানকে বিভ্রান্তির হাত থেকে বাঁচায়, বর্তমানকে প্রেরণাহত করে, যতক্ষণ-না তা ভবিষ্যতের নিশানা দেয়, অন্ধকারে পথ চলবার সময় আলো দেয়। ইতিহাস

সংক্রান্ত রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধগুলি কেবল এই মূল্যদণ্ডেই বিচার্য। "স্থায়ীকে রক্ষা করিয়া, অবান্তরকে বাদ দিয়া, ছোটোকে ছোটো করিয়া ফাঁককে ভরাট করিয়া, আলগাকে জমাট করিয়া" দেখানো যেমন তাঁর সাহিত্যের তেমনই তাঁর ইতিহাসেরও আদর্শ। তাঁর সে ইতিহাস আমাদের সারাক্ষণ মনে করিয়ে দেয় যে এদেশের উৎকৃষ্ট চিত্তগুলি যে লক্ষ্যে উপনীত হবার জন্যে যাত্রা করেছিল, যেখানে আজও উপনীত হওয়া যায়নি, সে যাত্রাকে যেন অব্যাহত রাখা হয়, যেন পথ ভুল না হয়ে যায়, যেন আমরা লক্ষ্যভেদ করতে পারি। তিনি ইতিহাসের উপকরণ সংগ্রহ করেছেন অতীত থেকে—তা তো করতেই হবে—কিন্তু তাকে চালনা করেছেন ভবিষ্যৎ অভিমুখে, কেননা একমাত্র সেখানেই রয়েছে তার স্বাশ্রয়ী সার্থকতা।

সুরজিৎ দাশগুপ্ত

রবীন্দ্রনাথ ও মানুষের ব্যক্তিস্বরূপ

পার্সোনালিটি শব্দটির বাংলা প্রতিশব্দ রবীন্দ্রনাথ ব্যক্তিস্বরূপ করেছেন। পার্সোনালিটি শব্দটি যে ধারণার প্রকাশক, ব্যক্তিস্বরূপ কিন্তু সেই ধারণার যথার্থ প্রতিবাহক নয় এবং তাতেই পার্সোনালিটিতে পাশ্চাত্যে সাধারণ যে সিদ্ধান্ত গড়ে উঠেছে তার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সিদ্ধান্তের তফাৎ আছে এই সত্য স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়ে। পার্সোনালিটি কথাটি লাটিন "পার্সোনা" শব্দ থেকে এসেছে ও এই পার্সোনা, মূক অভিনয়ে পাত্ররা যে মুখোস ধারণ করত সেই মুখোসকে বোঝায়। অভিনয়ে নেমে অভিনেতা অভিনেত্রী নিজেদের চেহারা ও চরিত্রকে বিস্মৃত হয়ে, সাময়িক ভাবে আবৃত রেখে নাটকের পাত্র পাত্রীদেরই ফুটিয়ে তোলবার চেষ্টা করে, রঙ্গমঞ্চে দর্শকদের সামনে দাঁড়িয়ে সেটা করাই তাদের নাটকীয় কর্তব্য বলে ধার্য্য হয়। পৃথিবীকে যদি একটা রঙ্গমঞ্চ বলে ধরা যায়, আর সমাজকে কিংবা সমাজভুক্ত মানুষদের দর্শকদের আসনে বসানো যায়, তবে বুঝতে পারব আমরা সকলেই কম বেশী এই রঙ্গমঞ্চে সমাজনির্দিষ্ট একটা অংশে অভিনয় করে চলছি, নিজেদের আত্মসত্তার উপর

সমাজের দশজনের কাছে দেখাবার উপযুক্ত, তাদের অনুমোদিত একটা মুখোশ-সজ্জা পড়ে নিয়ে মঞ্চে নেমেছি, না হলে বিদ্রূপের করতালি বর্ষণে মঞ্চ থেকে পালাতে আমরা বাধ্য হব। অনেকের অবশ্য এই মুখোশ মুখে এমন এঁটে বসে যে তাদের প্রকৃত চেহারা যা ছিল তা চিরকালের জন্য চাপা পড়ে যায়, যেখানে অভিনয় এবং রঙ্গমঞ্চের অবসান এবং মুখোশ খোলার দরকার সেখানেও তারা মুখোশ খুলতে পারে না, একটা সাজান চেহারা ও ভাব নিয়ে তারা জীবন শেষ কর্ে, আত্মোপলব্ধির সুযোগ তাদের জীবনেও ঘটে উঠে না। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের মত্তগর্বী আমাদের এই সভ্যতায় ক্রমশঃ সাজা মানুষদের প্রাবল্য বেড়ে চলেছে। ব্যক্তিত্ব বলতে একজাতীয় ছাঁচে ফেলা আফিসী বড়সাহেবী হম্বি তম্বি, মেজাজ ও চালিয়াতি রাজনৈতিক নেতা-সুলভ ভাব ইত্যাদিই বোঝাচ্ছে, এই যুগ "অর্গানিজেনস্ ম্যান" তৈরী করছে। প্রকৃত ব্যক্তি তৈয়ারী করছে কিনা ঘোর সন্দেহ। এর কারণ হয়ত এই যে, বর্তমান যুগ মানুষের সত্যস্বরূপের ধারণা ক্রমশঃ হারিয়ে ফেলেছে, মানুষকে একান্ত পরিবেশের জীব বলে ভেবে, তাকে দৈব-বিজ্ঞান শারীরতত্ত্ব সমাজ বিজ্ঞান, নৃতত্ত্ব, তথাকথিত মনোবিজ্ঞান ইত্যাদির সাহায্যে একটা সাধারণ নির্বিশেষ হিসাবে ফেলে বোঝার চেষ্টা হচ্ছে, মানুষের যে মৌলিক, পরিবেশাতিরিক্ত, অন্তরঙ্গ-স্বরূপ এই সমস্ত হিসাবের ছকে পড়েনা, তাকে বাতিল করে দিয়ে যে পরিবেশিক বহিরঙ্গরূপ প্রত্যক্ষগোচর, যা মানুষের চলাফেরা, ব্যবহারে পরিস্ফুট সেই উপরের জিনিসটুকুকে নিয়েই মানুষ সম্বন্ধে বিজ্ঞানের দোহাই পেড়ে একটা চূড়ান্ত কথা, অভ্রান্ত কথা বলা হ'ল এমন ভাব দেখান হচ্ছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে তথাকথিত বৈজ্ঞানিক পন্থার দৌলতে আজ মানুষের মন সম্পর্কে অনুসন্ধানের ব্যাপারে আত্মসমীক্ষার (introspection) কোন স্থান নেই , সমস্তটাকেই কুকুরের ঘন্টা শুনে লালা নিঃসরণের কোঠায় খাড়া করা হয়েছে, মনোবিজ্ঞান মানে আজ আচরণবাদ মাত্র অথচ মানুষের অস্তিত্বের প্রতিমুহূর্তে তার অন্তর দিগন্তের চেতনা সূর্য্যের আলোকে দীপ্ত তার ব্যক্তিস্বরূপের পরিপূর্ণ বিকাশ তো বটেই, এমন কি তার সাধারণ ব্যক্তিত্ব, যোধিত এই চেতনা সূর্য অস্তমিত হলে চির অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়। মনঃসমীক্ষকদের কাছে অবশ্য চৈতন্যের এই সূর্যালোক মনের এই প্রত্যন্তদেশ জীবপ্রবৃত্তির একটা অন্ধ জটপাকান ব্যাপার মাত্র, এর হাত থেকে মানুষের

তথাকথিত ঊর্দ্ধ সচেতন মনেরও কোন নিষ্কৃতি নেই। এই মনের থেকে জেগে ওঠা নির্জন আগ্নেয়গিরির লাভাস্রোতে তা যে কোন মুহূর্তে চাপা পড়ে যেতে পারে। তাছাড়া বিজ্ঞানের লক্ষ্য বিশেষের মধ্যে নির্বিশেষ নিয়ম আবিষ্কার করা, সেজন্য পার্সোনালিটি বলতে একটা মানুষের নিছক ব্যাহিক রূপ না বুঝিয়ে যদি তার ব্যক্তিত্বের বিশেষরূপটি, বিশেষ মহিমা কিংবা মাধুর্য বোঝায় তবে বিজ্ঞান তার কি কোন পরিচয় দিতে পারে? সমাজবিজ্ঞানীদের কাছে পার্সোনালিটি নিতান্ত "এনকালচারানেসের" (সমাজিক ঐতিহ্যে সংক্রামিত ব্যক্তিসত্তা) ব্যাপার মাত্র এবং অনেকের মতে তা নিতান্ত শৈশবেই লিবিডোর (মৌলিক প্রবৃত্তি) বিবর্তনকাল যখন প্রকট তখনই স্থির হয়ে যায়—বিশেষ বিশেষ শিশু পারিবারিক সম্পর্কের অবস্থা নিরশনে অবশেষে নির্বিশেষ একটি মানসিক "টাইপে" পরিণত হয়। অনেকে অবশ্য পরিবারকে সমাজ-বিচ্ছিন্ন একটি কেন্দ্র হিসাবে বিবেচনা না করে তাকে গোটা সমাজের একটি প্রতিভূ, প্রতিনিধিস্থানীয় মনে করেন, তবে পার্সোনালিটির বিকাশ পরিবেশাধীন তাই মনে করেন। য়ুংয়ের মতে পার্সোনালিটির বিকাশ প্রদোষান্ধকার শিশুমন ও সমাজ-পরিবেশের টানাপোড়েনে সৃষ্টি হয় না কারণ পার্সোনালিটির গতিই একটা সচেতন আদর্শসঞ্জাত লক্ষ্যাভিমুখীন এবং পার্সোনালিটিকে যদি মানুষের ব্যক্তিস্বরূপের প্রকৃত বোধ ও বিকাশ বলে মনে করি তবে য়ুংয়ের কথার তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম হবে। প্রকৃতপক্ষে ঐ অর্থে পার্সোনালিটি বিজ্ঞানের আয়ত্তের বাইরে, বরং তা একটা দ্বিধাহীন অনুভূত সত্য হিসাবে কাব্য কিংবা শিল্পীর নিকট ধরা পড়ে, কারণ কবি ও শিল্পীর দৃষ্টি বিজ্ঞানের অঙ্কের প্রতীকে বাঁধা, পরিমেয় প্রাথমিক গুণাবলীর বিমূর্ত, ধূসর জগতকে অতিক্রম করে রূপরসশব্দস্পর্শগন্ধাদি গুণে সমৃদ্ধ তন্মাত্রবোধের জগতে বিচরণ করে এবং বিশেষের বিশেষত্ব সেখানে অমর্যাদা পায় না। কবি কিংবা শিল্পী যদিবা অরূপে পৌঁছতে চেষ্টা করেন, তবে বিশেষের রূপের মধ্য দিয়েই তিনি তাঁর পথ খুঁজে নেন। দার্শনিকদের মধ্যে যাঁদের মেজাজ কাব্যধর্মী, অনুভূত বাস্তব যাঁদের কাছে জীবন্ত তাঁদের দর্শনেও মানুষের ব্যক্তিস্বরূপ মর্যাদা পায়। এর প্রমাণ বর্তমানকালের অস্তিত্ববাদী দার্শনিকদের লেখায় পাওয়া যায়, কারণ তাঁরা দর্শনের সুকঠিন নিয়মে নিজেদের আলোচনাকে না বাঁধলেও সজীব মানুষ হিসাবে তাঁরা যে জগতে নিজের অস্তিত্বের সমস্যাজাত চৈতন্যের

প্রহারে অস্থির এটুকু টের পাওয়া যায়। তাঁরা মানুষকে ছকে ফেলা জীব বলে অস্বীকার করেন বলে বিরাট বিশ্বের মাঝে ব্যক্তিস্বরূপের আমিত্ব ও তাদের সম্পর্কের সমস্যা তাঁদের কাছে এত তীব্র ভাবে প্রতিভাত হয়। নৈয়ায়িক পন্থাগামী বিমূর্তবুদ্ধির চেয়ে অনুভূতির দর্পণে ব্যক্তিস্বরূপের প্রতিমূর্তি পরিষ্কার ভাবে প্রতিফলিত হয় একথা সন্দেহাতীত। একমাত্র প্রেমিকের কাছে তার প্রিয়া পৃথিবীর নির্বিশেষ নারীর ভীড়ে একজন বিশেষ নারী হিসাবে তার হৃদয়রাজ্যের অধিশ্বরী হয়। রবীন্দ্রনাথের কবিদৃষ্টিতে সেইজন্য ব্যক্তিস্বরূপের প্রকৃত তাৎপর্য্য ধরা পড়বার সম্ভাবনা অনেক বেশী ছিল এই মনে করেই একটি পূর্ণাঙ্গ আলোচনার অবতারণা করা চলতে পারে। (ক্রমশঃ)

ত্রিদিব ঘোষ

কৃতজ্ঞতা স্বীকার :

বর্তমান সংখ্যাটি প্রকাশে নানাভাবে সাহায্য করেছেন শ্রীপুলিনবিহারী সেন, শ্রীকানাই সামন্ত, বিশ্বভারতী, শ্রীকুসুমকুমার ভট্টাচার্য, সুরেন্দ্র প্রেসের শ্রীহীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীসারদাচরণ দাস, শ্রীপ্রফুল্ল গুপ্ত, শ্রীপ্রফুল্ল মিত্র, বেঙ্গল অটোটাইপ কোং, শ্রী কে, কে, সিন্‌হা, শ্রীমতী রাজেশ্বরী দত্ত ও প্যারিসের "Two Cities" পত্রিকার কর্তৃপক্ষ (জনিন ওবোয়াইয়ের-এর রচনার অনুবাদ প্রকাশের অনুমতির জন্য)।

অরুণ ভট্টাচার্য কর্তৃক টেম্পল প্রেস, ২, ন্যায়রত্ন লেন, কলিকাতা-৪ হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।